অক্ষয়কুমার দত্তঃ উনিশ শতকের একজন চিন্তক ও সমাজ সংস্কারক

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

তন্ময় রায়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং A00HI0201316

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সমর্পিতা মিত্র

সহকারী অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০ ০৩২

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

অক্ষয়কুমার দত্তঃ উনিশ শতকের একজন চিন্তক ও সমাজ সংস্কারক

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor (Dr.) Samarpita Mitra and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor: Candidate:

Dr. Samarpita Mitra
Assistant Professor
Department of History
Jadavpur Universirty
Date:

Tonmoy Roy
Date:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি আমার এই গবেষণা পত্রের জন্য আমার ‘গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক’ ড. সমর্পিতা মিত্র-এর প্রতি চির কৃতজ্ঞ। তিনি সহযোগিতা না করলে এই সন্দর্ভটি লেখা ও পেশ করা সম্ভব হত না। এছাড়া বিভাগীয় প্রধান ড. মেরুনা মূর্মু ও অধ্যাপক ড. রূপ কুমার বর্মণ এবং বিভাগের সকল শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ জানাই।

আমার কর্মস্থল, নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ-এর অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শ্রীকান্ত সামন্ত, বিভাগীয় (ইতিহাস) প্রধান অধ্যাপক জোসেফ হাঁসদা ও বিভাগীয় সহকর্মীবৃন্দ অধ্যাপক ড. সুপর্না চ্যাটার্জি, অধ্যাপক ড. যূথিকা বর্মা, অধ্যাপক ড. লীলা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সকল সহকর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমার গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ ও উৎসাহ প্রদান করার জন্য।

অক্ষয় গবেষক শ্রী আশীষ লাহিড়ী ও ড. মুহম্মদ সাইফুল ইসলামের কাছে উৎসাহ পেয়ে সন্দর্ভটি লেখার কাজ সহজ হয়েছে। এছাড়া নিরন্তর সহযোগিতার জন্য শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় ও ড. শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের কাছে চির বাধিত থাকব। সন্দর্ভটি টাইপ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল সাহায্য করে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন শ্রী অগ্নীশ্বর চক্রবর্তী।

আমার স্কুল শিক্ষক শ্রী স্বপন পোতাদার, ড. ধীমান রায়, ড. বিমল কুমার মণ্ডল ও শ্রী সৌমেন পাল-দের আশ্রয় আমার উচ্চ শিক্ষার পথ মসৃণ করেছে। বিভাগের সিনিয়র ড. কৃষ্ণ কুমার সরকার, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস ও অঙ্কন রায়-দেরকে ধন্যবাদ পাশে থেকে সহযোগিতা করার জন্য। বন্ধু সাগির হুসেন পিয়াদা, সঞ্জীব প্রামাণিক, অম্লান দত্ত; শুভঙ্কর বারুই ও পলাশ সরকার প্রত্যককে ধন্যবাদ জানাই।

বেলঘরিয়া — *তন্ময় রায়*

তাং- ২৫/০১/২০২৪

সূচীপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
পারিভাষিক শব্দাবলি	i
ভূমিকা	১-১২
(ক) গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়	১
(খ) গবেষণার তথ্যসূত্র এবং তথ্য ব্যবহারের প্রণালী	৫
(গ) গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায়গুলি	১০
(ঘ) গবেষণা-প্রণালী	১১
প্রথম অধ্যায়ঃ ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন দিক	১৩-৪০
(ক) ঔপনিবেশিক বাংলা ও অক্ষয়কুমার দত্তের অবস্থান	১৪
ক. ক. ক. অক্ষয় দত্তের পূর্বে বাংলা ভাষার অবস্থা	১৪
ক. ক. খ. অক্ষয় দত্তের পূর্বে বাংলার সামাজিক অবস্থা	১৫
ক. ক. গ. অক্ষয় দত্তের পূর্বে বাংলার সামাজিক আন্দোলন	১৮
ক. খ. ক. অক্ষয় দত্তের সময় বাংলা ভাষার অবস্থা	১৯
ক. খ. খ. অক্ষয় দত্তের সময় বাংলার সামাজিক অবস্থা	২০
ক. খ. গ. অক্ষয় দত্তের সময় বাংলার সামাজিক আন্দোলন	২০
ক. গ. ক. অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর পর বাংলা ভাষার অবস্থা	২১
ক. গ. খ. অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর পর বাংলার সামাজিক অবস্থা	২১
ক. গ. গ. অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর পর বাংলার সামাজিক আন্দোলন	২১
(খ) উনিশ শতকের বাংলার বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও নবজাগরণ(?)	২২
(গ) অক্ষয়কুমার দত্তঃ জীবনী	৩০
বংশ পরিচয়	৩০
জন্ম	৩১
বাল্যকাল	৩১
সমাজোন্নতিবিধায়িণী সুহৃদসমিতি	৩৩
কর্মজীবন	৩৩

সাহিত্য-জীবন ৩৬
শেষ জীবন ৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শিক্ষাবিদ অক্ষয়কুমার দত্ত ৪১-৮৪
(ক) নিজের শিক্ষা ৪১
ক. ক) ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ৪১
ক. খ) কলকাতায় আসার আগের শিক্ষা ৪২
ক. গ) কলকাতায় পড়তে আসা ৪২
ক. ঘ) পিতার মৃত্যুঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে বাধা ৪৪
(খ) শিক্ষকতা ৪৫
খ. ক) *তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায়* শিক্ষকতা ৪৫
খ. খ) শিক্ষক-শিক্ষণ নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে ৪৯
(গ) তাঁর শিক্ষা ভাবনা ৫১
(ঘ) নারী শিক্ষা ৫৭
(ঙ) পাঠ্য পুস্তক রচনায় তাঁর অবদান-অনন্যতা ৫৯
(চ) বাংলা ভাষার 'যথার্থ শিল্পী' ৬৩
(ছ) *যতিচিহ্নের* প্রবর্তক ৭৩
(জ) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সর্ব্বজন *প্রশংসিত 'পাখী সব করে রব'* কবিতার অপূর্ব্ব সমালোচনা ৭৯
(ঝ) অন্যান্য বিষয়াবলীঃ গ্রন্থাগার-কৌতুকাগার, ছাত্রপ্রীতি ও শিক্ষার জন্য অনুদান (হিন্দু হোস্টেল প্রসঙ্গ/উইলে বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি) ৮১

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পত্রিকা সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত ৮৫-১৩৫
(ক) গদ্য রচনার সূত্রপাত ৮৫
(খ) বিদ্যাদর্শন পত্রিকা ৮৬
খ. ক) বিদ্যাদর্শনে কী প্রকাশিত হত? ৮৮
খ. খ) বিদ্যাদর্শনের মূল্যায়ন ১০০
(গ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১০১
গ. ক) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কি প্রকাশিত হত? ১১১
গ. খ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্যায়ন ১২৬

(ঘ) অসুস্থ অবস্থায় পত্রিকা কমিটির দান ও পরবর্তী ঘটনাবলী (পীড়া ও পত্রিকার অবনতি) ১৩০

চতুর্থ অধ্যায়ঃ অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন দর্শনের পরিবর্তন ১৩৬-১৭১

(ক) ব্রাহ্মধর্ম-ব্রাহ্মসমাজ-ব্রহ্মবাদ ১৩৭

(খ) অক্ষয় দত্তের মতাদর্শ পরিবর্তনের ধাপগুলি ১৪৪

(গ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তর্ক-বিতর্ক ১৪৯

(ঘ) অক্ষয় দত্তের রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়? ১৫৫

(ঙ) অক্ষয়কুমার দত্ত-এর ধর্ম্মনীতি ও ধর্মবোধ ১৬৪

ধর্ম্মের প্রাধান্য ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিবরণ ১৬৫

ধর্ম্ম স্বরূপ ১৬৫

বাল্যবিবাহ-বহু বিবাহ-বিধবা বিবাহ ১৭০

নিম্নবর্গের মানুষদের প্রতি ব্যবহার ১৭০

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—তাঁর দীর্ঘ গবেষণামূলক গ্রন্থ ১৭২-২০৯

প্রেক্ষাপট ১৭২

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় ১৭৬

উপসংহার ২০৭

উপসংহার ২১০-২১৩

সংযোজনী ২১৪-২২৫

গ্রন্থপঞ্জি ২২৬-২৩২

জীবনপঞ্জিঃ অক্ষয়কুমার দত্ত ২৩৩-২৩৫

অক্ষয়কুমার দত্তঃ

উনিশ শতকের একজন চিন্তক ও সমাজ সংস্কারক

পারিভাষিক শব্দাবলি*

পারিতোষিক = শিক্ষার জন্য আর্থিক উৎসাহ দান/জল পানি

(তৎকালীন) দ্বিতীয় শ্রেণী = (বর্তমান) অষ্টম শ্রেণী

কাঠাকালী/বিঘাকালী = ক্ষেত্রফল

১ শক = ৭৮ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ = অবিভক্ত বাংলা

বিজ্ঞাপন/উপক্রমণিকা = ভূমিকা

(পত্রিকার) নির্ঘণ্ট পত্র = সূচীপত্র

শিক্ষা সমাজ = শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগী সভা/সংগঠন

অভিলাষিত = মনমত

অধিবেদন = বহুবিবাহ

মুখবন্ধ = Preface

(শিবপুরস্থ) রাজকীয় উদ্যান = Botanical Garden (Shibpur)

ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগার = Indian Museum

মনোবিজ্ঞান = Mental Philosophy

নৈসর্গিক = Natural

পদার্থবিদ্যা = Natural Philosophy

লোকযাত্রাবিধান = Political Economy

ধর্ম্মনীতি = Principles of Morals

*অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর রচনায় বাঁদিকের শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। যার চলতি অর্থ এখানে দেওয়া হল।

ভূমিকা

(ক) গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়

উনিশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৮৬ সালে মারা যান। ১৮৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি সুস্থ ছিলেন। অর্থাৎ জীবনের মাত্র ৩৪-৩৫ বছর তিনি সবল-সুস্থভাবে কাটিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা-সমাজ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষা-সমাজ সংস্কারে। কিন্তু জীবনের শেষ ৩০ বছর শিরোরোগ (শিরঃপীড়া)-এ আক্রান্ত থাকায় প্রত্যক্ষভাবে কোন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি এটা যেমন ঠিক, তেমনই এই সময় অসুস্থতার জন্য মানসিক-শারীরিক কষ্ট নিয়েও সম্পূর্ণ করেছিলেন তাঁর জীবনের সর্ববৃহৎ গবেষণামূলক গ্রন্থটি।

তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন একনিষ্ঠ-বলিষ্ঠ সংগঠক হিসেবে ব্রাহ্মধর্মের সংস্কারমূলক কার্যাবলীর পাশাপাশি ব্রাহ্মধর্মকে ইংরেজি শিক্ষিত শহুরে *নব্য ভদ্রলোক*-দের কাছে গ্রহণযোগ্য করারও চেষ্টা করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির কাছে আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সাথে তাঁর বিতর্ক যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিতর্কের সামাজিক-ধর্মীয় প্রভাব লক্ষণীয়।

তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ফেরে তখন, যখন তিনি একদিকে ব্রাহ্মধর্মকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে দেবেন্দ্রনাথের সাথে বিতর্ক করছেন, শিরোরোগে আক্রান্ত হয়ে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা এবং ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু ধীরে ধীরে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিরীশ্বরবাদের চর্চা করছেন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় ও ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় এই বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে।

প্রচলিত অভিধান অনুসারে, ইংরেজি Materialism বা মেটিরিয়ালিজম্-এর প্রতিশব্দ জড়বাদ। ম্যাটার বা Matter থেকে মেটিরিয়ালিজম্। যে মতে ম্যাটারই পরম সত্য বা আদি-কারণ বা সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মূল উপাদান তারই নাম মেটিরিয়ালিজম্। অভিধানকারেরা ম্যাটার অর্থ জড়-অতএব মেটিরিয়ালিজম্ অর্থে জড়বাদ শব্দ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, আমাদের দার্শনিক সাহিত্যে ম্যাটার-এর প্রসিদ্ধ প্রতিশব্দ জড় নয়; ভূত, যেমন, চতুর্ভূত বা পঞ্চভূত। মেটিরিয়ালিজম্-এর দাবী কিন্তু ভূতবস্তুই পরম সত্য, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। অতএব আত্মা প্রভৃতি কোনো স্বতন্ত্র পদার্থের কথা অবান্তর।[১]

এ দেশে যে সকল দার্শনিক মতবাদগুলি প্রচারিত রয়েছে সেগুলির মূল বক্তব্য আলোচনা করা হল—কুমারিল ছিলেন অষ্টম/নবম শতকের দার্শনিক এবং মীমাংসা দর্শনের প্রচারক। কুমারিলের ভাববাদ খণ্ডন শূন্যবাদ ও মায়াবাদের বিরুদ্ধে ছিল।

উপনিষদ্ আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রচিত। উপনিষদেই প্রথমে 'ভাববাদ' পরিলক্ষিত হয়। এরপর খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মহাযানী বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন 'শূন্যবাদ'-এর মাধ্যমে

[১]দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, ২০১৬, পৃ. ২৬-৩৩।

ভাববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। শূন্যবাদের মূল কথা এই যে, পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎ শূন্য-মিথ্যা বা কাল্পনিক ব্যাপার।

দার্শনিক নাগার্জুন ভাববাদের সমর্থক ছিলেন যার আবির্ভাব আনুমানিক খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। নাগার্জুন প্রবর্তিত সম্প্রদায়টির নাম মধ্যমক; তাঁর দার্শনিক প্রতিপাদ্যকে শূন্যবাদ বলা হয়। অর্থাৎ জগতের সকল কিছুই 'শূন্য'। আর যদি কেউ প্রমাণ করে এই শূন্যের তত্ত্ব মিথ্যা, তাহলে তিনি যে প্রমাণ দিচ্ছেন সেই প্রমাণকে নাগার্জুন অসার বলেছেন এবং প্রমাণের প্রমাণ নেই সেটা বলেছেন। এবং এ বিষয়ে তিনি একটি বই লিখেছেন 'প্রমাণ-বিধ্বংসন'-প্রমাণ মাত্রেরই ধবংস। তাঁর মতকে সমর্থন করেছেন চন্দ্রকীর্তি, বুদ্ধপালিত, ভাববিবেক প্রমুখ।

অষ্টম বা নবম শতক থেকে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ প্রচলিত ছিল। যা ভাববাদের পরম প্রচারক। এঁদের মতানুযায়ী জগৎ মিথ্যা ও মায়া। তিনি বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু তিনিও নাগার্জুনের মতই প্রমাণ মাত্রেরই অসারতা প্রচার করেন। তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ- 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য', অর্থাৎ বেদান্ত ভাষ্য। শাস্ত্র তার বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল।

মায়াবাদের প্রকৃত সমর্থক ছিলেন দার্শনিক শ্রীহর্ষ। তিনি আনুমানিক দ্বাদশ শতকের দার্শনিক। তার রচিত বইটির নাম 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য'। বইটিতে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, প্রমাণ বলে দার্শনিকেরা সাধারণত যা মানেন তার কোনোটাই মানা যায় না। এবং তিনি এও মনে করেন সব রকম প্রমাণ না মেনেও দার্শনিক মত মানার সুযোগ আছে।

চার্বাক গোষ্ঠীর মতামত লোকায়ত বলেই প্রসিদ্ধ। চার্বাক বললে দার্শনিক মত এবং চার্বাক মতবাদ মেনে চলা ব্যক্তিবর্গ-উভয়কেই বোঝায়। বা চার্বাক বলতে বুঝি, এক আপসহীন বস্তুবাদী দর্শন বা এই দর্শনের প্রবক্তা বস্তুবাদী দার্শনিক। এই স্কুলের দার্শনিকদের আবির্ভাবকাল এখনও সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায় নি। তবে বিভিন্ন গ্রন্থে এদের উল্লেখ দেখে অনুমান করা হয় যে

শেষ-বৈদিক ও বুদ্ধপূর্ব যুগ থেকেই এদের অস্তিত্ব ছিল। এঁরা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না।

অক্ষয় দত্তের নিজস্ব চিন্তার জগত গড়ে ওঠার পেছনে এই সমস্ত দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব পরেছিল বলে অনুমান করা যায়।

বর্তমান গবেষকের গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হল উনিশ শতকের একজন সমাজ চিন্তক ও সংস্কারক হিসেবে অক্ষয় দত্ত সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন বা তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন। এবং এর সামাজিক প্রভাব কতটা ছিল। সাথে বর্তমানে তাঁর কাজগুলির চর্চাও কতটা দরকারি।

উনিশ শতকের বাংলায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আমরা গবেষণা সন্দর্ভের পাতায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ্য করব। তিনি শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। শিক্ষাদানের প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক, ভাষা শিক্ষার পুস্তক রচনা করেছিলেন। পাঠ্যপ্রণালী (Syllabus) কেমন হওয়া উচিত, কি কি বিষয়ের পাঠ্যদান প্রণালী (Curriculum) হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করেছিলেন। যা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজও তার তাৎপর্য লক্ষ্যণীয়।

তিনি উনিশ শতকের একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ছিলেন। রামমোহন রায়, ডিরোজিও-এর পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারে তার ভূমিকা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতন। তিনি কুসংস্কারে নিমজ্জিত উনিশ শতকের বাংলার সমাজ জীবনে সজোড়ে আঘাত দিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু-সহকর্মী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা (বিদ্যাসাগর) যখন বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছেন তখন তিনি সমর্থক হিসেবে সর্বাগ্রে ছিলেন। এমনকি দত্ত বিদ্যাসাগরকে তাত্ত্বিক সমর্থনও প্রদান

করেছিলেন। এছাড়া ঐসময় তাঁর হাত ধরে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারও ঘটে। আসলে এই সকল কাজই ছিল তাঁর জীবনের মূল নির্যাস।

(খ) গবেষণার তথ্যসূত্র এবং তথ্য ব্যবহারের প্রণালী

এই গবেষণা সন্দর্ভে অক্ষয় দত্তের জীবন কর্ম, চিন্তা ও মতাদর্শের পরিবর্তন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রাথমিক আকর অবশ্যই তাঁর 'কাজ' এবং তাঁর রচিত বহুল এবং স্বল্প পরিচিত যাবতীয় প্রবন্ধ-সম্ভার ও গ্রন্থগুলি। পাশাপাশি, অক্ষয় দত্তের জীবনী এবং তাঁর লেখা ও কাজ নিয়ে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত (প্রায়) যাবতীয় লিখিত তথ্যগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। অক্ষয় দত্তের উপর অ্যাকাডেমিক গবেষণার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও তাঁর জীবন, রচনা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে/হচ্ছে।

আসলে তাঁকে নিয়ে আলোচনাতে তাঁর রচনাগুলিই আকর। সমসাময়িক কালে ব্যক্তি অক্ষয়ের গুরুত্ব কতটা ছিল সেই বিষয়টি তৎকালীন সময়ের চেয়ে আজ আরও বেশি করে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ সমসাময়িক কালে তাঁর গুরুত্ব খোঁজা অসম্ভব। দুশো বছর পরে আজ এই গুরুত্ব বুঝতে আমরা সক্ষম। তাই 'অক্ষয় চর্চা' দ্রুত গতিতে বাড়ছে।

অক্ষয় দত্তের উপর প্রকাশিত গবেষণাগুলি তিন ধরণের। এক, "জীবনীমূলক"। তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁর সম্মতি নিয়ে মহেন্দ্রনাথ রায় লিখেছিলেন *'শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত'*। গ্রন্থটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তাকালয় থেকে ১২৯২ সালে (১৮৮৫ খ্রিঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয় দত্তের একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী হিসেবে এই বইটি এখনও পর্যন্ত স্বীকৃত, কিন্তু বইটি অ্যাকাডেমিক অর্থে গবেষণাধর্মী নয়। গ্রন্থটিতে দত্তের জীবনকাহিনী যথাসম্ভব সবিস্তারে আলোচিত থাকলেও, মহেন্দ্রনাথ সমকালে প্রকাশিত অক্ষয়

দত্তের বিপুল রচনাবলী অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি সম্পর্কে যেমন কিছু লেখেননি, তেমন তাঁর রচনাবলী থেকে আহরণ করে তাঁর জীবন ও কর্ম (দার্শনিক চিন্তা) সম্পর্কেও এই বইটিতে সবিস্তারে কিছু লেখা হয়নি। পরবর্তীকালে অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই বইটির প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

আরেকটি জীবনী লিখেছেন নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। তাঁর লেখা বইটি হল *'অক্ষয় চরিত'*, যাতে ছোট আকারে অক্ষয় দত্তের জীবনপঞ্জী রয়েছে। বইটি আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক ১২৯৪ সালে (১৮৮৮ খ্রিঃ) প্রকাশিত হয়েছিল। বিভিন্ন গবেষণায় জানা যাচ্ছে যে, বইটির কিছু অংশ সত্য-মিথ্যায় মিশ্রিত। ফলে বইটির প্রামাণ্যতাসহ গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়েছে। মূলত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগেই নকুড়চন্দ্র এই বইটি লিখেছিলেন। এতে রাজনারায়ণ বসুর দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব রয়েছে। রাজনারায়ণ মনে করতেন, 'ব্রাহ্মসমাজে অক্ষয়কুমার দত্তের কোন অবদান নেই'। তাই বইটিতে বিভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক।

দুই, তাঁর উপর দুটি অ্যাকাডেমিক গবেষণার নানান ধারা। নবেন্দু সেনের *'গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর'* নামে প্রকাশিত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্তির নিমিত্ত গবেষণাপত্র ছিল। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ খ্রিঃ। এই বইটিতে গদ্য ভাষার স্রষ্টা হিসেবে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থানুসারে অক্ষয় দত্তের অবদান নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ গদ্য রচনা করা ছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত কাজের জন্য অক্ষয় দত্তের বিশেষ পরিচিতি ছিল, এই বইটিতে তার কোনও বিশেষ উল্লেখ নেই।

বাংলাদেশের মুক্তচিন্তক অধ্যাপক মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট (পিএইচ. ডি.) ডিগ্রি পেয়েছেন অক্ষয় দত্তের উপর গবেষণা করে। তাঁর গবেষণাপত্রটি তিনি পরিমার্জন করে *'অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা'* নামে প্রকাশ করেছেন ২০০৯ খ্রিঃ।

দত্ত প্রসঙ্গে এত বিস্তৃত রচনা অন্য কোনও গবেষক এখনও পর্যন্ত (২০২৩ সাল) করেননি। কিন্তু তাঁর গবেষণাপত্রে যে বিষয়টির অনুপস্থিতি লক্ষণীয়, তা হল অক্ষয় দত্তের শ্রেষ্ঠ রচনা, *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* বইটির ঐতিহাসিক মূল্যায়ন। বিস্তৃতির দিক থেকে অধ্যাপক সাইফুলের বইটির সাথে বর্তমান গবেষকের গবেষণা সন্দর্ভের আকস্মিক মিল থাকলেও অধ্যাপক সাইফুল-এর গ্রন্থটির সাথে বর্তমান সন্দর্ভের মূল বিষয়গত অনেকগুলি পার্থক্যের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হল অক্ষয় দত্তের মতাদর্শের পরিবর্তন বিচারে এই গ্রন্থটিকে (ভা উ-স) সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান। অক্ষয় দত্ত রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলিকেও মতাদর্শ পরিবর্তনের বিচারে আলোচনা করা হয়েছে, যা এই সন্দর্ভের একটি অন্যতম স্তম্ভ।

তিন, অক্ষয় দত্ত প্রসঙ্গে বিভিন্ন নিবন্ধকারের অনেক রচনা আমরা দেখতে পাই। অসিত কুমার ভট্টাচার্য-এর *'অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজচিন্তা'* (২০০৭) গ্রন্থে আটটি প্রবন্ধের মাধ্যমে উনিশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে দত্তের ধর্ম ও সমাজ ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে অক্ষয় দত্তের ধর্ম ও সমাজ ভাবনা নিয়ে আলোচনাকে অক্ষয় দত্তের বিপুল রচনাবলী ও কর্মকাণ্ডের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করার উল্লেখযোগ্য প্রয়াসের অভাব সচেতন গবেষকের চোখে পরে। অক্ষয়ের রচনাবলী নিয়ে কোন আলোচনার অভাব স্বভাবতই এক অপূর্ণতার জন্ম দিয়েছে। ফলে গ্রন্থটির আলোচনা অসম্পূর্ণ বলা সঙ্গত।

আশীষ লাহিড়ী প্রণীত *'অক্ষয়কুমার দত্ত: আঁধার রাতে একলা পথিক'* (২০০৭) গ্রন্থে কেন অক্ষয় দত্ত তাঁর সময়ের এক অনন্য চরিত্র এবং এদেশে মাতৃভাষায় (বাংলা ভাষায়) বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ ছিলেন তা তুলে ধরেছেন। এই রচনাটি মূল্যবান হলেও গ্রন্থটিতে দত্তের যথার্থ মূল্যায়ন হয়নি। তাঁর চিন্তাভাবনা ও রচনাবলীর উপর ভিত্তি করে কোনও সম্পূর্ণ আলোচনা এতে নেই। বিজ্ঞান লেখক অশোক মুখোপাধ্যায় *'ডিরোজিও ও অক্ষয়কুমার দত্ত'* (২০১৩)-এ বাংলার

নবজাগরণ পর্বে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং অক্ষয় দত্তের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে তাঁদের প্রতি এদেশের মানুষের উদাসীনতার কথা লিখেছেন। তাঁর রচনায় শ্রী মুখোপাধ্যায় দত্তের জীবনের চিন্তা জগতের বিবর্তনটি তুলে ধরেছেন। এমনকি তিনি "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়"-এর ঐতিহাসিক মূল্যায়নও করেছেন। কিন্তু স্বল্প পরিসরের কারণে তিনি স্বভাবতই অক্ষয়ের সার্বিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে পারেননি।

অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর রচিত *'On the Bengal Renaissance'* গ্রন্থে ভারতে রেনেসাঁসের যুগ বিভাগের উল্লেখ করতে গিয়ে অক্ষয় দত্তের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভারতীয় উপাসক-সম্প্রদায়-এরও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর বেশি আলোচনা তিনি করেননি। অশোক সেন *'Iswar Chandra Vidyasagar and His Elusive Milestones'* গ্রন্থে অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে প্রায় কিছুই উল্লেখ করেননি। যতটুকু আলোচনা করেছেন তাও বিদ্যাসাগরের প্রেক্ষিতে। অধ্যাপক অমিয় সেন তাঁর *'Explorations in Modern Bengal c. 1800-1900: Essays on Religion, History and Culture'* গ্রন্থে অক্ষয় দত্তের দর্শন চিন্তা, ধর্মীয় মত নিয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করেছেন। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং তিনি অক্ষয়ের রচনাগুলিরও উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক সুমিত চক্রবর্তী রচিত *'Local Selfhood, Global Turns: Akshay Kumar Dutta and Bengali Intellectual History in the Nineteenth Century'* গ্রন্থটি এই গবেষণা পত্রটি জমা দেওয়ার কয়েক দিন আগে হাতে পেয়েছেন বর্তমান গবেষক। দত্তের প্রেক্ষিতে স্থানীয়ের সাথে জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয়টি কানেক্ট করে অধ্যাপক চক্রবর্তী এক নতুন বিষয় অবতারণা করেছেন। আসলে বহির্বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান/ধারণা অক্ষয়ের জ্ঞান স্পৃহার প্রতি আগ্রহকে প্রমাণ করেছে। তিনি দত্তকে "Science Worker" হিসেবে পরিচয় দেওয়ার মধ্যে

এক অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তিনি "তত্ত্ববোধিনী পিরিয়ড" বললেও সেই পিরিয়ডে তাঁর কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ নেই, এবং ঐ পিরিয়ডের আগের বিদ্যাদর্শন পত্রিকার সময়কাল নিয়েও কিছু বলেননি। তাছাড়া ব্রাহ্মধর্মকে সংস্কারের কেন প্রয়োজন পড়ল ইত্যাদি বিষয়গুলি তিনি উল্লেখ করেননি। বর্তমান গবেষক এই গবেষণা সন্দর্ভে এই সবকিছুর উল্লেখ করেছেন। এবং পূর্বে অক্ষয়ের উপর গবেষণা হওয়া দুইটি থিসিস ইতিমধ্যে গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়েছে, সেই দুটি ও সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় প্রকাশিত অক্ষয়ের অংশটি তিনি তাঁর এই গ্রন্থ রচনার জন্য ব্যবহার করেননি। যা এক বড় ভুল হিসেবে থেকে গেছে। এছাড়া বাংলা গ্রন্থগুলি থেকে ইংরেজিতে তর্জমা করতে গিয়ে দুই-একটি তথ্যগত ত্রুটি চোখে পড়ে তাঁর গ্রন্থে।

এই সব কারণে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অক্ষয় দত্তের এক সার্বিক মূল্যায়নের পাশাপাশি তাঁর মতাদর্শের পরিবর্তনের একটি পথরেখা অঙ্কনের কাজটি বাকি রয়ে গেছে। বর্তমান সন্দর্ভ সেই ফাঁক পূরণের ক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন হিসেবেই উপস্থাপনা করা হচ্ছে। এবং এভাবেই অক্ষয় দত্তকে উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তক-সমাজ সংস্কারক রূপে আমরা পাব। এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিষয়ই হল দত্তের কাজ-রচনাবলী থেকে তাঁর সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আমরা তাঁকে কতটা জানতে বুঝতে পারছি।

তাঁর শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (চিন্তা-দর্শন) আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তিনি প্রবন্ধের উপযোগী বাংলা ভাষা নির্মাণ করেছেন, যথাযথ যতি চিহ্নের প্রবর্তক, সমাজে বৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছেন, পাঠ্যপ্রণালী-পাঠদানপ্রণালী নির্মাণ করেছেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের পুরোটা কোন গবেষকই আলোচনা করেননি। আসলে তাঁর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়কালকে খণ্ড না করে একে ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা উচিত।

(গ) গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায়গুলি

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে অক্ষয় দত্ত কেন উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তক-সমাজ সংস্কারক তার উল্লেখ রয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁর জীবন দর্শন পরিবর্তনের দিক নির্দেশও রয়েছে। জীবনের মধ্যভাগে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে 'ব্রহ্মবাদী' হয়েছিলেন। এরপর তিনি সংশয়বাদী হন এবং সর্বশেষে নিরীশ্বরবাদী। তাঁর জীবনের এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যায়গুলি ঘটনা পরম্পরায় (Chronologically) দেখান হয়েছে সন্দর্ভের অধ্যায়গুলি জুড়ে। এবং তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজ, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (দুই খণ্ড) তাঁর জীবন দর্শন পরিবর্তনের সাক্ষী। এই গ্রন্থটি মূল্যায়নের মাধ্যমে এই গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি যেমন ভাবে ভাগ করা হয়েছে—*ভূমিকায়* গবেষণার বিভিন্ন দিকের উল্লেখ করা হয়েছে। *প্রথম অধ্যায়ে* 'ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন দিক'-এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন, বাংলায় ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন ঔপনিবেশিক নীতির উল্লেখের পাশাপাশি অক্ষয় দত্তের একটি ছোট্ট জীবনী পরিবেশনের মাধ্যমে ব্যক্তি অক্ষয় দত্তকে তাঁর সামাজিক প্রেক্ষিতে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলার নবজাগরণ ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা আছে। *দ্বিতীয় অধ্যায়ে* 'শিক্ষাবিদ অক্ষয়কুমার দত্ত''-এর শিক্ষাচিন্তা ও সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন রচনার উল্লেখ করার পাশাপাশি সেগুলির সামান্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর 'পত্রিকা সম্পাদনা'-এর সময়কার বিভিন্ন রচনাবলীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন–(এক) *"বিদ্যাদর্শন"* পত্রিকাটি মাত্র ৬ মাসের জন্য এবং (দুই) *"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"* ১২ বছরের জন্য। *চতুর্থ অধ্যায়ে* তাঁর ব্রহ্মবাদী থেকে নিরীশ্বরবাদী হওয়ার প্রেক্ষাপট, পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত হয়েছে। *পঞ্চম অধ্যায়ে* তাঁর লেখা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি

নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে কোন গবেষক বেশি কিছু আলোচনা করেননি। *উপসংহার* এবং *গ্রন্থপঞ্জি* দিয়ে গবেষণাপত্রটি শেষ হয়েছে। এছাড়া শব্দকোষ ও বীজশব্দ রয়েছে।

(ঘ) গবেষণা-প্রণালী

বর্তমান গবেষক এই গবেষণা পত্রটির জন্য প্রধানত অক্ষয় দত্তের বিভিন্ন রচনার উপর নির্ভর করেছেন। কারণ তাঁর রচনাবলীই হল তাঁর কর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে প্রামান্য উপাদান। তাঁর চিন্তা, লেখা, কাজ সব একই সরলরেখায় রয়েছে। অর্থাৎ যেমন চিন্তা-ভাবনা তেমন কাজ। তাই উনিশ শতকের একজন চিন্তক-সমাজ সংস্কারক থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত তিনি বাংলার চিন্তা জগতে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন।

অক্ষয়ের প্রায় প্রতিটি রচনাই ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের জন্য। এগুলিকে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ধরা যেতে পারে। এবং তাঁর জীবদ্দশায় মহেন্দ্রনাথ রচিত জীবনীটি ও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা নকুড়চন্দ্রের লেখা বইটি রয়েছে। এছাড়া উনিশ শতকের বাংলা বিষয়ক এবং অক্ষয়ের উপর পরবর্তীকালের প্রবন্ধকারদের বিভিন্ন রচনা (বই-প্রবন্ধ) গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি অনেকাংশে লোকপ্রিয় ও নন-অ্যাকাডেমিক। সর্বোপরি, তাঁর উপর প্রকাশিত দুটি গবেষণাপত্র পড়ার সুযোগ হয়েছে—ড. নবেন্দু সেন ও ড. মুহম্মদ সাইফুল ইসলামের। সাইফুল ইসলাম অক্ষয় দত্তের সাধু ভাষার রচনাগুলি চলতি ভাষায় পরিবর্তিত করে নিয়ে সংকলন করেছেন, তাই অক্ষয় দত্তের লেখার আদি রূপ এখানে সংরক্ষিত হয়নি।

অক্ষয় দত্তের রচনা ও উনিশ শতকের উপর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি বর্তমান গবেষকের বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের প্রাথমিক উপাদান। বাকি রচনাগুলি গৌণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এই গবেষণা সন্দর্ভটি লেখার জন্য বর্তমান গবেষক এই দুই ধরণের উপাদানকেই গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করেছেন। অন্যদিকে, কোনরকম সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র গবেষণা (ফিল্ড রিসার্চ) ইত্যাদি বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটির জন্য প্রয়োজন হয়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী, কলকাতায় সেন্টার ফর স্টাডিজ অফ সোশ্যাল সায়েন্স-এর গ্রন্থাগার, অনলাইন ফ্রি বুক স্টোর থেকে অক্ষয়ের বিভিন্ন রচনাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন দিক

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার তৎকালীন তরুণ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির 'নামমাত্র যুদ্ধ' (পলাশীর যুদ্ধ)-এ জয়লাভ বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নব যুগের সৃষ্টি করেছিল। অনেকেই এই সময় থেকে ভারতে আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে বর্ণনা করেছেন।

স্যার যদুনাথ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে *হিস্ট্রি অফ্ বেঙ্গল* (১৯৪৮) বিষয়ে বলতে গিয়ে *পলাশী*কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা হল—সূত্রপাত .....এক গৌরবময় ঊষালগ্নের, যা বিশ্ব ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় নি .....সত্যি এক রেনেশাঁ, কন্সট্যান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপে যা দেখা গিয়েছিল তার থেকেও বিস্তৃত, গভীরতম এবং অনেক বৈপ্লবিক.....।[১]

এই ঐতিহাসিক কালটি যে তাৎপর্যপূর্ণ একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধ বাঙালি কবি নবীনচন্দ্র সেনের ভাষায় ভারতের ভাগ্যে অন্ধকারময়ী চির রাত্রির সূচনা করেছিল-

নিভিল গৃহের দীপ,

নিভিল তখন,

[১]Sumit Sarkar, *A Critique of Colonial India*, 1985, p. 14.

ভারতের শেষ আশা হইল স্বপন।[২]

ব্রিটিশরা ভারতীয়দের জন্য শুধুমাত্র এক অন্ধকারময় যুগ নিয়ে এসেছিল একথা কিন্তু সকলে মনে করেন না। ঐতিহাসিক সরকার আরও বলেছেন (১৯২৮), "বিশ্ব শান্তি এবং সমাজের আধুনিকীকরণের পরে ইংরেজদের মহান উপহার, এবং বলা যেতে পারে এই দুটি শক্তির প্রত্যক্ষ ফলাফল হল—নবজাগরণ, যা আমাদের উনিশ শতককে চিহ্নিত করেছে। আধুনিক ভারত তার সবকিছুর জন্য এর কাছে ঋণী।"[৩]

(ক) ঔপনিবেশিক বাংলা ও অক্ষয়কুমার দত্তের অবস্থান

ক. ক. ক. অক্ষয় দত্তের পূর্বে বাংলা ভাষার অবস্থা-

এই গবেষণা সন্দর্ভে আমরা দেখতে পাব অক্ষয় দত্তের পূর্বের বাংলা ভাষা গ্রাম্য বর্বরতার সাথে তুল্য ছিল। এই ভাষার যা উন্নতি তা প্রথমে হয়েছিল অক্ষয় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে। গবেষণামূলক বা তাত্ত্বিক রচনার উপযুক্ত বাংলা গদ্য তখনও ছিল না। শাসিত ভারতীয়দের অন্যতম প্রাচীন ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই ভাষার সাথে ইউরোপীয় ভাষাগুলির যোগসাজশ প্রমাণের মাধ্যমে (প্রাচ্যবাদ) উভয়ের প্রাচীনকালে সংযোগ ছিল তা প্রমাণিত হয় স্বাভাবিকভাবেই।

আর এই ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতের *গৌরবময় অতীত*-কে তুলে ধরা হয়—যে অতীতকে এতটাই গৌরবময় করা হয়েছে যার জন্য ভারতের মধ্যযুগ *অন্ধকারময়* হয়ে গেছে। আবার এই অন্ধকারকে দূর করতেই নাকি ব্রিটিশদের ভারতে আগমন

[২]বিপন চন্দ্র, *আধুনিক ভারত*, ২০১৩/বি, পৃ. ৯৪।

[৩]David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835*, 1969, p. 1.

হয়েছিল। ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে প্রথমে এটাই প্রচার করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি পুরনো ঐতিহ্যকে আবার ফিরিয়ে আনতে হলে পুরনো সংযোগ প্রয়োজন। সেই অর্থে বোঝাই যাচ্ছে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বৈধতা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়। আর এভাবেই সৃষ্টি হয় প্রাচ্যবাদের বা প্রাচ্য চর্চার।

ক. ক. খ. অক্ষয় দত্তের পূর্বে বাংলার সামাজিক অবস্থা-

ব্রিটিশরা ভারতে এসেই তৎক্ষণাৎ ভারতীয়দের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি। তারা ধীরে ধীরে ভারতীয়দের বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে নজর দিতে ও হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে রবার্ট ট্রেভার্স যুক্তি দিয়েছেন যে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে, ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ আধিকারিকরা ভারতের রাজনৈতিক অতীতকে বোঝার ও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিল, বিশৃঙ্খল 'আঞ্চলিক প্রশাসকদের' সাথে কিছুটা সঙ্গতি এবং স্থিতাবস্থা বজায় রেখে।[৪]

এই সময় ভারতীয়দের জন্য কিরকম শাসন ব্যবস্থা-সামাজিক নীতি-শিক্ষা নীতি গৃহীত হওয়া উচিত তা নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলাপ-আলোচনা করা হয়েছিল। এই বিষয়ে মূলত কয়েকটি মতবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। নিম্নে তা বর্ণনা করা হল-

প্রাচ্যবাদ বা Orientalism মতবাদে স্যার উইলিয়াম জোন্স গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ভাষাগত যোগের কথা উল্লেখ করেন। ধরে নেওয়া হয়েছে, এই তিনটি ভাষাই (গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের সংযোগ স্থাপন করে জোন্স ধ্রুপদী ঐতিহ্যের কথা বলেন। প্রাচ্যচর্চার সেই শুরু। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদরা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রচর্চা করেই প্রধানত ভারতবর্ষকে খুঁজে বার করার চেষ্টা

[৪]Lakshmi Subramanian, *History of India, 1707-1857*, 2010, p. 94.

করেন। বিশেষভাবে তাঁরা ভারতীয় "ঐতিহ্যের" অর্থ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা মনে করতেন এ বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানই প্রকৃত এবং সবচেয়ে যথাযথ, যেহেতু ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ রাজও তাঁদের জ্ঞানকে যথাযথ ও যুক্তিসম্মত বলে মনে করত।

এডওয়ার্ড সঈদের (১৯৭৮ খ্রিঃ) ধারণা প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক জ্ঞান ইউরোপীয়দের থেকেই এসেছিল। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত, যেমন উইজিন আর্শিক দেখিয়েছেন যে, প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক জ্ঞান পারস্পরিক মতের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এসেছিল। তিনি আরও মনে করেন, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যেই প্রাচ্য তথা ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল।[৫]

গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে (১৭৭২-৮৫ সাল) কোম্পানির প্রশাসনিক নীতির মধ্যে প্রাচ্যদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে নীতিটি মূলত ছিল এরকম যে, বিজিত এলাকায় লোকেদের শাসন করতে হত তাদেরই আইন কানুনের সাহায্যে অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকেই "প্রচলিত ভারতীয় রীতিনীতি অনুযায়ী আইনসঙ্গত" করে নিতে হবে। কাজেই ভারতীয় সমাজকে বোঝবার দরকার পরে।

এই প্রক্রিয়াকেই গৌরী বিশ্বনাথন বলেছেন "ব্রিটিশ সংস্কৃতি বিপরীত নীতি অনুসরণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল।" উদ্দেশ্য, এদেশের ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার জন্য এদেশীয় সমাজের সঙ্গে সন্মিলিত হওয়া। টমাস ট্রাউটমানের (১৯৯৭) মতে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর পিছনে অন্য একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল।

[৫]শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশী থেকে পার্টিশান (আধুনিক ভারতের ইতিহাস)*, ২০০৮, পৃ. ৮০-৮১।

প্রচার করা হয় ঐতিহ্যময় অতীতকাল থেকেই ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে।[৬]

অন্যদিকে খ্রিস্টীয় সু-সমাচার বা Evangelical ধারণা ও উপযোগবাদী (হিতবাদী) বা Utilitarian ভাবধারা-এই দুই ভাবাদর্শ ভারতবর্ষে কোম্পানির প্রশাসনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। উপরোক্ত ভাবধারার দুটি ঘরানাই প্রবলভাবে বুঝিয়ে দেয় ব্রিটিশের ভারত জয় করা রীতিমতো অপরাধ হয়েছে, পাপ হয়েছে। কিন্তু সেই অপরাধী ব্রিটিশের শাসন ভারতবর্ষ থেকে উচ্ছেদ করার কথা না বলে, তার সংস্কারের জন্য এই দুই ভাবাদর্শের প্রবক্তারা সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

উদ্দেশ্য, ভারতবাসী যেন সুশাসনে থেকে এই "আদর্শবাদীদের সময়কার সর্বোত্তম ভাবনার" সুফল পায়। এই দুই মননশীল ভাবধারা থেকেই জন্ম নেয় "একটি দৃঢ় বিশ্বাস বা ধারণা যে, ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্থায়ীভাবে থাকা উচিত। এই ধারণাটিই ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়।"[৭] উপযোগবাদীরা যে মতামতকে প্রাধান্য দিতেন তা হল 'সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষদের জন্য সর্বোচ্চ ভাল'। এই ধারণার প্রধান প্রবক্তারা ছিলেন জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল।[৮]

ইংরেজদের মত ছিল যে তারা উন্নত, সভ্য, আধুনিক। উল্টোদিকে ভারতীয়রা অনুন্নত, অসভ্য, প্রাচীনপন্থী। শাসক ব্রিটিশরা শাসিত ভারতীয়দের (নেটিভ) উন্নত, সভ্য, আধুনিক করার দায়িত্ব নিয়েছিল। তাই ভারতে তাদের শাসনকে তারা আইনসিদ্ধ মনে করত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্বের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রথম দিকের ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রাও

---

[৬]তদেব, পৃ. ৮১।

[7]শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

[8]Lakshmi Subramanian, Ibid, p. 97.

ব্রিটিশদের প্রচারিত এই বিষয়টিকে সমর্থন করতেন। এমনকি ভারতে ব্রিটিশ শাসন *'ঈশ্বরের দান'* ছিল এই কথাটিও অনেকে মনে করতেন।

ক. ক. গ. অক্ষয় দত্তের পূর্বে বাংলার সামাজিক আন্দোলন-

ব্রিটিশরা শুধুমাত্র এই মতবাদগুলি চর্চা করেই থেমে থাকেনি। তারা (ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিকরা) এই মতবাদগুলির উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে ভারতীয়দের জন্য শিক্ষা ও সামাজিক নীতি গ্রহণ করেছিল। যেমন- (মাতৃ)ভাষা(য়) শিক্ষা, দেশীয় শিক্ষানীতি, পাঠ্যসূচী রূপায়ণ, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন ইত্যাদি।

প্রাচ্যচর্চার পরিণামে স্থাপিত হয় *কলকাতা মাদ্রাসা* (১৭৮১ সাল), *বাংলায় এশিয়াটিক সোসাইটি* (১৭৮৪ সাল) এবং *বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ* (১৭৯৪ সাল)। এই সব প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষা ও শাস্ত্রচর্চাই করা হত এবং প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার উন্নয়ন ঘটানোও ছিল এইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।[৯] এরই হাত ধরে ১৮০০ সালে *ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ* প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল, কোম্পানির প্রশাসনে অসামরিক কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষায় এবং ঐতিহ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া।[১০] আসলে এই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যেই প্রাচ্যবাদের উদ্ভব হয়েছিল। উপযোগবাদী (হিতবাদী) জেমস মিল ১৮১৭ সালে *The History of British India* নামক বইটি রচনা করেন, যা ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ।

ভারতীয়দের কী ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে? এই নিয়ে প্রাচ্যবাদীদের সঙ্গে এই সময়েই পাশ্চাত্যবাদীদের তর্ক বাধে। ১৮৩৩ সালের 'সনদ আইনের' মাধ্যমে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার কথা বলা হয়। টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ১৮৩৫ সালে তাঁর

[৯]শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

[১০]তদেব, পৃ. ৮১।

বিখ্যাত *শিক্ষা বিষয়ক কার্যবিবরণী* (Education Minute) প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার কথা জোরের সঙ্গে বলেন।

গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক (যিনি এই শিক্ষার দায়িত্বে ছিলেন) মিল-এর একজন উৎসাহী অনুগামী ছিলেন। তিনি আইন করে *সতীপ্রথা* (৪ই ডিসেম্বর ১৮২৯ খ্রিঃ) ও *শিশুহত্যা বন্ধ* করেন। ইউটেলিটেরিয়ান আদর্শে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি আইনের পথেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার পক্ষপাতী ছিলেন, উন্নয়নের পূর্বশর্তই ছিল আইনের অনুশাসন। অবশ্য একই সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যে বেন্টিঙ্কের বিশ্বাস অটুট ছিল।[১১]

ঠিক এভাবেই ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে ছলে-বলে-কৌশলে ভারতীয় উপমহাদেশ দখলের পাশাপাশি শাসনের ভীত দৃঢ় করার জন্য শাসক ইংরেজরা নিজেদের শাসনকে বৈধ প্রতিপন্ন করেছিল এবং নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহারের ফলে ভারতীয় সমাজের চলে আসা কু-রীতিগুলি দূর করতেও সচেষ্ট হয়েছিল।

ক. খ. ক. অক্ষয় দত্তের সময় বাংলা ভাষার অবস্থা-

আধুনিক বাংলা ভাষার উদ্ভব সেই সময়েই। বিজ্ঞান-দর্শন রচনার উপযুক্ত বাংলা ভাষার সৃষ্টি তখনই হয়েছিল। যদিও রামমোহন রায়ের রচনার মধ্যে দিয়ে এর সূত্রপাত ঘটেছিল। কিন্তু দত্ত ও বিদ্যাসাগর এই বিষয়ের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে এই বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে আর তেমন কিছু উল্লেখ করা হল না।

[১১]তদেব, পৃ. ৮৭।

ক. খ. খ. অক্ষয় দত্তের সময় বাংলার সামাজিক অবস্থা-

উনিশ শতকের বাংলা ছিল কুসংস্কারের নিগড়ে নিমজ্জিত, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। এর পাশাপাশি এই সময়েই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন হতে থাকে। নতুন এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে- 'পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী।' অক্ষয় দত্ত ছিল এর বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ঔপনিবেশিক যুগে এই শ্রেণী ছিল সর্বাগ্রগণ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাদের উদার, প্রতিবাদী-যুক্তিবাদী হতে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার, পশ্চাৎপদতা তাদের প্রতিবাদের বিষয় ছিল। এইসময় এই বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সামাজিক সংস্কার-প্রতিবাদ, বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠন গঠন এইসময় থেকেই হতে থাকে।

ক. খ. গ. অক্ষয় দত্তের সময় বাংলার সামাজিক আন্দোলন-

এই সময় হিন্দু সমাজের পুনরুদ্ধার ও সংস্কার দুই-ই দেখা যায়। যারা পুনরুদ্ধারের কথা বলেছেন তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দু। এঁরা হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার, গোঁড়ামি, পৌত্তলিকতা নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল। এবং হিন্দু ধর্মের ক্ষতি করেছেন মুসলিম শাসকরা ও ঔপনিবেশিক শাসকরা একথা তাঁরা বলতেন। এবং এই পুনরুদ্ধার করে তাঁরা নিজেদের (হিন্দু) শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে সংস্কারবাদীরা হিন্দু ধর্মের মধ্যে যা যুক্তিসন্মত তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এবং হিন্দু ধর্মের সংস্কারের জন্য তার বিদেশী শাসক ব্রিটিশদেরও সাহায্য নিতে পিছপা হননি। সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ চালু, তিন আইন পাশ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি।

ক. গ. ক. অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর পর বাংলা ভাষার অবস্থা-

১৮৬২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর শৈশবে আধুনিক বাংলা ভাষাকে পেয়েছেন। কিন্তু এই ভাষার অন্যতম স্রষ্টা অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছুই বলেননি। ফলে গবেষকরা মনে করেন এর জন্য অক্ষয় দত্ত জনমানসে প্রচার পায়নি। তিনি শুধুমাত্র বলেছিলেন, *'আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নূতন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচারপদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিয়েছিল।'*[১২] আমরা এইসময় সমৃদ্ধশালী বাংলা ভাষা দেখতে পেয়েছি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য রচনার সম্ভার এইসময় থেকে বহুল পরিমাণে প্রকাশিত হতে থাকে।

ক. গ. খ. অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর পর বাংলার সামাজিক অবস্থা-

অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর (১৮৮৬ সাল) পরবর্তী সময়ের বাংলার সামাজিক অবস্থা যথেষ্টই উন্নতির স্তরে ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর তথাকথিত এই সভ্য সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে কার্মাট্যাঁরে চলে যান। এই গবেষণা সন্দর্ভের প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ তাঁরা দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এবং অক্ষয়ের শেষ জীবনে বিদ্যাসাগরের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। এই সময়কার বাংলার সামাজিক উন্নয়ন ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়বস্তু হয়েছে। এই সামাজিক স্থিতি, উন্নয়ন হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতার জন্য।

ক. গ. গ. অক্ষয় দত্তের মৃত্যুর পর বাংলার সামাজিক আন্দোলন-

ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আন্দোলন শুরু হয় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গঠনের মধ্যে দিয়ে। *ভারতের জাতীয় কংগ্রেস* (১৮৮৫ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত) এরকম

[১২]আশীষ লাহিড়ী, *বঙ্গে বিজ্ঞান (উন্মেষ পর্ব)*, ২০১৮, পৃষ্ঠা. ২৯।

একটি রাজনৈতিক দল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থি গোষ্ঠীর উদ্ভব এই বাংলা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। এর পরবর্তী সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫-১১ খ্রিঃ) সময় এক উত্তাল বাংলা আমরা দেখতে পাই। এভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থি গোষ্ঠীর কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল বাংলা।

(খ) উনিশ শতকের বাংলার বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও নবজাগরণ(?)

ভারতবর্ষ শাসন করতে সচেষ্ট সব বিদেশী শক্তিদের নির্মূল (পরাজিত) করে ইংরেজরা সমগ্র ভারতবর্ষ নিজেদের করায়ত্ত করেছিল। তখন তারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত জুড়ে তাদের শাসনব্যবস্থা 'বিস্তার ও দৃঢ়' করতে চেয়েছিল এবং সেই প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রশাসনিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত নীতি গ্রহণ করেছিল যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এর ফলে উনিশ শতকের শুরু থেকেই ভারত জুড়ে এক সংস্কারধর্মী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শেই প্রাচ্যবাদী আন্দোলনে এক নতুন অভিমুখের সৃষ্টি হয়েছিল।

তাই উনিশ শতক জুড়ে আমরা দেখতে পাব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সমাজ সংস্কারের পক্ষে এক বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন। এই নতুন ধরণের আন্দোলন যা হয়ত ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল, কিন্তু বাংলায় কোনকালেই ব্যক্তিগত প্রতিভার খামতি ছিল না। একে একে রাজা রামমোহন রায়, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র-দের আমরা দেখতে পাব।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বিভিন্ন ভাষায় বুৎপত্তি সম্পন্ন রামমোহন রায় ছিলেন ঔপনিবেশিক বাংলার প্রথম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বলেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল জানিয়েছেন, রামমোহনের রচিত তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদ্দিন (Tuhfat-ul-Muwahhiddin)

[১৮০৩/০৪ সাল]-এ মুসলিম যুক্তিবাদের সূচনা পর্বের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।[১৩] তিনি কোন ইউরোপীয় দর্শন পড়ার পূর্বেই এই বইটি লিখেছিলেন। তিনি এই বইটিতে ইউরোপীয়ানদের মতন প্রায় সমস্ত কথাই বলেছেন, সমস্ত ধর্মের আশ্রয়ই মিথ্যা। আসলে তাঁর জীবনেও মুসলিম যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাব ছিল।

রামমোহন রায় ১৮১০ সালে কলকাতায় আসেন। এবং ১৮১৫ সাল থেকে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন।[১৪] তিনি ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিভাবলে কলকাতার অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত হতে থাকেন। তখন কলকাতায় যে সকল ইউরোপীয়ানরা বসবাস করতেন তাঁদের সাথে রামমোহনের সুসম্পর্ক ছিল। একদা তিনি আলেকজান্ডার ডাফ্-এর সাথে আলাপচারিতায় তৎকালীন ভারতের সাথে পুনঃসংস্কার ইউরোপের (Reformation Europe) এক অত্যাশ্চর্য মিলের কথা বলেছিলেন।[১৫] তিনি *'ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ'* ছিলেন, তাই তিনি আধুনিকতার জয়গান গেয়েছিলেন।

অক্ষয় দত্তের বাল্যকালে বাংলায় রামমোহন *'সতীদাহ প্রথা'*র বিরুদ্ধে এক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। প্রশ্ন তুলেছিলেন দীর্ঘদিনের পিতৃতান্ত্রিক *'কুলীন প্রথা'* ও নারীদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলী নিয়ে। সতীদাহ প্রথা রদের (১৮২৯ সাল) পরবর্তী বছরেই রামমোহন ব্রিটেনের উদ্দেশে রওনা হন। ১৮৩৩ সালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ফলতঃ তিনি ভারতে আর কোন সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লব (১৮৩০ সাল)-এর প্রতি তাঁর মমত্ববোধের পরিচয় আমাদের অজানা নয়।

---

[১৩]Sumit Sarkar, Ibid, 1985, p. 5.

[১৪]Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, 1979, p. 14.

[১৫]Sumit Sarkar, Ibid, 1985, p. 7.

কেবলমাত্র সামাজিক আন্দোলনের প্রতিই নয়, ঔপনিবেশিক ভারতের শিক্ষানীতি প্রসঙ্গেও রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক। ভারতীয়দের কিরকম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গে তিনি লর্ড আর্মহাস্টকে লিখলেন (১১ই ডিসেম্বর ১৮২৩ সাল)-

"যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্ত্তে বেকনের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্ণমেন্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্ত্তে এদেশীয়দিগের উন্নতি বিধান যখন গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদার রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত, গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান-বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্য্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে, ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটী কালেজ স্থাপন করিলে, ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"[১৬]

এই চিঠিটি ঔপনিবেশিক শাসকদের ভারতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণে সহায়কের কাজ করেছিল। এই চিঠিটির মূল নির্যাস বেন্টিঙ্ক-মেকলেরা তাদের শিক্ষানীতিতে প্রয়োগ করেছিল।

[১৬]শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, ২০১৬, পৃ. ৫৬ ও ৫৭।

এরপর রামমোহন নিজের উদ্যোগে ১৮২৫ সালে *'বেদান্ত কলেজ'* প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রাচ্য শিক্ষার সাথে পাশ্চাত্য কলা ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে শিক্ষা দিতেন।[১৭]

অক্ষয় দত্ত ঠিক এই শিক্ষা ব্যবস্থাই পেয়েছিলেন কলকাতায় পৌঁছে। *'নেটিভ'*দের জন্য রামমোহনের শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বোঝা যায় 'ইংরেজি ভাষা' শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহের মাধ্যমে। তখন বাংলা জুড়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার এক ঝড় উঠেছিল এবং দিকে দিকে পাশ্চাত্য (ইংরেজি) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এরকমই একটি প্রতিষ্ঠানে অক্ষয় দত্তের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল।

রামমোহন যখন ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, ব্রাহ্ম আন্দোলন, সতীদাহ প্রথা বন্ধের আন্দোলন করেছিলেন তখন পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষার আবশ্যিকতার পক্ষেও মত দিয়েছিলেন। এমনকি শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি তা মজবুত করার জন্য পরাধীন দেশে ব্রিটিশদের ছত্রছায়ায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজেও মনোনিবেশ করেছিলেন।

এই সময়ই একজন তরুণ শিক্ষকের আবির্ভাব হয়, যিনি সবরকম ধর্মীয় জড়তা-কূপমন্ডুকতা থেকে মুক্ত ছিলেন। যিনি শিল্প বিপ্লব (ইংল্যান্ড, আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ), আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন (১৭৮৩ সাল) ও ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯ সাল) প্রসূত স্বাধীন-মুক্তমনা চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক ছিলেন। ধূমকেতুর মতন তাঁর আগমন হলেও তিনি যে মুক্তিকামী মানুষ ছিলেন একথা অনস্বীকার্য। তিনি সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে থেকেও আবার সেই সময়কার বাংলার উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি সেই সময়কার বিশ্বজোড়া সামাজিক আন্দোলনের ফসল ছিলেন। তিনি হেনরি লুই ভিভিয়ান দ্য রোজারিও (১৮০৯-৩১ সাল)।

[১৭]Susobhan Sarkar, Ibid, p. 18.

তিনি ডিরোজিও নামেই সমধিক পরিচিত। ডেভিড ড্রামন্ডের (১৭৮৫-১৮৪৩ সাল) *ধর্মতলা অ্যাকাডেমি*-তে ডিরোজিও শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে একদা বলেছিলেন, "এই স্কুলের প্রধানতম অবদান অনুদরতা থেকে মুক্তি।"[১৮] এই শিক্ষাটাই তিনি তাঁর ছাত্রদেরও দিতে চেয়েছিলেন, বলা ভাল সে কাজে তিনি যথেষ্ট সফলও হয়েছিলেন।

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮ সাল), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫ সাল), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮ সাল), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০ সাল), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮ সাল) কমবেশি সকলেই পরবর্তী জীবনে তাঁদের কৈশোরের গুরুর (ডিরোজিও) আদর্শকে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। আপস করেননি। মাঝপথে হাল ছেড়ে দেননি।[১৯]

মনস্বী শিবনারায়ণ রায়ের (১৯২১-২০০৮ সাল) এই মন্তব্যটি মনে রাখতেই হয়, "বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে বিবেকিতার অনুবন্ধী সম্পর্কের এই আদর্শ কলকাতার তরুণ ছাত্রসমাজের উনিশ শতকের সূচনায় প্রবর্তন করেন ধর্মতলা অ্যাকাডেমির দার্শনিক শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ড এবং তাঁরই প্রিয় ছাত্র হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তরুণ ছাত্রদের তাঁরা শুধু মুক্তবুদ্ধির চর্চায় দীক্ষিত করেননি। বাক্যের সঙ্গে কর্মের, আদর্শের সঙ্গে আচরণের, ঘোষিত বিশ্বাসের সঙ্গে জীবনযাত্রার ঐক্যসাধনেও তাঁরা তাদের অনুপ্রেরিত করেছিলেন। এই দুই আদর্শ শিক্ষকের প্রভাবে এবং ডিরোজিও শিষ্য *'ইয়ং বেঙ্গল'* তরুণদের উদ্যোগে কলকাতার শিক্ষিত সমাজে যে নৈতিক-বৌদ্ধিক রূপান্তরের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র এবং অক্ষয়কুমারের চারিত্রিক বিকাশে তারা সহায়ক হয়।"[২০]

---

[১৮]অশোক মুখোপাধ্যায়, *ডিরোজিও ও অক্ষয়কুমার দত্ত*, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৯।

[১৯]তদেব, পৃ. ২০।

[২০]তদেব, পৃ. ২৫।

গোঁড়া হিন্দুদের সাথে প্রবল বাক্-বিতণ্ডায় জড়িয়ে গিয়েছিল ইয়ং বেঙ্গলীরা। তাই মৃত্যুর ৩ মাস আগে নিজের *'পার্থেনন'* পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশে লিখেছিলেন, প্রতিপক্ষকে কটু ভাষায় গালাগাল দিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না।... দেশীয় প্রগতির একজন সুহৃদ হিসাবে এই জাতীয় মনোভাব দেখে বেদনা বোধ করছি; গালাগালি নয়, চাই পরস্পরের মধ্যে সৌজন্যমূলক ব্যবহার।

প্যারিচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) তাঁর সম্বন্ধে লেখেন, He used to impress upon his pupils the sacred duty of thinking for themselves-to be uninfluenced by any of the idols mentioned by Bacon-to live and die for truth-to cultivate and practise all the virtues shunning vice in every shape."

কৃষ্ণমোহন (তখন তিনি সদ্য খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন) ১৮৩৫ সালে তাঁর নিজের পত্রিকায় লেখেন, "ডিরোজিও কখনও বলেননি, তুমি নাস্তিক হও, উচ্ছৃঙ্খল হও। বরং তিনি বলতেন, তুমি জিজ্ঞাসু হও, উচ্চ নৈতিক আদর্শের উপর জীবনের প্রয়োজনবোধকে স্থাপন কর। নাস্তিকতা বড় মূল্যবোধের পরিপন্থী নয়।"[২১] তিনি ভারতীয় সমাজের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যগত আচার-বিচার, ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতপাত মানতেন না। ফলে সহজেই তিনি গোঁড়া হিন্দুদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পরেছিলেন।

তিনি 'পার্থেনন' পত্রিকায় হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, কিন্তু দেশমাতৃকার প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল। তিনি ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদের কথা লিখেছেন। *ক্যালিডোস্কোপ* নামক পত্রিকায় সিপাহি বিদ্রোহের ২৭ বছর আগে, ১৮২৯ সালের এক সংখ্যায় ডিরোজিও তাঁর একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন, "সাধারণভাবে বিচার করলেও সকলেই বুঝতে

[২১]তদেব, পৃ. ২৩।

পারবেন যে কেবলমাত্র সামরিক সৈন্যবাহিনীর দ্বারা এই দেশকে পদানত করে রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করুন; দেখবেন, ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করার পরিবর্তে ভারতবাসী সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।"[২২] দুরারোগ্য কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মুমূর্ষু ডিরোজিও-এর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি দেখে সুরেশ চন্দ্র মৈত্র লিখেছিলেন, "নিজের মুক্তি নয়, দেশের মুক্তিই হল তাঁর অন্তিম ইচ্ছা।"[২৩]

এই প্রেক্ষাপটেই আমরা অক্ষয় দত্তকে দেখতে পাই। তিনি ডিরোজিও-এর মতন বললেন, *Truth is the goal, reason is the way.* কিন্তু ডিরোজিও ও অক্ষয় দত্তের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ডিরোজিও বিদেশী ছিলেন বলে তাঁর প্রগতিশীল কথাগুলিকে গুরুত্ব দেয়নি। আর অক্ষয়ের যুক্তিবাদী কথাগুলি বৈজ্ঞানিক ধারার আধারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কোন ধর্মীয় শাস্ত্রকে গুরুত্ব দেননি, এর কোন ফাঁক পূরণেরও দায়িত্ব নেননি। যা সত্য, যুক্তি-বিজ্ঞানের পক্ষে তাই বলেছেন ও মেনেছেন।

তাঁর সমসাময়িক আর একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই দুই জনের বন্ধুত্ব যেমন গভীর ছিল ঠিক তেমন তাঁরা একত্রে তাত্ত্বিক-সাংগঠনিক লড়াই করেছিলেন উনিশ শতক জুড়ে। আমরা দেখেছি কোন কোন কর্মক্ষেত্রে অক্ষয় দত্ত যদি এগিয়ে থাকেন, অন্যান্য দিকগুলিতে তাহলে এগিয়ে রয়েছেন বিদ্যাসাগর। ফলে, এই দুই ব্যক্তিত্বের যৌথ কর্মসূচী তৎকালীন সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইতালিয় রেনেশাঁস (Renaissance)-এর অর্থ *"নবজাগরণ"*। এই নবজাগরণের মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। নবজাগরণ মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মনে যুক্তিবাদ,

---

[২২]তদেব, পৃ. ২৪।

[২৩]তদেব, পৃ. ২৭।

মানবতাবাদ, প্রযুক্তির ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপের মতন আমাদের দেশে এই নবজাগরণের ঢেউ দেখা গিয়েছিল উনিশ শতকে। জ্ঞানদীপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি, পাশ্চাত্যের প্রভাব ইত্যাদি বাংলার ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। উনিশ শতকের এই ঘটনাবলীকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

স্যার যদুনাথ সরকার এই ভারতীয় জাগরণকে ইউরোপের সাথে তুলনা করেছেন। এই জাগরণকে তিনি ইউরোপের থেকে বেশি সুদূরপ্রসারী, গভীর ও বৈপ্লবিক বলেছেন এবং একেই নবজাগরণ বলেছেন। ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার, অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত একে নবজাগরণ বলেছেন। পাদ্রি আলেকজান্ডার ডাফ এই সময়ে 'এক শুভ যুগের সূচনা' হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী নবযুগের কথা বলেছেন।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় বলেছেন, ইউরোপীয় নবজাগরণের সাথে ভারতীয় নবজাগরণের কোন তুলনা নেই। তিনি ও অশোক মিত্র এই তথাকথিত নবজাগরণকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ সাল)-এর ফলে সৃষ্ট নব্য জমিদার শ্রেণীর একটি প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করেছেন। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরাও এই মতকে সমর্থন করেছেন। সামগ্রিকভাবে ইউরোপের নবজাগরণের সাথে আমাদের দেশের নবজাগরণের পার্থক্য থেকে গিয়েছিল তাই একে 'বাঙালির সংস্কৃতি', 'বাংলার নবজাগৃতি' বলেও অনেকে উল্লেখ করেছেন।

রাজা রামমোহন রায়, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অন্যান্যরা বাংলার নবজাগরণকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। অক্ষয় দত্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, চিন্তক-সমাজ সংস্কারক, কিন্তু তিনি এখনও ইতিহাসের একজন উপেক্ষিত ও প্রায় বিস্মৃত এক চরিত্র।

১৯৭০'র উত্তাল সময়ে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যখন রেনেশাঁর সমালোচনা করা হয়েছে, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ভূমিকা/কাজ প্রশ্নের মুখে পরেছে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। সে সময় কিন্তু রেনেশাঁর সমালোচক বা সমর্থক কোন পক্ষই অক্ষয় দত্তকে ছুঁয়ে সমালোচনা বা তাঁর পিঠ চাপরাতে চায়নি। অর্থাৎ তাঁকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা কিছুই হয়নি। কিন্তু তিনি জন্মের ২০০ বছরের পর থেকে একটু একটু করে আলোচনার কেন্দ্রে এসেছেন।

(গ) অক্ষয়কুমার দত্তঃ জীবনী[২৪]

বংশ পরিচয়

বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষেরা টাকির কাছে গন্ধর্ব্বপুর গ্রামে বাস করতেন। তাঁরা বঙ্গজ কায়স্থ। অক্ষয়কুমারের প্রপিতামহ রাজবল্লভ বর্ধমান রাজসরকারের কাজ করতেন। তিনিই প্রথম গন্ধর্ব্বপুরের বাস উঠিয়ে, নবদ্বীপের কাছে চুপী গ্রামে বসবাস করা শুরু করেন।

রাজবল্লভের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর ছোট ছেলে রামশরণ শিশু মাত্র। মাতার অনুগত রামশরণ ছোটবেলা থেকেই বিধবা মাতার সঙ্গে নিরামিষ ভোজনে এমনি অভ্যস্ত হয়ে যান যে, তিনি চেষ্টা করেও জীবনে কখন মাছ মাংস স্পর্শ করতে পারতেন না। রামশরণের চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর। পীতাম্বরের শেষ সন্তান অক্ষয়কুমার। পিতামহ রামশরণের আমিষ-বিতৃষ্ণা নাতি অক্ষয়কুমারে বর্ত্তিয়েছিল; "আমিষ অবিধি" বলে আন্দোলন করার অন্তর্গূঢ় কারণ অক্ষয়কুমারের অস্থিমজ্জার মধ্যেই নিহিত ছিল।

[২৪]অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ (তৃতীয় ভাগ), পৃ. ।৶৹- ১৶৹ (ভূমিকা)।

পীতাম্বর দত্ত মহাশয় খিদিরপুর কুতঘাটের কেশিয়ার (হিসাব রক্ষক) ছিলেন। বেতন অল্প, কিন্তু, নিজের ব্যয় সাধ্যমত সংক্ষেপ করে, কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে, প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীদের জন্য, দুষ্প্রাপ্য ওষুধপত্র সংগ্রহ করে আনতেন। শোনা যায়, গ্রামে ফিরে পীতাম্বর বয়স্কদের শ্রদ্ধার সাথে প্রণাম করতেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু হলেও, এ বিষয়ে তিনি জাত-পাত মেনে চলতেন না।

পীতাম্বরের স্ত্রীর নাম দয়াময়ী। কৃষ্ণনগরের কাছে ইটল গ্রামে দয়াময়ীর পিতার বাড়ি। পিতার নাম রামদুলাল গুহ। সৌজন্য, দয়া, বিচক্ষণ বিবেচনায় এবং সহজ বুদ্ধির প্রাচুর্য্যে দয়াময়ী পীতাম্বরের প্রকৃত সহধর্মিণী ছিলেন।

জন্ম

১৫ই জুলাই ১৮২০ খ্রিঃ (১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ), হোরা পঞ্চমীর দিনে চুপীর বাড়িতে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ঐ বছরে আর একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উভয়ের জন্ম বছর যেমন এক, কাজের ক্ষেত্রেও তেমনি নানা সূত্রে বহুবার দুই জনকে একসাথে দেখতে পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের জন্মের আগে, দয়াময়ীর আরও তিন চারটি সন্তান হয়, তারা সবাই অল্প বয়সে মারা যায়।

বাল্যকাল

মৃত-বৎসা মায়ের আদরের সন্তান অক্ষয়কুমার মাতৃ-মনের সমস্ত স্নেহ একাই ভোগ করতে পেরেছিলেন। মনে হয়, এইজন্য তাঁর মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাব তেমন করে কখনও মাথা তুলতে পারে নি। তাঁর বৈষয়িক চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, পাওনা-গন্ডা বুঝে নিতে, অক্ষয়কুমারের তেমন আগ্রহ ছিল না; অপর পক্ষ সন্তুষ্ট মনে ধর্ম ভেবে, যতটুকু দিতে স্বীকৃত হন, তাই তিনি যথেষ্ট মনে করেন, মোটের উপর বিরোধ মিটলেই তিনি বেঁচে যান। ছোটবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত

নিরীহ ও নির্বিরোধ ছিলেন। এই শান্তগম্ভীর বালকটির কৌতূহলের কিন্তু শেষ ছিল না। কাঠাকালি আঁক কষতে গিয়ে পৃথিবী কয় কাঠা,[২৫] তা জানার জন্য তাঁর কৌতূহল জন্মেছিল।

এইভাবে কয়েক বছর গ্রামের পাঠশালায় পড়াশুনা করে দশ বছর বয়সে অক্ষয়কুমার খিদিরপুরের বাড়িতে আসেন। এর সময়ে পিয়ার্সন সাহেবের প্রাকৃতিক ভূগোলের বঙ্গানুবাদ তাঁর হাতে আসে। জিজ্ঞাসু শিশুর মনে এতদিন আত্মীয় স্বজন ও গুরুমহাশয়ের কাছে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিশ্ব-ব্যাপার সম্বন্ধে যেটুকু অভিজ্ঞতা সংগৃহীত হয়েছিল, তা যে একেবারেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, সে বিষয়ে তাঁর আর সন্দেহ রইল না। আগেই চাণক্যের শ্লোক পড়ার সময়, সর্বত্র পূজ্য বিদ্বান হওয়ার জন্য তাঁর মন লালায়িত হয়েছিল; এইবার দশ বছর বয়সের অক্ষয়কুমার, জ্ঞানের আকর ইংরেজী ভাষা শেখার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন।

কিছুদিন তিনি এক মাষ্টারের কাছে পড়লেন। কিন্তু সেই মাষ্টার ভাল ইংরেজি জানতেন না। অক্ষয়কুমার অল্প দিনেই সে কথা বুঝতে পারলেন এবং পিতৃব্য পুত্র হরমোহন দত্তের কাছে অনুযোগ করিলেন। অভিভাবকেরা তাঁর শিক্ষা-বিষয়ে তেমন মনোযোগ দিচ্ছেন না দেখে, তিনি এক মিশনারি স্কুলে ভর্তি হলেন। তখনকার নিষ্ঠাবান হিন্দুরা খ্রিষ্টান স্কুলে ছেলেকে পড়তে পাঠান ভাল মনে করতেন না। অভিভাবকরা ভয় করলেন, ছেলে বুঝি খ্রিষ্টান হয়ে যাবে। এইবার অক্ষয়কুমারকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে ভর্তি করা হল। খিদিরপুর থেকে রোজ পায়ে হেঁটে যাতায়াত করাতে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে, অক্ষয়কুমার নিজের পিসতুতো ভাই রামধন বসু মহাশয়ের কলিকাতার বাড়িতে আশ্রয়গ্রহণ করলেন। এই সময় তাঁর বয়স প্রায় ষোল বছর; তার আগেই, তের বছর বয়সে, আগড়পাড়ার রামমোহন ঘোষের কন্যা শ্যামাসুন্দরীর সাথে অক্ষয়কুমারের বিয়ে হয়।

[২৫]পৃথিবী কত বড়? পৃথিবীর কি পরিমাপ করা যায় না?

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অক্ষয়কুমার একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। রীতিমত ইংরেজি শিক্ষার এই আরম্ভ। পরের বছর পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ায়, স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়ে দেন। তার কিছুদিন পরেই পীতাম্বর দত্ত মহাশয়ের কাশীধামে মৃত্যু হয়। সে সময়ে অক্ষয়কুমার তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। পিতার মৃত্যুতে তাঁর অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন পড়ল এবং তার ফলে স্কুলও তাঁকে ছাড়তে হল।

সমাজোন্নতিবিধায়িণী সুহৃদসমিতি

সমাজসংস্কারমূলক কাজের সাথে অক্ষয়কুমারের বিলক্ষণ যোগ ছিল। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৪ তারিখে কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে সমাজোন্নতিবিধায়িণী সুহৃদসমিতির সূচনা হয়। এই সভায় অক্ষয়কুমার দত্তের পোষকতায় কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেন, "স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্য বিবাহ বর্জন এবং বহুবিবাহ-প্রচলন-রোধের নিমিত্ত সমিতির শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হউক।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সভাপতি, এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। এই সমিতির সদস্যদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রাধানাথ শিকদারের নাম উল্লেখযোগ্য।

কর্মজীবন

প্রভাকর-সম্পাদক, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরের জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে, হরমোহন দত্তের কাছে প্রায়ই যেতেন। হরমোহন দত্ত মহাশয় সুপ্রিম কোর্টের কাজ করতেন। এই সূত্রে অক্ষয়কুমারের সাথে গুপ্ত-কবির পরিচয় হয়। একদিন ঈশ্বরচন্দ্রের সহকারী অনুপস্থিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন অক্ষয়কুমার "প্রভাকর"-কার্য্যালয়ে বেড়াতে যান। গুপ্ত-কবি অক্ষয়কুমারকে প্রভাকরের জন্য ইংরেজি খবরের কাগজ থেকে কিছু অনুবাদ করে দিতে বলেন;

তাতে অক্ষয়কুমার বলেন, "আমার দ্বারা তা সম্ভব না, আমি কখনও গদ্য লিখি নি।" শেষে গুপ্ত-কবি আবার অনুরোধ ক্রমে অক্ষয়কুমার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। লেখা দেখে, ঈশ্বরচন্দ্র বললেন, "যিনি বহুদিন অবধি এই কাজ করে আসছেন, তিনিও এমন সুন্দর লিখতে পারেন না।" সেই থেকে অক্ষয়কুমারের গদ্য-রচনার সূত্রপাত। তার আগে তিনি কেবল "অনঙ্গ-মোহন" নামে একটি পদ্য-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বইটির এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নি।

বিদ্যালয় ছাড়লেও অক্ষয়কুমার বিদ্যাচর্চা ছাড়েন নি। এই সময়েই তিনি নিজের চেষ্টায় উচ্চাঙ্গের গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান এবং জার্মান প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। এ সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাতি, হিন্দু কলেজের ছাত্র, আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁর সহায়? ছিলেন। বিদ্যাসাগর ইংরেজি সাহিত্য চর্চা করার জন্য প্রায়ই আনন্দমোহনের কাছে যেতেন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের আলাপ হয়।

১২৪৬ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি সভা স্থাপন করেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সভার সদস্য ছিলেন। তাঁর কথায় অক্ষয়কুমারও ঐ সভার সদস্য হন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপের এই সূত্রপাত। পরের বছরে এই সভার উদ্যোগে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" স্থাপিত হয়। অক্ষয়কুমার মাসিক আট টাকা বেতনে ঐ পাঠশালার পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলের শিক্ষক হন।

১২৪৮ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার আর্থিক আনুকূল্যে তাঁর লেখা "ভূগোল" বই প্রকাশিত হয়। এই বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি মাত্র নমুনা আছে। ১২৪৯ সালে, অক্ষয়কুমার টাকির প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায়, বিদ্যাদর্শন নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিদ্যাদর্শন-এর মোট ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১২৫০ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা প্রথম প্রচারিত হয় এবং অক্ষয়কুমার তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রবন্ধ-গৌরবে এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে তত্ত্ববোধিনী অল্পদিনের মধ্যেই দেশ বিখ্যাত হয়ে উঠল। তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় বাংলা ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তৎসত্ত্বেও পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা সাতশ ছিল। বন্ধুবৎসল বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারকে মাসিক দেড়শ টাকা মাইনেতে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের কাজ করে দেওয়ার জন্য সমস্ত ঠিকঠাক করলেন, কিন্তু অক্ষয়কুমার সে কাজ গ্রহণ করলেন না। তত্ত্ববোধিনীর সংশ্রবে থাকলে স্বদেশে সুশিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করতে পারবেন- শুধু এই আনন্দে তিনি ষাট টাকার চাকরীতেই সন্তুষ্ট থাকলেন।

লিখতে আরম্ভ করলে, অক্ষয়কুমারের সংজ্ঞা থাকত না। লিখতে লিখতে সন্ধ্যা হয়ে যেত, চাকররা বাতি জ্বালিয়ে খাবার রেখে, দরজা-জানালা বন্ধ করে, প্রস্থান করত, তবুও তাঁর হুঁস নেই। সকালে পত্রিকা-সম্পর্কীয় কর্মচারীরা নিয়মিত সময়ে কার্যালয়ে এসে দেখত, খাবার পড়ে আছে, অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষার জন্য "অক্ষয় যশের মালা" রচনা করতে ব্যস্ত। দীর্ঘ বার বছরকাল এইরকম কঠোর পরিশ্রম করায়, শরীর ভেঙ্গে পরে। অর্শ ও উদারময় আগেই দেখা দিয়েছিল। তার উপর ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে মূর্চ্ছার সঙ্গে দুশ্চিকিৎস্য শিরোরোগে তিনি আক্রান্ত হলেন। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকতা ছাড়তে হল। অতঃপর তিনি কিছু দিন নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছিলেন। কিন্তু পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায়, তাও ছাড়তে হল। এই সময়ে বিদ্যাসাগরের যত্নে ও প্রস্তাবে তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে তাঁর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা হল। তাতে তিনি সাংসারিক আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে কিছুটা পরিমাণে অব্যাহতি পেলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার এই বিশেষ বৃত্তি অক্ষয়কুমার বেশি দিন গ্রহণ করেন নি। বইয়ের লাভে যেমনই গ্রাসাচ্ছাদনের অসুবিধা দূর হল, অমনি তিনি বিনয়ের সাথে লিখে পাঠালেন,- "আমি আর তত্ত্ববোধিনী সভাকে ক্ষতিগ্রস্ত করব না।"

সাহিত্য-জীবন

অক্ষয়কুমারের প্রথম রচনা *'অনঙ্গমোহন'* (১৮৩৪ সাল?) এখন পাওয়া যায় না। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস 'অক্ষয় চরিতে' এই বইটি সম্বন্ধে লিখেছেন- ন্যূনাধিক চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত "অনঙ্গমোহন" নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা বর্ত্তমান বটতলার গ্রন্থাবলি হইতে কোনও অংশে উৎকৃষ্ট নহে। ইহা "কামিনী কুমারের" সমতুল্য-তদ্রূপ রুচির পরিচায়ক।

১২৪৮ সালে তাঁর ভূগোল (গ্রন্থটি) প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স প্রায় একুশ বছর। ভূগোল প্রকাশের আগে থেকেই অক্ষয়কুমার নীতি-তরঙ্গিণী সভায় যেসমস্ত বক্তৃতা করেন এবং প্রভাকরে যেসমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলির সমসাময়িক উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি এখনো শোনা যায়। দুঃখয়ের (দুঃখের) বিষয়, সে সমস্ত রচনা রক্ষিত হয় নাই।

ভূগোলের পর ১৭৭৩ শকে বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের প্রথমভাগ এবং ১৭৭৪ শকে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। দুই ভাগই জর্জ কুম্ব রচিত *Constitution of Man* নামক গ্রন্থের মূলতত্ত্বের ভিত্তির উপরে লেখা। মৌলিক গবেষণাও এতে যথেষ্ট আছে। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় জীবনযাত্রা নির্বাহের নিয়মগুলিকে নিরপেক্ষভাবে তুলনায় সমালোচনা করে, প্রকৃত পন্থা নির্দেশের অকৃত্রিম চেষ্টাও এতে দেখা যায়। প্রথম ভাগ আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় ভাগ সুরাপান নিবারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে যে দুটি

আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তার ফলে অনেকেই-বর্ধমানের মহারাজ পর্যন্ত-মাছ মাংস ত্যাগ করেন, এবং ভদ্র সমাজে মদের প্রভাব অনেক পরিমাণে কমে যায়।

১৭৭৪ শকে চারুপাঠের প্রথম ভাগ, ১৭৭৬ শকে দ্বিতীয় ভাগ এবং ১৭৮১ শকে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মনীতি ও পদার্থবিদ্যা যথাক্রমে ১৭৭৭ ও ১৭৭৮ শকে প্রকাশিত হয়েছিল। .....১৭৯২ শকে এই উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ এবং ১৮০৪ শকে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই বৃহদায়তন গ্রন্থ পুরাতত্ত্বের নানা জটিল তথ্যের মীমাংসায় এবং কূট তর্কের আলোচনায় পরিপূর্ণ, অথচ যখন তা লেখা হয়, তখন অক্ষয়কুমার অর্শ, উদারময় এবং মস্তিষ্কের পীড়ায় অস্থির। কারও সঙ্গে জোরে কথা বললে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়; দুই চারটি পংক্তির বেশি একসাথে রচনা করতে পারেন না এবং যতটুকু রচনা করেন, সেটুকুও নিজে লিখতে গেলে মাথা ঘোরে। মকরধ্বজ চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি ওষুধের শিশি কৌটায় ঘর বোঝাই। পথ্য পলতার ঝোল, মাংসের ক্বাথ, বেলের মোরব্বা। কিন্তু "ঈপ্সিতার্থ-স্থির-নিশ্চয় মন" অপটু শরীর ও পীড়িত মস্তিষ্কের উপর জয়ী হল। দুশ্চর তপস্যা নিস্ফল হওয়ার নয়। বিশেষজ্ঞ ম্যাক্সমূলার লিখলেন- "আপনার মূল্যবান মৌলিক গবেষণা সংবলিত উপাসক সম্প্রদায় পড়ে আনন্দলাভ করলাম।"

অক্ষয়কুমারের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ছেলে রজনীনাথ দত্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় অক্ষয়কুমারের আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার"।

অক্ষয়কুমারের প্রবর্তিত রচনা প্রণালী বহুদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে আদর্শ রচনা প্রণালীরূপে প্রচলিত ছিল। তাঁর প্রণালীর অনুসরণে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অন্যতম। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের গ্রন্থাবলীতেও অক্ষয়কুমারের প্রভাব অল্পবিস্তর অনুভূত হয়।

বঙ্গভাষার ব্যাকরণকে কোন কোন বিষয়ে সংস্কৃত নিরপেক্ষ করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। সম্বোধন পদে 'মুনে!' 'দেবি!' প্রভৃতির পরিবর্তে 'মুনি!' 'দেবী!' লেখার রীতি তিনিই প্রবর্তন করেন।

ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, শারীরবিধান, তড়িৎ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত নানা বিষয়ের প্রবন্ধ রচনার সময়ে সুতীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকেও অনেক পরিমাণে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। বাংলা ভাষা এজন্যও যে তাঁর কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী, তাতে সন্দেহ নেই।

শেষ জীবন

বালিগ্রামে 'শোভনোদ্যান' নামে নিজের উদ্যান বাড়িতে অক্ষয়কুমারের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। শোভনোদ্যান ক্ষুদ্র হলেও, সেকালে "ছোট বোটানিক্যাল গার্ডেন" নামে পরিচিত ছিল। নানাদেশ থেকে আনা এত বিচিত্র তরুলতার সংগ্রহ, তখন এদেশের আর কোন উদ্যানেই ছিল না।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই সময়ে অক্ষয়কুমার বিষয় কাজ কিছুই দেখতে পারতেন না। কর্মচারীরা যা খুশি তাই করত। এদের মধ্যে একজন কয়েক হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়; শেষে শাস্তির ভয় দেখিয়েও চিঠি লিখলে, ঐ ব্যক্তি উত্তরে লেখেন,-"আমি বিধবা-বিবাহ করলে আপনি আমাকে পুরষ্কৃত করবেন বলেছিলেন, আমি বিধবা বিবাহ করেছি, মনে করবেন।" অক্ষয়কুমার অনুসন্ধান করে জানেন, লোকটি বিধবা বিবাহ করেছেন; জেনে চিঠি লিখলেন,- "সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করলাম।" এরকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। তিনি নিজে তালি দেওয়া জুতা জামা এবং তালি দেওয়া তৈজস ব্যবহার করতেন, অথচ দুঃস্থের দুঃখ দূর করতে এবং সর্ব্ববিধ, সদানুষ্ঠানের জন্য প্রার্থীর প্রার্থনার অতিরিক্ত চাঁদা দিতে অক্ষয়কুমার মুক্তহস্ত ছিলেন।

তাঁর গৃহসজ্জা ছিল-প্রস্তরীভূত জীবজন্তু, শঙ্খ-শম্বুক, যত্নের সামগ্রী ছিল আশ্রম-তরুগুলি; এবং চিত্ত-বিনোদনের উপায় ছিল-রাসায়নিক ও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা। রোজ ভোরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য একটি গাড়ি রেখেছিলেন। গাড়িটি ছিল-বিষম ভারী, ঘোড়াটির ছিল-মন্থর গতি; তার উপর গাড়ি চালান হত খুব ধীরে। গাড়ি জোরে চালালেই তাঁর মাথা ঘোরা শুরু হয়ে যেত। শোনা যায়, সেকালে বালিগ্রামের অল্পবয়স্ক বালকেরা, সহপাঠীদের মধ্যে যারা জড়ভাবাপন্ন, তাদেরকে "অক্ষয় দত্তের ঘোড়া" বলে ঠাট্টা করত!

শিরঃপীড়ার প্রকোপে ধীরে ধীরে অক্ষয়কুমারের একটি চোখ ছোট হয়ে গেল, অনবরত কবিরাজী তেল মালিশ করায়, সামনের চুলগুলি ছোট হয়ে পড়ল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিন হল এবং দেহ জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় বেশি লোকের সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারতেন না, অথচ তাঁর মন একেবারে নীরস হয়ে যায় নি। ছোটবেলার অভ্যাস মত বৃদ্ধ বয়সেও রোজ কতগুলি কাককে নিজের খাবারের অংশ দিয়ে আনন্দ লাভ করতেন। রোজ বেড়াতে যাওয়ার সময়, দানে এবং কুশল প্রশ্নে, পথের অন্ধ, অনাথ সকলকেই "তুষিয়া যাইতেন"। কিছুদিন আগে রাজনারায়ণ বসুর পুত্র যোগেন্দ্রনাথ বসু "প্রবাসী"তে পিতৃবন্ধু অক্ষয়কুমারের যে চিঠিগুলি প্রকাশ করেছিলেন, তাতেও এই সরসতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অক্ষয়কুমার পাঠ্যাবস্থায় মহাকবি হোমার রচিত ইলিয়াড কাব্যের পোপের করা ইংরেজি অনুবাদ পড়ে জানতে পারেন যে, প্রাচীন গ্রীসও আমাদের ভারতবর্ষের মত বহু দেবতার আরাধনা করত। শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করে জানলেন, গ্রীস এখন একেশ্বরবাদী এবং সমগ্র গ্রীস জাতি আগে যেসব দেবতাদের ভয়ে কম্পমান ছিল, সেই সব দেবতারা এখন কৌতুকাগারে কৌতুকের সামগ্রী হয়ে আছেন। অক্ষয়কুমারের মনের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হল; তিনি প্রতিমা পূজার বিরোধী হলেন। এই ঘটনার কয়েক বছর পরে, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে এসে তিনি ব্রাহ্মমত অবলম্বন

করেন। এর পরে, বিজ্ঞানসম্মত পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠে, মানুষের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয় বোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ইন্দ্রিয় বোধেরই সমষ্টি মাত্র, এইরকম তাঁর ধারণা জন্মায়। তত্ত্বান্বেষী অক্ষয়কুমার সুতরাং কতকটা অজ্ঞেয়বাদী হয়ে পড়লেন। শেষ বয়সে, মনে হয়, বহু আলোচনা ও বহু দর্শনের ফলে, জগতের আদিকারণ বিশ্ববীজের প্রতি জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার আবার আস্থাবান হয়েছিলেন। হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কয়েক বছর আগে বঙ্গদর্শনে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন; ঐ প্রবন্ধ পরে জানা যায় যে, চিঠিপত্রের শিরোদেশে লোকে যেমন 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়', 'শ্রীহরি শরণ', 'ওঁ' প্রভৃতি লেখেন, অক্ষয়কুমার শেষ বয়সে তেমনি 'বিশ্ববীজ' লিখতেন।

অক্ষয়কুমার বালি গ্রামে, গঙ্গাতীরে প্রায় এক বিঘা জমির উপর উদ্যান সমেত একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। উদ্যানটির নাম রাখেন- 'শোভনোদ্যান'। বিচিত্র বৃক্ষ লতা গুল্ম উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করেছিল। একটি চিঠিতে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন- "আমার আশ্রম বৃক্ষগুলি বড়ই ভাল আছে। তাহাদিগকে সতত দেখিয়া ও লালন পালন করিয়া সমধিক সুখী হই।" শিরোরোগে কষ্ট পেলে এই উদ্যানে বিচরণ করে অক্ষয়কুমার অনেকটা উপশম বোধ করতেন।

৩১ বছর দুরারোগ্য রোগে ভোগার পর ২৭শে মে ১৮৮৬ খ্রিঃ (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩) অক্ষয়কুমারের মৃত্যু হয়। সামান্য অবস্থার গৃহস্থ হয়েও তিনি স্বোপার্জিত সম্পত্তির প্রায় এক-চতুর্থাংশ দরিদ্র সেবায় ও সাধারণের উপকারে নিয়োজিত করে গেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
শিক্ষাবিদ অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমার দত্ত যখন জন্মেছেন এবং শিক্ষালাভ করেছেন, তখন এদেশে শিক্ষার হার ছিল খুবই নগণ্য। তখন এদেশে ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের, বিদেশী ও স্বদেশী কিছু মহৎ ব্যক্তির ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে শিক্ষা দ্রুত ব্যাপ্তি লাভ করতে থাকে। তাছাড়া তখনও দেশীয় প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সচল ছিল। অক্ষয়ের পরিবার শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর পরিবার ছিল একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর পিতা-মাতা ও জ্যেষ্ঠ দাদা হরমোহন দত্তের বিশেষ প্রভাব ছিল।

(ক) নিজের শিক্ষা

ক. ক) ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার প্রতি অনুরাগ

দেশীয় প্রথা অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে ৫ বছর বয়সে অক্ষয়ের বিদ্যারম্ভ হয়। কিন্তু চার বছর বয়সেই বিদ্যা শিক্ষায় তাঁর এমন স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মায় যে তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা, নবগোপালকে পাঠশালায় যেতে দেখলে, তিনি তাঁর সাথে পাঠশালায় যাওয়ার জন্য বায়না করতেন। এই সময় তিনি একদিন বলেছিলেন, "সকল ছেলের বাপ মা ছেলেকে পাঠশালে যেতে বলে, আমার মা আমাকে ঘরে থাকতে বলে।"[১] অল্প বয়সেই তাঁর বুদ্ধিশক্তি ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া

[১]নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, *অক্ষয় চরিত*, ১২৯৪, পৃ. ৫।

গিয়েছিল। পূজা বাড়ির প্রাঙ্গণে পাঠশালায় একদিন কদলী পত্রে কাঠাকালী ও বিঘাকালী লিখতে লিখতে তাঁর মনে হল "পৃথিবী কত বড়, ইহার সীমাই বা কোথায়।"[২]

ক. খ) কলকাতায় আসার আগের শিক্ষা

তিনি ছোটবেলায় বাড়িতে পড়াশুনা করেছিলেন গুরুচরণ সরকার নামে জনৈক গুরুমহাশয়ের কাছে। তাঁর শৈশবকালে এই বাংলায় ফার্সি ভাষায় বিচারালয় (কোর্ট) প্রভৃতি স্থানের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হত। তখন সরকারি ভাষা ছিল ফার্সি ও উর্দু। বিচারালয়ে কাজের উদ্দেশ্যে আমিউদ্দীন নামে একজন মুন্সীর কাছে তাঁর ফার্সি (ভাষা) শিক্ষা আরম্ভ হয়। এছাড়া টোলে পণ্ডিত দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন ও গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের (ভট্টাচার্য্যের) কাছে সংস্কৃত পড়েছেন।

ক. গ) কলকাতায় পড়তে আসা

১৭৭৩ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, ব্রিটিশ শাসক ও তাদের ভারতীয় প্রজাদের সাথে মেলবন্ধনের কেন্দ্রবিন্দু। ভূমি সংস্কার, নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সম্পত্তি আইন, এবং ব্যক্তিবাদের এক নতুন উদ্যম বুদ্ধিদীপ্ত ও সামাজিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিল যা সারা ভারতকে প্রভাবিত করেছিল।[৩] এই কারণে তখন গ্রাম থেকে জমিদারদের পাশাপাশি শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষরাও কলকাতার উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়।

অক্ষয় দত্তের বয়স যখন প্রায় ৯ বছর, তখন ইংরাজি শেখানোর জন্য তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা হরমোহন তাঁকে (কলকাতার) খিদিরপুরে নিয়ে আসেন। সেখানে জয় মাষ্টার (জয়কৃষ্ণ

[২]তদেব, পৃ. ৬।

[৩]Geraldine Hancock Forbes, *Positivism in Bengal: A case study in the Transmission and Assimilation of an Ideology*, 1975, pp. 1-2.

সরকার) ও গঙ্গানারায়ণ মাষ্টার (সরকার) নামে তখনকার বিখ্যাত দুই জন ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন। হরমোহন প্রথমে অক্ষয়কে জয় মাষ্টারের কাছে ইংরাজি পড়তে দেন। তাঁর কাছে পড়ে সন্তুষ্ট না হয়ে অক্ষয় দত্ত নিজেই একজন (খ্রিষ্টান) পাদ্রির কাছে পড়তে যান। পাদ্রির সংস্পর্শে থাকলে অক্ষয় খ্রিষ্টান হয়ে যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় হরমোহন তাঁকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে তার নিজের অফিসের জনৈক কেরানির কাছে ইংরেজি পড়ানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন।[৪]

১৮২৯ সালে গৌরমোহন আঢ্য কলকাতায় ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারি (স্কুল) প্রতিষ্ঠা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল (খ্রিষ্টান) মিশনারিদের প্রভাব মুক্ত হয়ে ভারতীয় ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা প্রদান করা।[৫] হরমোহন অক্ষয় দত্তকে এই স্কুলে (বর্তমান সময়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে) ভর্তি করান। কিন্তু রোজ খিদিরপুর থেকে কলকাতার স্কুলে পড়তে যাওয়া সেকালে মোটেই সহজ ছিল না। তাই কলকাতার দর্জিপাড়ায় হরমোহনের পিসতুত ভাই রামধন বসুর বাড়িতে অক্ষয়কে রেখে হরমোহন তাঁর লেখাপড়ার সমস্ত খরচ বহন করতে থাকেন।

হার্ডম্যান জেফ্রয় নামে একজন ইংরেজ তখন ঐ স্কুলের গণ্যমান্য শিক্ষক ছিলেন। অক্ষয় দত্ত সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ও জার্মান ভাষা শিখতে যেতেন। সেখানে শিক্ষালাভ করে অক্ষয় ইলিয়ড, ভার্জিল, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ স্তরের গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ক ভাল ভাল বই প্রায় বিনা সাহায্যেই পড়তে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এইসব পড়ায় প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর বীতরাগ (সন্দেহ) জন্মায়।

---

[৪]নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

[৫]Geraldine Hancock Forbes, Ibid, p. 59.

প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ, জিজ্ঞাসু মন, অনুরাগ তাঁর চিন্তার ভিত্তি দৃঢ় করেছিল। পাঠ্যপুস্তক রচনা থেকে পত্রিকা সম্পাদক হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রচনার ভিত্তি ভূমি এখান থেকেই শুরু হয়েছিল, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। যা তাঁকে বাংলার প্রথম 'বিজ্ঞান লেখক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ক. ঘ) পিতার মৃত্যুঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে বাধা

তাঁর ১৯ বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। এরপর হরমোহন তাঁর পড়াশুনার সমস্ত দায়িত্ব নিতে চাইলেও তাঁর মাতার ইচ্ছায় তাঁকে পড়াশুনা ছেড়ে কাজের খোঁজ করতে হয়। মাতার নির্দেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়েছিল। ওরিয়েন্ট্যাল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী (বর্তমান অষ্টম শ্রেণী) পর্যন্ত তিনি আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা করেছিলেন।

".....কিন্তু তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াও বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করেন নাই। ঐ অবস্থাতেও স্বয়ং অনুশীলন করিয়া এবং ২-১ জন কৃতবিদ্যলোকের সাহায্য লইয়া সমুদয় ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কণিক্ সেক্সন্, ক্যালকুলাস প্রভৃতি গণিত, ঐ গণিতজ্ঞান সাপেক্ষ জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান ও তৎসহ ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞানের অনুশীলনে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে ঐ সকল অধ্যয়ন দ্বারা সে অনুরাগ কতক দূর চরিতার্থ হইল।"[৬]

তিনি অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চার জন্যও সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। কলকাতায় নতুন প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে (১৮৩৫ সাল) তিনি সময় পেলেই ক্লাস করতে যেতেন। এছাড়া রসায়ন, জীববিদ্যার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। সর্বোপরি, তিনি শোভাবাজার রাজবাড়ির

[৬]রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), ১৩১৭, পৃ. ২৫০।

সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। *'যতদিন জীবন ততদিন শিক্ষা (education ends with life)'*—এই সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন।

(খ) শিক্ষকতা

খ. ক) *তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায়* শিক্ষকতা

তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল *'শিখব ও শেখাব'*। তিনি ১৮৩৯ সালের ডিসেম্বরে ব্রাহ্মসমাজের সদস্য মনোনীত হন। ১৮৪০ সালের জুন মাসে *'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'* স্থাপিত হলে (এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় ছাত্রদের খ্রিষ্টান মিশনারিদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পরিবর্তে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। এবং তাদের খ্রিষ্টান প্রভাব মুক্ত রাখা) তিনি ৮ টাকা মাসিক বেতনে সেই পাঠশালায় শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত হন। পরের মাস থেকে মাসিক বেতন ১০ টাকা হয়। শেষে মাসিক ১৪ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষক হন।

তাঁর সমতুল্য শিক্ষক তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ছিল না, যা দেবেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছিলেন। এই পাঠশালার বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ (শিক্ষার জন্য আর্থিক উৎসাহ দান) সময়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার বক্তৃতার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "এই পাঠশালার পরম সৌভাগ্য যে, এরূপ উপযুক্ত ও উৎসাহী শিক্ষক (অক্ষয় দত্ত) পাওয়া গিয়াছে।"[৭] ঐ পাঠশালায় অক্ষয় দত্ত বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা—এই দুই বিষয়েও শিক্ষাদান করতেন।

[৭]মহেন্দ্রনাথ রায়, *বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত*, ১২৯২, পৃ. ৪৫।

১৮৪৩ সালে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" কলকাতা থেকে হুগলি জেলার অন্তর্গত বংশবাটী (বর্তমানে বাঁশবেড়িয়া) গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। যদিও এই পাঠশালা স্থানান্তরিত হওয়া বিষয়ে অশোক সেন এক ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।[৮] সেখানে ঐ স্কুলে ইংরেজি ও বাংলা, উভয় ভাষাই পড়ানো হবে ঠিক করা হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার পদাধিকারীরা অক্ষয়কে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে সেখানে যেতে অনুরোধ করেন। যদিও তখন তাঁর জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপায় ছিল না এবং খুবই অর্থকষ্টে সংসার চালাতে হচ্ছিল, তৎসত্ত্বেও কলকাতা ত্যাগ করে সেখানে গেলেন না। কারণ সেখানে উৎকৃষ্ট বইয়ের অভাব ঘটবে ও পণ্ডিতদের সংসর্গ না পেয়ে তাঁর বিদ্যাভ্যাসের ব্যাঘাত ঘটবে এবং দেশের বিভিন্ন ভাল কাজ-সাধনা-বাসনা সফল হওয়ার ক্ষেত্রে তা প্রতিবন্ধক হবে, এই কথা বলেই তিনি ঐ পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।[৯] অর্থের অভাবে অবশেষে ১৭৬৮ সালে এই পাঠশালাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বংশবাটীতে (বাঁশবেড়িয়া) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক সভায় অক্ষয় দত্ত বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, *"ইদানীং কলিকাতা নগরে বঙ্গ ভাষা অনুশীলনের দ্বারা যে নানা প্রকার বিদ্যার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে, এবং তত্রস্থ মনুষ্যেরা স্বদেশের মঙ্গল বৃদ্ধির নিমিত্তে যে*

---

[৮]Asok Sen, *Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones*, 1977, pp. 35-36.

তিনি লিখেছেন, ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবেই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৪১-এ এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙালি শিশুদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত শত চেষ্টা করেও কলকাতায় একে বেশি দিন টিঁকিয়ে রাখতে পারেন নি। কিন্তু এর ব্যর্থতার কারণ পরিষ্কার হয়েছে এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার দ্বারাঃ "দেবেন্দ্রনাথের পাঠশালায় সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত যে সকল ছাত্ররা ক্লাস করতেন, তারা আবার সকাল ১০টা থেকে শহরের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়তে যেতেন ইংরেজি শিক্ষার জন্য কারণ তৎকালীন সময়ে অভিভাবকদের কাছে ইংরেজি শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই বিষয়টি (ইংরেজি শিক্ষা) ছাত্রদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই তারা তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ত্যাগ করতে থাকে। এই পতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য, ইংরেজি বিষয়-কে (পাঠ্যক্রমে) ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে যুক্ত করা হয়। কিন্তু এতে অবস্থার উন্নতি হয় নি এবং ছাত্রদের মধ্যে শহরের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বিশুদ্ধ ইংরেজি শিক্ষার প্রলোভন দ্রুত গতিতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পতনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্য কোন উপায় ছিল না কলকাতার পাঠশালা বন্ধ করা ছাড়া। পাঠশালা হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়াতে উঠে যায়। সেখানে দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে পালাতে চেয়েছিলেন।

[৯]মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।

রূপ উদযোগি হইতেছেন, তাহা দৃষ্টি করিয়া দেশহিতৈষি ব্যক্তি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়েন, পরন্তু তাৎপর ক্ষণেই তিনি পল্লী গ্রামের প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়া অত্যন্ত ক্ষোভযুক্ত হয়েন। যখন তিনি নগর এবং গ্রাম এই উভয় স্থলের অবস্থা বিবেচনা করেন, তখন তাঁহার মনে কি অগ্রণ্য বিপরীত ভাবের উদয় হইতে থাকে! এক দিকে তিনি দৃষ্টি করেন বিদ্যা অতি উজ্জ্বল বেশে দ্রুত বেগে আগমন পূর্ব্বক লোকের মনোরঞ্জন করিতেছেন, অন্য দিকে অজ্ঞানের পরাক্রমে লোকের অন্তঃকরণ জড়তায় আচ্ছন্ন হইতেছে। এক দিকে মনুষ্যেরা স্বদেশীয় সাধারণ ব্যক্তিদিগকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিয়া দেশের হিতোন্নতি করিতে চেষ্টিত হইতেছেন, অন্য দিকে গ্রাম বাসিরা দলাদলি দ্বেষাদেষি করতঃ একতার বিচ্ছেদ পূর্ব্বক দেশের হিত কল্পে অনুরাগ শূন্য রহিয়াছেন। এই রূপ পল্লীগ্রামের অবস্থা স্মরণ করিয়া যে দেশহিতৈষি ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইতেছেন তিনি যদি এইক্ষণে আমারদিগের সহিত এই বংশবাটীতে উপবেশন পূর্ব্বক অদ্য স্থাপিত নবীন পাঠশালার শোভা সন্দর্শন করেন, তবে তিনি পূর্ব্ব ক্ষোভকে বিস্মৃত হইয়া আনন্দ নীরে অবগাহন করেন এবং ইহার সংস্থাপক দিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকটে ইহার শুভানুধ্যায়ী হয়েন।

বঙ্গ ভাষা বিস্তার দ্বারা স্বজাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যে এই রূপ পাঠশালা স্থাপন করা কি রূপ প্রয়োজনীয় এবং কি অসঙ্খ্যক মঙ্গল দায়ক, তাহা কাহার না বিদিত হইতেছে? এইক্ষণে যদি ও কলিকাতা নগরস্থ এবং তাহার নিকটস্থ কতিপয় গ্রামবাসি অনেক যুবক ইংরাজী ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, তথাপি ইহার স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, যেহেতু ইংরাজী বিদেশীয় লোকের ভাষা, সুতরাং তাঁহারা যদি দৈবাং এদেশ হইতে বিরল হয়েন তবে কোন্ ব্যক্তি আর ইংরাজী শিক্ষা করিবেক? এবং স্বদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ এবং উপদেশকের অভাব সত্ত্বেও কোন্ ব্যক্তি আর জ্ঞান অভ্যাস করিতে শক্ত হইবেক? আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের যে রূপ প্রাদুর্ভাব

হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা, এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না- তাঁহারদিগের ভাষাই এ দেশের জাতীয় ভাষা হইবেক, এবং তাঁহারদিগের ধর্ম্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালা রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।

অদ্য কি সুখের দিবস! এসময়ে আর কতিপয় মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। উৎসাহ অদ্য আমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, দেশের হিতাভিলাষ অন্তঃকরণে সমুদায় স্থান অধিকার করিয়াছে, আশা সাহসকে আশ্রয় করিয়া গগণ পর্য্যন্ত উড্ডীয়মানা হইয়াছে, পৃথিবী অদ্য যেন এক নূতন মনোহর বেশ পরিধান করিয়াছে এবং আনন্দ সাগর স্বরূপ হইয়া আমার মানস ক্ষেত্রে প্লাবিত হইয়াছে। আমি নিঃসন্দেহে অনুমান করি যে এই সমাজস্থ সমুদয় মহাশয় আমার সহিত সমান আহ্লাদে মগ্ন হইয়াছেন। যে রূপ কৃষকেরা যত্নের সহিত বীজ বপন পূর্ব্বক ভাবি উৎপন্ন সস্যের আশায় আশক্ত হইয়া পুলকে পরিপূর্ণ হয়, এবং মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচনা করিয়া সুখি হইতে থাকে, সেই রূপ আমরা এখন এই পাঠশালা রূপ বৃক্ষের অঙ্কুর রোপণ করিয়া ইহার উন্নতি প্রত্যাশায় হর্ষযুক্ত হইতেছি, এবং ইহার সদবস্থার প্রতি প্রতীক্ষা পূর্ব্বক অন্তঃকরণে নানা রূপ ভাবের আন্দোলন করিতেছি। আহা কোন্ দিন সেই সুখের দিন আমারদিগের নিকটে আগমন করিবে, যে দিন এই বিদ্যালয় বৃক্ষের নানা বিদ্যা রূপ নানা শাখা ধর্ম রূপ ফলপুঞ্জে শোভিতা হইয়া প্রশংসা রূপ সৌরভ বিস্তার পূর্ব্বক ধরণীকে আমোদিতা

করিবেক। আহা কোন্ দিন সেই সুখের দিন আমারদিগের সমীপে বর্ত্তমান হইবে যে দিন এই পাঠশালার বালকেরা নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণের নিমিত্তে স্বদেশের স্থানে স্থানে পাঠশালা পত্তন করিবেক, সভা সংস্থাপন করিবেক, এবং আপন দেশের হিতের জন্য প্রকাশ্য সমাজে দণ্ডায়মান হইবেক।

হে বংশবাটী গ্রামস্থ বান্ধব গণ বিবেচনা করুন যে আপনারা সহবাসি গ্রামস্থদিগের হিত কল্পে উদ্যোগি হইবার অগ্রেই ভিন্ন স্থানের লোকেরা বংশবাটী এবং তৎসমীপস্থ পল্লীগণের মহোপকারে অগ্রসর হইয়াছেন, অতএব তাঁহারদিগের এই অভিলাষ পূর্ণ করণ হেতু আপনারা স্বীয় সন্তানদিগকে বিদ্যানুশীলনে উৎসাহি করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল হউন, যেহেতু শিক্ষকের উপদেশ অপেক্ষা পিতা মাতার উপদেশ অধিকতর হিতজনক হয়, এবং গৃহে যত্ন থাকিলে পাঠালয়ের যত্ন আশু ফলদায়ক হয়। শিক্ষকেরা অঙ্কুর রোপণ করুন, পিতা মাতারা তাহাতে বারি সেচন করিতে যত্নযুক্ত থাকুন্, শিক্ষকেরা বালক দিগকে উপদেশ প্রদান করুন, পিতা মাতারা তাহারদিগকে সেই উপদেশ অনুযায়ি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করুন।

অবশেষ হে জগদীশ্বর অনুকম্পা পুরঃসর এই অভিনব পাঠশালাকে চিরস্থায়িনী করিয়া ক্রমশঃ তাহার উন্নতি কর, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি অনুকূল হইয়া তাহার সভাপতি এবং অধ্যক্ষগণকে এবম্প্রকার ধন্য এবং হিতকারি কর্ম্মে নিযুক্ত রাখ।[১০]

খ. খ) শিক্ষক-শিক্ষণ নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে

ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল উডের ডেসপ্যাচ বা নির্দেশনামা (১৮৫৪ সাল)। ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত শিক্ষা সংক্রান্ত বোর্ড অফ্ কন্ট্রোলের

[১০]তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২য় সংখ্যা ১লা আশ্বিন ১৭৬৫ শক, *'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'*, পৃ. ১১ ও ১২।

সভাপতি ছিলেন স্যার চার্লস উড। তিনি বাংলায় শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশনামা (উডের ডেসপ্যাচ) দিয়েছিলেন তার অন্যতম কথা ছিল—শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ফলে পড়ানোর উপযুক্ত শিক্ষকমন্ডলী তৈরি হবে এবং দ্রুত শিক্ষার প্রসার ঘটবে।

৬ই জুলাই (মতান্তরে ১৭ই জুলাই) ১৮৫৫ সাল কলকাতা *'শিক্ষক-শিক্ষণ নর্মাল স্কুল'* প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য সংস্কৃত কলেজে স্থাপিত হয়।[১১] বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন শিক্ষা ইন্সপেক্টর ও সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। নর্মাল স্কুল তখন সংস্কৃত কলেজের অধীনে ছিল; বিদ্যাসাগর এই স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পীড়া ও অন্যান্য কারণে (অন্যতম কারণ ছিল মতাদর্শগত বিরোধ) অক্ষয় দত্ত তখন (১৮৫৫ সাল) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। এমতাবস্থায় যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে 'শিক্ষক শিক্ষণ নর্মাল স্কুল'-এর প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিতে অনুরোধ করেন এবং *বাংলার সরকার*কে রাজি করিয়ে সেই চাকরিতে তাঁকে নিয়োগ পত্রের ব্যাবস্থা করেন, তখন তিনি অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর সেই পদ গ্রহণ করতে রাজি হন।

তিনি মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মাসিক ৫০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। বাচস্পতি মহাশয় বাংলা ও সংস্কৃত আর অক্ষয় দত্ত ভূগোল ইত্যাদি বিষয় পড়াতেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, শিরোরোগ/শিরঃপীড়ার (মাথার যন্ত্রণা) জন্য দত্ত দীর্ঘকাল সেই পদে থেকে কাজ করতে পারেন নি। এক বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৫৬ সালের অগাস্ট মাসে তিনি এতটাই পীড়িত হন যে, প্রথমে

[১১]Asok Sen, Ibid, p. 31.

এক বছরের জন্য, তারপর ছয় মাস করে দুইবার ছুটি প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। শেষে ১৮৫৮ সালের অগাস্ট মাসে তিনি ঐ পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

(গ) তাঁর শিক্ষা ভাবনা

একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে তাঁর শিক্ষা ভাবনা বা শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বিশদে জানার প্রয়োজন। তৎকালীন বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তিনি অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, *বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আপনার ও অন্যের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেরই বিদ্যানুশীলন করা কর্তব্য।*[১২]

কেন শিক্ষার উপর জোর দেওয়া উচিত? সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "বিদ্যালোক সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্যভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ। যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধনেত্রের গোচর থাকে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি নরলোক নিবাসী হইয়াও, কোন চমৎকারময় সুচারু স্বর্গলোকে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে-সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নাই। তিনি আপনার মানসনেত্রে এককালে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্যবলোকন করিতে পারেন।[১৩]

শিক্ষা প্রতিটি নাগরিকেরই গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক সর্বজানা হতে পারেন, বা তিনি সর্বব্যাপী জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। বিভিন্ন শিক্ষাবিদরা

[১২]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পা.), *শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, বিদ্যাশিক্ষা, ২০০৭, পৃ. ৪৬।

[১৩]তদেব, বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জন, পৃ. ৪৯-৫০।

জ্ঞানকে আলোর সাথে তুলনা করেছেন। এমনকি জ্ঞান মানুষের বেঁচে থাকার জন্যও দরকার। জ্ঞানহীন মানুষ পাগলা কুকুরের সমান। তিনি জ্ঞান শিক্ষাতে নৈতিকতার ভূমিকার কথা বলেছেন। এবং এই নৈতিকতা শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক পর্যায়েই প্রদান করার বিষয়ে তিনি আগ্রহী। তাই শিশু পাঠ্য চারুপাঠের প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা বিজ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতারও পাঠ দেখতে পাই।

অক্ষয় দত্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র (চন্দ্রকুমার দত্ত)-কে যেমন করে 'ক', 'খ' (বর্ণ জ্ঞান) শিখিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করা এই ক্ষেত্রে জরুরি। পিতা-পুত্র মুখোমুখি হয়ে একটি ছোট মাটির গুলি (ভাঁটা) নিতেন। তিনি 'ক' বলে সেটি পুত্রের দিকে, পুত্র পাওয়া মাত্র 'খ' বলে সেটি পিতার দিকে ছুঁড়ে দিতেন। এই ভাবে সমস্ত বর্ণ খেলার ছলে অবলীলাক্রমে অভ্যস্ত হলে পরে অক্ষর পরিচয় হত। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কারও কষ্ট বোধ হত না।

কিন্তু একদম শৈশবে শিক্ষার্থীর জন্য কোন ধরনের শিক্ষাক্রম তৈরি করা উচিত সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ".....প্রথমে অক্ষর ও শব্দ শিক্ষা করান অপেক্ষায় চতুঃপার্শ্ববর্তী প্রকৃত পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ ও শিক্ষা করানো যে অধিক উপকারী, ইহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে অবধারিত হইয়াছে....."[১৪] তবে "তাদেরকে একবারে এক ঘন্টা(র) বেশি সময় পড়াশুনায় নিযুক্ত রাখা উচিত না।"

যে যে বিষয়গুলি অভ্যাস ও আলোচনা করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন সেগুলি হল, (১) ভাষা শিক্ষার উপযোগী বই পড়া এবং বর্ণমালা শেখা ও লিখতে পারা; কেননা এই তিনটি বিষয় জ্ঞান শিক্ষা ও প্রচার করার প্রধান উপায়, (২) পাটিগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রও শিক্ষা করা কর্তব্য; কেননা জ্যোতিষাদি কতকগুলি বিদ্যা পড়তে হলে, গণিতবিদ্যা আবশ্যক। গণিতবিদ্যা, জ্যোতিষ ও শিল্পবিদ্যাদি পড়ার এক প্রধান সিঁড়ি, (৩) ভূগোল, (৪)

[১৪]তদেব, বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষাপ্রণালী নির্ধারণ, পৃ. ৩৫।

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, (৫) রসায়ন, (৬) শারীরস্থান ও শারীরবিধান, (৭) পদার্থবিদ্যা, (৮) পুরাবৃত্ত, (৯) লোকযাত্রাবিধান, (১০) মনোবিদ্যা ও ধর্মনীতি, (১১) পরমার্থবিদ্যা, (১২) সাহিত্য, (১৩) চিত্রবিদ্যা-শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি।[১৫] তাঁর এই বিষয়সূচি আমাদের সহজেই ধারণা দেয় যে, তিনি এই পাঠ্যসূচী নির্ধারণের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা ভাবনার সূচনা করেন। বিষয়গুলি পাল্টে গেলেও আজও এগুলি পড়ানো হয়।

তিনি শারীর শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন, "শারীর শিক্ষা পড়ে শারীরিক নিয়ম আয়ত্ত করা কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনী কি নির্ধন, সকলের পক্ষে অত্যন্ত দরকারি। এই বিষয়টি যে কিরকম গুরুত্বপূর্ণ, সেটা খুবই প্রসিদ্ধ সুপন্ডিত ব্যক্তিরাও যথোচিত বিবেচনা করেন না। এই বিষয়ের জ্ঞানাভাবে পৃথিবীর সর্বস্থানে যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। রোগ ও অকালমৃত্যু কেবলমাত্র শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।[১৬] অর্থাৎ শরীরেও কোন নিয়ম আছে। শারীর শিক্ষা, তন্ত্র বিদ্যমান।

তিনি আরও বলেছেন, "সন্তানদেরকে শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্তব্য। পিতা ও মাতারা হৃদয়ের থেকে প্রিয় পুত্র-কন্যাদের কেবলমাত্র শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না, তাদেরকে ভালমতন শিক্ষা দানের মাধ্যমে লোকসমাজে চলতে পারা ও অন্যান্য সমস্ত কর্তব্য পালনের জন্য উপযুক্ত তৈরি করা দরকার। কোন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেছেন লোকসমাজে অশিক্ষিত সন্তান থাকা আর পাগল কুকুরের গলবন্ধন খুলে তাকে রাস্তার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া দুইই সমান ব্যাপার।"[১৭]

---

[১৫]তদেব, শিক্ষাদান ও পাঠ্যবিষয় নিরূপণ, পৃ. ২৪-২৫।

[১৬]তদেব, পৃ. ২১। (গবেষক দ্বারা কেবলমাত্র সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় পরিবর্তন করা হয়েছে।)

[১৭]তদেব, পৃ. ২২। (ঐ)

অক্ষয় দত্তের শিক্ষা ভাবনার প্রতি নজর দিলে খুব সহজেই কয়েকটি মূলসূত্র আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমত, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান; দ্বিতীয়ত, এমন শিক্ষা চাই যাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ হয়; তৃতীয়ত, সেই জ্ঞানের শিক্ষা কল্যাণকর, যা বিশ্বমানবমনের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপন করে, কিন্তু সে যোগ অবশ্যই সকলস্তরের মানুষের জন্যেই কাম্য; চতুর্থত, শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সমুন্নত ধারণা শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য; পঞ্চমত, সেই শিক্ষা বাঞ্ছনীয় যা শিক্ষার্থীকে আধুনিক বিশ্বচিত্তের সঙ্গে স্বাজাত্যবোধকে মিলিয়ে নিতে সহায়তা করে। এছাড়া, মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত দিক থেকে অক্ষয় দত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, সকল স্তরের তথা, অফিস-আদালত এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা বাংলা চালু করা দরকার।[১৮]

তিনি তৎকালীন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষা নীতির দ্বন্দ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। শুধুমাত্র পাশ্চাত্য বা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি মাতৃভাষার উন্নতিসাধন বা মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জন কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে লিখেছেন, "……আজকের দিনে ইংরেজিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকলে কোনমতেই চলে না এবং ইংরেজদের কাছ থেকে আমাদেরকে এখনও অনেক শিক্ষা (গ্রহণ) করতে হবে, তাও এটি প্রকৃত জাতীয় উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা বলতে হবে। মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে স্বাভাবিকভাবে যে জাতীয় উন্নতির উত্থান হয় তাই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি। এই রকম প্রকৃত জাতীয় উন্নতির সময় আমরা জাতীয় ভাষার সাহায্য নিলেও উন্নতির জাতীয় ভাব অবলুপ্ত হত না। (তখন) অন্যান্য ভাষা থেকে আমরা যে সাহায্য নিতাম তা আমাদের জাতীয় ভাষার শরীরে পরিণত হয়ে আমাদের উন্নতিকে কখনও বিজাতীয় প্রকৃতি প্রদান করতে পারত না। এখন যেমন আমাদের মনের সকল ভাব ইংরেজি

[১৮]তদেব, পৃ. ১৮।

ছাঁচে বিগঠিত হচ্ছে, এমনকি, আমরা ইংরেজিতেও চিন্তা করছি, সেরকম না হয়ে আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হত এবং এইভাবে প্রকাশিত হয়ে যে জাতীয় উন্নতির উত্থান ঘটত তাই (হল) প্রকৃত জাতীয় উন্নতি।.....[১৯]

বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান ব্যক্তিকে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা করতে সাহায্য করে। ভাষা জ্ঞান বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে। শিক্ষার মান বিষয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন, "আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষা অনেক মঙ্গল করেছে। কিন্তু তাও তাতে যেসব ত্রুটি দেখা যাচ্ছে তা জাতীয় উন্নতির বিশেষ বাধা বলে মনে করতে হবে। প্রথমত, কলেজ ও স্কুলে যেরকম শিক্ষাপ্রণালী ব্যবহত হচ্ছে, তা কেবলমাত্র স্মরণশক্তি উন্নতির জন্য উপযুক্ত, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও উন্নতির জন্য ততটা উপযুক্ত নয়। শুনতে পাওয়া যায় যে, প্রধান প্রধান কলেজের অধ্যাপকেরা ছাত্রদেরকে কোন প্রশ্ন করেন না, কেবল বইয়ের ব্যাখ্যা দেন, ছাত্রেরা কেবলমাত্র নোট নেয় (লেখে)।"[২০]

তিনি মনে করতেন, দেশীয় ধনী ব্যক্তিদের একটা দায়িত্ব রয়েছে দেশের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতি ঘটানোর। তাই তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, "....যদিও আমাদের দেশের ধনী ও অন্যান্য ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে একটি জাতীয় শিক্ষা সংগঠন স্থাপন করেন এবং সেই জাতীয় শিক্ষা সংগঠনে যাঁরা বাংলা ভাষাতে শিক্ষার উচ্চতম বিষয়ে বই লিখবেন তাঁদেরকে এবং যেসব ব্যক্তি ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাওয়ার পর(ও) সেসব বইয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করবেন তাঁদেরকে লোভনীয় অর্থ ও উপাধি পুরষ্কার প্রদান করেন তাহলে দেশের গৌরব অনেকটা রক্ষা করা যাবে। যখন আমাদের দেশের নাগরিকরা যাঁরা ঐ শিক্ষা সংগঠন থেকে উপাধি পাবেন না,

---

[১৯]তদেব, বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, পৃ. ৫৭-৫৮। (গবেষক দ্বারা কেবলমাত্র সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় পরিবর্তন করা হয়েছে।)

[২০]তদেব, পৃ. ৫৬। (ঐ)

তাঁদেরকে প্রকৃত শিক্ষিত বলে মানবেন না, তখন বঙ্গসমাজে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে এরকম বলা যাবে।"[২১]

জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষার বিস্তারের কল্পনা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। তাঁর এই ভাবনার প্রায় পাঁচ দশক পরে ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক ও অন্যান্য স্বদেশী নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় *'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'* গঠিত হয়। যা জাতীয় শিক্ষার বিস্তারে ও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনে এবং স্বদেশী আন্দোলনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল।

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয়দের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল শাসক ব্রিটিশরা। তাই ব্রিটিশদের প্রতি আস্থা রেখে আশাবাদী অক্ষয় লিখেছেন, "যদিও প্রায় একশত বছর ধরে ভারতবর্ষ ব্রিটিশের (সভ্য রাজার) অধীনে রয়েছে, তাও ভূতপূর্ব গভর্নর শ্রীযুক্ত লর্ড অকলন্ড বাহাদুরের এদেশ শাসনের আগে গভর্নমেন্টের সাথে এদেশীয় বিদ্যার সাথে কোনরকম সংশ্রব ছিল না। এখন ভারতবর্ষের প্রজাদেরকে শিক্ষিত করা গভর্নমেন্টের এক প্রধান কাজ হয়েছে, অতএব ভরসা করি, সাধারণ প্রজারা অবিলম্বে জ্ঞান লাভের সৎপথ দেখতে পাবেন।"[২২] এরপর তিনি সর্বজনীন শিক্ষার প্রাসারের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ".....যতদিন না গ্রামের মানুষরা শিক্ষার গ্রহণ করতে পারবেন, ততদিন বাংলাদেশের অবস্থার উন্নিতির সম্ভাবনা নেই.....।"[২৩]

ভারতের ইতিহাস নেই! ভারতীয়দের ইতিহাস লেখা হয়নি। এই খেদ ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর বেশি করে শোনা যায়। তাই ভারতের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব শাসক ব্রিটিশরা নিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে তাতে ইতিহাসের বিকৃতি দেখা গিয়েছিল। এবং এর প্রভাব পাঠ্য পুস্তক

---

[২১]তদেব, পৃ. ৫৯। (ঐ)

[২২]তদেব, বিদ্যাবুদ্ধির সৎপরামর্শ, পৃ. ৫৪। (ঐ)

[২৩]তদেব, পৃ. ৫৫। (ঐ)

রচনায়ও দেখা গিয়েছিল। তাই তিনি আশাহত হয়ে লিখেছেন, ".....আমাদের কলেজ ও স্কুলে যে সমস্ত বই পড়ান হয়ে থাকে তাতে জাতীয় ভাবের অভাব স্পষ্ট দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে সমস্ত ভূগোল বই কলেজে ও স্কুলে পড়ান হয়ে থাকে তাতে যে স্থানে সুমাত্রা, বালী অথবা সুখতর উপদ্বীপের উল্লেখ আছে, সেখানে তা প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ বলে যদি উল্লিখিত থাকত তাহলে ছাত্রেরা সেগুলি পড়ার সময় ভারতের প্রাচীন কীর্তি স্মরণ করে খুবই উৎসাহিত হত। অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্য বইগুলিতেও জাতীয় ভাবের অভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ইতিহাস বিদেশী লোকদের দ্বারা, অর্থাৎ ইংরেজদের দ্বারা লিখিত হয়েছে। ভারতের ইংরেজ পুরাবৃত্ত লেখকরা অনেক স্থানে নিজের জাতির প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব করেছেন ও এ দেশের লোকদের অযথা নিন্দা করেছেন। ভারতবর্ষের লোকেরা স্বাধীনভাবে তথ্যানুসন্ধান করে, ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখলে কখনই এরকম হত না। আমাদের কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরা ইংরেজদের দ্বারা রচিত ভারতের পুরাবৃত্ত পড়ে থাকে, সুতরাং তারা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস পড়তে পারছে না।"[২৪]

(ঘ) নারী শিক্ষা

তৎকালীন সময়ে এই বাংলায় নারী শিক্ষার হার ছিল একদম নগণ্য। নারী শিক্ষা আন্দোলনে অক্ষয় দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা চিরস্মরণীয়। অক্ষয় লিখেছেন, অনেকে মনে করেন, স্ত্রীলোকের প্রকৃতি খুবই কোমল, তাদেরকে কোন কষ্টসাধ্য বিষয় ব্যাপারেও নিযুক্ত হতে হয় না, অতএব যে সব বিষয়ের অনুশীলনে খুবই মানসিক পরিশ্রম করতে হয়, তা স্ত্রীদের শিক্ষণীয় নয়। কিন্তু বিচার করে দেখলে, তাঁদের এ ইচ্ছা কোনভাবেই স্বীকার করা যায় না। স্ত্রীদেরকে যেরকম

[২৪]তদেব, বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, পৃ. ৫৮। (ঐ)

শিক্ষা দেওয়া উচিত, যদিও তা এখনও প্রচলিত হয়নি, তাও তারা যে নানারকম প্রগাঢ়তর কঠিন বিদ্যার অনুশীলন করতে পারে, এবং বিদ্যার্থী পুরুষদের মত মানসিক পরিশ্রমকে সুখের বিষয় মনে করে জ্ঞানালোচনায় অনুরক্ত হতে পারে, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গেছে। অনেক আগে ভারতবর্ষের স্ত্রীদের পড়াশুনার রীতি প্রচলিত ছিল তার সন্দেহ নেই।

তিনি লিখেছেন, "স্ত্রীদের কর্তব্য নির্ধারিত হলে, তাদের শিক্ষাপ্রণালীও নির্ধারিত হবে। গৃহধর্মের বিষয় বিবেচনা করে দেখলে, সন্তান উৎপাদন (করা), তার রক্ষণাবেক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধি (করে), স্নেহ, প্রীতি ও ক্ষমা চেয়ে আত্মীয়দের সন্তুষ্ট করা ও আনন্দ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি যাতে ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন হয়, তা ভালভাবে অভ্যাস করা (ঐসময়) স্ত্রীদের প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।"[২৫] অক্ষয় দত্ত কিন্তু এই ধরণের মতামতকে একদমই সমর্থন করতেন না।

প্রাচীনকাল থেকে একটি ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে, নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করলে তাদের অভিভাবকদের কথা শুনবে না। এমনকি বিবাহের পর স্বামীর কথাও শুনবে না। এবং অল্প বয়সে বিধবা হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। এই ধারণা তখন নারী শিক্ষার হার কম হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল। ঔপনিবেশিক যুগে পুরুষরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে কেরাণির চাকরি গ্রহণ করে। কর্মরত পুরুষের স্ত্রী অশিক্ষায় নিমজ্জিত ছিল। তাই সন্তানদের বাড়িতে শিক্ষার পাঠ দিতে পারত না। অতএব নারী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হতে থাকে উনিশ শতক থেকে।

নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ছিল "স্ত্রীদের শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি কিছুটা বিবেচনা করা আবশ্যক মনে হচ্ছে, কারণ জনসমাজের অনেক মঙ্গল তাদের সুশিক্ষা লাভের উপর নির্ভর করে। স্ত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ করা যে সর্বতোভাবে দরকার, তা এখন অনেকেই বুঝতে

[২৫]তদেব, শিক্ষাদান ও পাঠ্যবিষয় নিরূপণ, পৃ. ২৬। (ঐ)

পারছেন.....”।[২৬] উনিশ শতক জুড়ে নারী শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি তাঁর ভূমিকাও চিরস্মরণীয়।

(ঙ) পাঠ্য পুস্তক রচনায় তাঁর অবদান-অনন্যতা

পিতার মৃত্যুর (১৮৩৯ সাল) পর যখন অক্ষয় দত্ত কাজের খোঁজ করছিলেন, সেইসময় কলকাতায় ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ থেকে “তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা” গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তিনি এই পাঠশালার প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন (জুন, ১৮৪০ সাল)। তিনি পাঠশালায় (বর্ণমালা) ভাষা শিক্ষা ও ভূগোল-পদার্থবিদ্যা পড়াতেন, একথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। শিক্ষকতার কাজে তিনি প্রথমেই উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব অনুভব করেন। তখনও স্কুলের শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্য বই ছিল না। স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭ সাল) ও ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৮ সাল)-এর তৈরি করা পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য কোন পাঠ্য বই ছিল না। তাই তিনি পাঠ্য বই লিখতে হাত পাকালেন।

আসলে বুক সোসাইটির পাঠ্য পুস্তকগুলি বিদেশী ভাষায় (মূলত ইংরেজি) রচিত গ্রন্থের অনুবাদ ছিল। তাই আমরা দেখতে পাই অক্ষয় দত্ত যখন পাঠ্য পুস্তক রচনায় হাত পাকিয়েছিলেন তখন তাঁর গ্রন্থগুলি সোসাইটির গ্রন্থ থেকে ভিন্ন মাত্রার ছিল। দত্ত স্বদেশীয় শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের মনের মতন বোধগম্য ভাষায় লিখেছেন, উদাহরণ দিয়েছেন তাদের পারিপার্শ্বিক বিষয়বস্তু দিয়ে। এতে অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকের সাথে তাঁর লেখা গ্রন্থের অধ্যায়ের মিল যদিও থাকে তাও

[২৬]অক্ষয়কুমার দত্ত, *ধর্ম্মনীতি*, স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪। (ঐ)

কিন্তু বিষয়বস্তুর ভিন্নতা বিদ্যমান। ফলে দেখতে পাই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার বিষয়াবলীর সংমিশ্রণ, যা শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি সৃষ্টি করতে দেয়নি।

শিক্ষক হিসাবে একদিকে তিনি যেমন সাফল্য লাভ করেছিলেন অন্যদিকে বাংলা ভাষায় (মাতৃভাষা) পাঠ্যপুস্তক রচনা করে এক অনন্য দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছিলেন। ছাত্রদের সুবিধার জন্য তিনি বাংলা ভাষায় নতুন *ভূগোল* বই লিখলেন (১৮৪১ সাল), পাশাপাশি পরিভাষাও নির্মাণ করলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সাহায্যেই যে উপরোল্লিখিত বইটি পাঠশালার জন্য ছাপা ও প্রকাশিত হয়, তা তিনি স্পষ্ট করে ঐ বইয়ে উল্লেখ করেছেন।

এরপর প্রকাশিত হয় পাঠ্যপুস্তক- *"চারুপাঠ"*, তিনটি খণ্ডে। প্রথম খণ্ড ১৮৫৩ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৬ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইগুলিতে তিনি সম্পূর্ণ নিজের পছন্দমত বিষয়ে শিশুদের উপযোগী করে বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। প্রায় এই সময়েই তিনি লেখেন আরও দুটি পুস্তক, *"ধর্ম্মনীতি"* (১৮৫৬)– তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত সমাজনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ এই পুস্তকের ভিত্তি এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য *"পদার্থবিদ্যা"* (১৮৫৬ সাল)।

তাঁর রচিত ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা ছিল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক বই। তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন প্রাকৃতিক ভূগোল প্রসঙ্গে পুরাণ বা কাল্পনিক গাথা শুনেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য (বিজ্ঞান) শিক্ষা তাঁর সেই ভুল ভাঙ্গাতে সাহায্য করেছিল, যার প্রতিফলন আমরা তাঁর লেখা এই পাঠ্য গ্রন্থগুলিতে দেখতে পাই। এই বিষয়ে তিনি একক কৃতিত্বের অধিকারী। ভূগোল বইয়ের ভূমিকাতে তিনি লিখেছেন, *".....দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহুক্লেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালক দিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষা যোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত*

করিয়াছি।.....”[২৭] বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি সমাজে বিজ্ঞান মনস্কতার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

অক্ষয় দত্ত রচিত ভূগোলের পূর্বে বাংলা ভাষায় রচিত ভূগোল গ্রন্থগুলি ছিল বর্ণনামূলক। দত্তই প্রথমে (ক) প্রাকৃতিক ভূগোলের ধারণা আমদানি করেন, (খ) শিক্ষার্থীদেরকে এশিয়া মহাদেশের সাথে অন্যান্য মহাদেশগুলিও পরিচয় করান, (গ) গ্রন্থে পৃথিবীর একটি পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র ছিল, (ঘ) প্রকৃতি বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা দেন। এবং এই তথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন। যা integrated subject-এর সৃষ্টি করে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় তাঁর যে যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি সেগুলি সংগ্রহ করে এবং আরও কিছু কিছু নতুন প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেন “চারুপাঠ” গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে। চারুপাঠের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের নাম পত্রে (Title Page) লেখা আছে- *“ENTERTAINING LESSONS in SCIENCE AND LITERATURE”*। তিনি চারুপাঠের প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, *“চারুপাঠের প্রথম ভাগ প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ যে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত, ইহা বলা বাহুল্য। যে সকল প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এবং একটি প্রস্তাব প্রভাকর পত্রে প্রথম প্রকটিত (প্রকাশিত) হয়। অবশিষ্ট কয়েকটি বিষয় নূতন রচিত হইয়াছে।”*

তিনি আরও লিখেছেন, *“ইহার পূর্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তব পদার্থ সংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি ঐ বিষয়ে যেমন সর্ব্বপ্রথম, তেমনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে যে কত নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা*

[২৭]অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভূগোল*, ১৭৬৩, পৃ. *৴*।

বলিয়া শেষ করা যায় না।"[২৮] চারুপাঠের তথ্যের উপস্থাপনা ছিল বিস্ময়কর। চারুপাঠ ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল।

তাঁর রচিত চারুপাঠ সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বজন-গৃহীত পাঠ্যপুস্তক ছিল। সে সময় বাংলায় এরকম স্কুল খুব বিরল ছিল, যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ চারুপাঠ পড়ান হত না। ছবি সহযোগে তার বর্ণনা ছিল এই বইয়ের মূল বিশেষত্ব, এই বিষয়টিও সেসময় তিনি প্রবর্তন করেছিলেন। ভূতত্ত্ব/প্রত্নতত্ত্ব/ভূগোল ইত্যাদি অনেক কঠিন বিষয় সহজ করে ঐ বইতে লেখা ছিল, যাতে শিশুদের সেই বিষয়গুলি বোধগম্য হয়। অর্থাৎ জ্ঞানান্বেষণের জন্য বেশি মানসিক চাপের দরকার পড়েনি। এর সাথে তিনি যোগ করেছিলেন 'শব্দার্থ'। এই বইগুলির প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা আজও নির্ভুল। বর্তমান সময়েও এর বিষয়ভিত্তিক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না। চারুপাঠ প্রসঙ্গে নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৭-১৯৯৯ সাল) বলেন যে, নানা ভাগে এই বই থেকে সেকালের বাঙালির মানসিক শিক্ষা আরম্ভ হতো।[২৯]

পদার্থ বিজ্ঞানের বইটির নামের সঙ্গে তিনি যে দুই-এক পংক্তি জুড়ে দেন, তার থেকে অক্ষয়ের বিজ্ঞান বোধের এবং যুক্তিবাদী মনের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি পদার্থবিদ্যা নামের সঙ্গে যোগ করেন *"জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম"*। এই বইটির গোড়াতে (বিজ্ঞাপন) তিনি জানাচ্ছেন, "এই পুস্তক প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। চেম্বর্স ও আর্ণট প্রভৃতি ইঙ্গরেজি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ও অনুবাদিত হইয়াছে। .....গবর্ণমেন্ট সংস্থাপিত অভিনব বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমুদায়ের ছাত্রগণের ব্যবহারোপযোগী এতাদৃশ কোন পুস্তক বিদ্যমান নাই বলিয়া ইহাকে এই অবস্থাতেই প্রচার করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া

[২৮]রামগতি ন্যায়রত্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩।

[২৯]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *মুক্তচিন্তার বিস্তার,* ২০১৮, পৃ. ১৬।

তাহাদিগের (ছাত্রগণের) পদার্থবিদ্যায় অনুরাগমাত্র জন্মিলেও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।....."

বিজ্ঞানের যে প্রাথমিক পদ্ধতি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, সেই বিষয়ে একেবারে শুরুতেই তিনি ছাত্রদের অবহিত করেন। যেমন, "চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সমুদায়ই জড় পদার্থ"।[৩০] পরমাণুর ধারণা স্পষ্ট করার পর তিনি বলেন, "..... এই ভৌতিক জগতের যত কাণ্ড দৃষ্টি করা যায়, সমুদায় তাহাদেরই সংযোগ বিভাগে ঘটিয়া থাকে। প্রবল ঝঞ্ঝা-বাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, ভয়ঙ্কর দাবদাহ, এ সমুদায়ই সে সকল আদিম পরমাণুর কার্য্য।"[৩১] অর্থাৎ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, খরা-বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয়গুলির ধর্মীয় ব্যাখ্যার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেল বাংলাভাষী শিক্ষার্থীরা। এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার শুরু তখন থেকে, অক্ষয় দত্তের হাত ধরে।

(চ) বাংলা ভাষার 'যথার্থ শিল্পী'

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, অক্ষয়কুমারের ভাষা "বিদ্যাসাগরের পূর্বে, 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতার' হস্ত হইতে আপনাকে নির্মুক্ত করিয়াছিল।"[৩২] তৎকালীন সময়ের বাংলা ভাষার অনুন্নত অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, সকলেই স্বীকার করবেন বাংলা ভাষা এখনও অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে। প্রাচীন কালের সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা এবং বর্তমানকালে ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান প্রভৃতি ভাষার মত বাংলা ভাষা এখনও পরিমার্জিত ও উন্নত হয়নি। বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য দুটি মহান গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান প্রতিবন্ধকতা দেখতে পাওয়া যায়। সেই দুটি

---

[৩০]অক্ষয়কুমার দত্ত, *পদার্থবিদ্যাঃ জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম*, ১৮৫৮, পৃ. ১।

[৩১]তদেব, পৃ. ৬।

[৩২]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, ২০০৯, পৃ. ৪৬২ ও ৪৬৩।

প্রতিবন্ধকতা যতদিন না অপসারিত হচ্ছে, ততদিন বাংলা ভাষার বিশেষ উন্নতি ও সমৃদ্ধির আশা করা বৃথা।

তাই তিনি বাংলা ভাষার অনুন্নয়নের কারণ হিসেবে লিখেছেন—প্রথম প্রতিবন্ধকতা হল, শিক্ষিত বাঙ্গালিদের দ্বারা বেশি বেশি করে ইংরেজি ভাষার চর্চা ও আলোচনা (করা), এবং বাংলা ভাষা অনুশীলনে (তাদের) অবহেলা এবং নিজের ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানো। কোনও একটি ভাষার অনুশীলন ও চর্চা যতই বৃদ্ধি হতে থাকে, ততই সেই ভাষা উন্নতি লাভ করে,.....।[৩৩] তাঁর মতে, বাংলা ভাষার উন্নতির পক্ষে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হল বাঙ্গালিদের স্বাধীনতাশূন্যতা। স্বাধীনতা ভাষার উন্নতির জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। স্বাধীনতাশূন্যতা ভাষার উন্নতির জন্য একটি মহান ও প্রধান প্রতিবন্ধকতা। আমরা দেখতে পাই যার যেরকম মনের অবস্থা (মানসিক গঠন) তার ভাষাও সেইরকম হয়ে থাকে। ....যিনি প্রভু, তাঁর ভাষাও প্রভুত্বব্যঞ্জক। যে দাস তার ভাষাও দাসত্বব্যঞ্জক।.....[৩৪]

ভাষার উন্নতির জন্য দত্ত এরকম মতামত দিয়েছেন, "যে ব্যক্তি স্বাধীন তার ভাষাও সেই রকম মুক্ত এবং যে ব্যক্তি পরাধীন তার ভাষাও সেই রকম বদ্ধ। সেই রকম যে জাতির স্বাধীনতা আছে, সেই জাতির ভাষা মুক্ত, সুতরাং উন্নত। আর যে জাতি পরাধীন সেই জাতির ভাষা আবদ্ধ। সুতরাং অনুন্নত ও অপরিমার্জিত। যে দেশের লোকেরা স্বাধীন তারা স্বাধীনভাবে, নির্ভয়ে, মুক্তভাবে তাদের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিগুলি পরিচালনা করতে পারে তার জন্য তাদের ভাষা দ্রুত পরিপুষ্ট ও পরিমার্জিত হয়ে উন্নত হয়, আর যে দেশের লোকেরা স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীন এবং সবরকম স্বাধীনতাহীন তারা সবসময় ভয়ে কম্পিত, তাদের হৃদয় ও মন আবদ্ধ; পরাধীনতার জন্য মনের

---

[৩৩]ঐ (সংগ্রহ ও সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, বঙ্গভাষার উন্নতির প্রতিবন্ধক, ২০০৭, পৃ. ৯২। (গবেষক দ্বারা কেবলমাত্র সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় পরিবর্তন করা হয়েছে।)

[৩৪]তদেব, পৃ. ৯৪। (ঐ)

নির্ভয়তা ও মুক্তভাব তাদের মনে নেই সুতরাং তাদের ভাষার বিশেষ রূপে অনুশীলন ও চর্চা হতে পারে না, এর জন্য তাদের ভাষা পরিমার্জিত ও উন্নত হতে পারে না। যে জাতি স্বাধীন সে জাতির লোকেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে কোনরকম বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তারা সব সময়ে সব অবস্থায় যা করতে চায় তা অবাধে মন খুলে বলতে পারে, সুতরাং তাদের চিন্তাস্রোত উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং চিন্তাশক্তি তেজস্বী, প্রখর ও দৃঢ় হয়, তার জন্য তাদের ভাষায় নতুন নতুন কথার সৃষ্টি হতে থাকে এবং তা নতুন নতুন ভাবে সুসজ্জিত হতে থাকে; সেইরকম তাদের ভাষা ক্রমশ উন্নত, বিশুদ্ধ পরিমার্জিত হতে থাকে। কিন্তু যে জাতির স্বাধীনতা নেই সে জাতির লোকেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে না, স্বাধীনভাবে, মন খুলে সব কথা বলতে পারে না, ভয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়, সুতরাং তাদের চিন্তাশক্তি অবাধে পরিচালিত হতে না পারাতে তা তেজস্বী হতে পারে না, তার জন্য তাদের ভাষাও উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয় না। স্বাধীনতা যে ভাষার একটি উন্নতিসাধক এবং স্বাধীনতাশূন্যতা যে ভাষার উন্নতিসাধনের একটি প্রতিবন্ধকতা তা ইতিহাস যথার্থভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে। ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারি যে, যখন যে জাতি প্রাপ্য স্বাধীনতা পেয়েছে, তখনই তাদের ভাষা সুমার্জিত ও উন্নত হয়েছে, এবং যখন যে জাতি পরাধীন হয়েছে তখনই তাদের ভাষা অবনতি হয়েছে।[৩৫]

রামমোহন রায়ের হাতেই আধুনিক বাংলা গদ্যের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটেছিল। রামমোহনই প্রথম নিয়মিতভাবে তাঁর ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ক প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় লিখতে শুরু করেন। কিন্তু বাংলা গদ্য অক্ষয় দত্তের হাতেই উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সেই সময় সাধু ভাষায় সবাই কথা বলত ও লিখত, তাই দত্তের রচনাগুলিও সাধু ভাষায় রচিত। তাঁর রচনাগুলি বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এছাড়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলিও যে সেই

[৩৫]ঐ। (ঐ)

যুগের বাংলা গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার যোগ্য, তা তিনিই প্রথম বাঙালি পাঠককে প্রত্যক্ষ করান।

তিনি ছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা ভাষার অন্যতম প্রাণপুরুষ। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বিদ্যাসাগর ও দত্তের হাতে বাংলা গদ্য বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে আধুনিক, দৃঢ় সংবদ্ধ ও দার্শনিক আলোচনার যোগ্য বাহন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তাঁরা বাংলা ভাষাতে সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য প্রদান করেছেন। এই কারণে বাংলা ভাষা তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁদের আগে বাংলা ভাষা তেজহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প রচনার উপযোগী ছিল; অশ্লীল কবিতা, পাঁচালী ও পদ্যই তখন বেশি ব্যবহত হত। তাঁরাই ভাষার সংকীর্ণতা ও অভাব দূর করেন। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন অক্ষয়কুমারের অক্ষয়কীর্তি বিরাজ করবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, পুরাবৃত্তদের সমুদ্র থেকে অনেক পরিশ্রমে তিনি মহামূল্য মণি-মুক্তা সংগ্রহ করে তাকে সাজিয়ে গেছেন।”[৩৬]

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও অক্ষয়বাবুর রচনা হইতে ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের মাতৃভাষা অনাদরের সামগ্রী নয়; ক্ষমতাবান্ লেখকের হস্তে তাহা অসাধারণ শক্তি বিকাশ করিতে সক্ষম।[৩৭] অক্ষয় দত্ত দীর্ঘ ১২ বছর (১৮৪৩-৫৫ সাল) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর দ্বারা সুসম্পাদিত সেই পত্রিকা পড়ে ডিরোজিও শিষ্য রামগোপাল ঘোষ একদিন রামতনু লাহিড়ীকে বলেছিলেন, *“রামতনু! রামতনু! বাঙ্গলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ,”*[৩৮]

---

[৩৬]নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, অক্ষয় চরিত, পৃ. ৩৩।

[৩৭]যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত*, ১৯৭৮, পৃ. ১৪৯।

[৩৮]শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, ২০১৬, পৃ. ১৩১।

রাজনারায়ণ বসু বলেন, "অক্ষয়বাবু বর্তমান বাংলাভাষার একজন প্রধান নির্মাতা।"..... অক্ষয়বাবুর ভাষার ওজস্বিতায় ও মধুরতায় কে না বিমোহিত হয়? শোক-সন্তপ্ত-ব্যক্তিও এতে কিছুকালের জন্য চিত্ত-প্রসাদ প্রাপ্ত হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই এটি অনায়াসে বোধগম্য। তিনি অতি কঠিন গুরুতর বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করলে সেগুলি বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠত। তিনি যে সব নতুন শব্দ প্রস্তুত করেন তার মধ্যে কতগুলি প্রচলিত, কতগুলি এডমন্ড বার্ক কর্তৃক প্রবর্তিত spheterize কথার ন্যায় হচ্ছে। 'ধনী', 'মানী', 'জ্ঞানী' প্রভৃতি সংস্কৃত ইনভাগান্ত শব্দগুলি বাংলায় কেবল কর্তি কারকের একবচনে দীর্ঘঈকারান্ত, তাছাড়া সর্বত্র হ্রস্বইকারান্ত হত। তিনি সে প্রয়োগ বাদ দিয়ে সকল বিভক্তি ও সকল বচনে দীর্ঘঈকারান্ত লেখার নিয়ম করেন।"[৩৯]

তিনি বাংলা বানানরীতির ছাঁদ বেঁধে দিয়েছেন। তিনি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ফাল্গুন ১৭৭৫ শকাব্দে, ১২৭ সংখ্যার ১৩৪-১৩৫নং পৃষ্ঠায় লিখলেন, 'ইনভাগান্ত শব্দ'-এর প্রয়োগ কী হওয়া উচিত। তাঁর কথা এই:

বাঙ্গলা ভাষায় হলন্ত শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে, যে সংস্কৃত ভাষায় প্রথমা বিভক্তির একবচনে যে শব্দের যেমন রূপ হয়, বাঙ্গলায় সকল বিভক্তি ও সকল বচনেই সেইরূপ লিখিত হইয়া থাকে; যেমন বিদ্বান্, বিদ্বান্‌কে, বিদ্বান্ দিগকে, বিদ্বান্ দিগের ইত্যাদি। কিন্তু ইন্ ভাগান্ত শব্দ বিষয়ে কেহ সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন না। উহা কেবল কর্ত্তৃ কারকের একবচনে দীর্ঘ ঈকারান্ত, তদ্ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় স্থানেই হ্রস্ব ইকারান্ত লিখিত হইয়া থাকে; যেমন জ্ঞানী, জ্ঞানিরা, জ্ঞানিকে, জ্ঞানিদিগকে, জ্ঞানিদিগের ইত্যাদি। কিন্তু এই রীতি অবলম্বন করাতে কোন লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না, প্রত্যুত বাঙ্গলা রচনাকে নিরর্থক কঠিন করা হয়। বিশেষতঃ যখন আর আর হলন্ত শব্দ বিষয়ে অন্য প্রকার সহজ রীতি প্রচলিত আছে, তখন

[৩৯]নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

ইন্ ভাগান্ত শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে তাহার অন্যথা করা কোনরূপেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। অতএব উহার সকল বিভক্তি ও সব বচনেই দীর্ঘ ঈকারান্ত লেখা উচিত। তাহা হইলে, সর্ব্বত্র এক প্রণালী অবলম্বন করা হয়, এবং এক প্রণালী অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানিরা, জ্ঞানিকে, জ্ঞানিদিগকে, জ্ঞানিদিগের, না লিখিয়া জ্ঞানীরা, জ্ঞানীকে, জ্ঞানীদিগকে, জ্ঞানীদিগের লেখাই শ্রেইয়ঃকল্প।

বাঙ্গলা ভাষায় সমাস-প্রক্রিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং কী ইন্ ভাগান্ত কি অন্য অন্য হলন্ত শব্দ সর্ব্বত্রই সেই নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; যেমন ভগবৎ-সেবা, জ্ঞানি-কৃত, মহাপূজা ইত্যাদি। যে স্থলে কোন শব্দে বাঙ্গলা ভাষার নিয়মানুসারে বিভক্তি যোগ করা যাইবে, তথায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী প্রথা প্রচলিত করাই বিধেয়।[৪০]

তিনি পাঠ্য গ্রন্থ 'ভূগোল'-এর (১৭৬৩ শকাব্দ/১৮৪১ সাল) "জাতিবিশেষের স্বভাব" অংশে লিখেছেন,

"রুষ জাতির অধিকাংশ অসভ্য কিন্তু ধনি লোকেরা সম্প্রতি সভ্য হইয়াছে। সুইডন্ দেশীয়েরা বহুদর্শী এবং নীতিজ্ঞ। নারোয়ের লোক অসভ্য কিন্তু আতিথেয় এবং নীতিজ্ঞ। দিনামারেরা পরিশ্রমী এবং শান্ত। ওলেন্দাজেরা পরিশ্রমী অল্পব্যয়ী, এবং পরিচ্ছন্ন। জর্মানেরা বিজ্ঞ, প্রতিজ্ঞা শীল, এবং বিদ্বান। সুইজর্লন্ডীয়লোক সাহসী, বিশ্বাসী এবং দেশহিতৈষী। ইটালীয়লোক সঙ্গীত, কবিতা এবং চিত্রবিদ্যায় অতি নিপুণ, কিন্তু অলস, পাপিষ্ঠ, প্রতি হিংস্রক এবং ভণ্ডতপস্বী। ফরাশীশেরা শিষ্ট, পরিশ্রমী, শিল্প নিপুণ, যুদ্ধশীল, যশ আকাঙ্ক্ষী, বিজ্ঞানোৎসাহী, কিন্তু অনেকে তাহারদিগকে অসরল এবং কুনীতি বিশিষ্ট কহেন। স্পানিয়ারা এবং পোর্তুগীশেরা দর্পকারী, প্রতি হিংস্রক, মূর্খ, এবং ভণ্ড তপস্বী, কিন্তু পূর্ব্বে সুসভ্য ছিল। তুরকেরা মূর্খ, এবং ভণ্ডজ্ঞানী, কিন্তু সৎ।

[৪০]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পা.), *শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, পৃ. পরিশিষ্ট ১৯ ও ২০।

আয়রিশ্ অর্থাৎ আয়র্লন্ডীয়েরা সাহসী, সৎ, চতুর কিন্তু আশু বিবাদী। স্কটলন্ডীয় লোক পরিমিত ব্যয়ী, বৃহৎকর্ম্মী, নীতিজ্ঞ এবং সাধারণ বিদ্যোৎসাহী। ইংরেজদিগের শিল্পবুদ্ধি, বাণিজ্য কার্য্য, জাহাজীয় কর্ম্মে নৈপুণ্য, সাধারণ দাতব্যতা এবং স্বাধীনতার অভিলাষ পৃথিবী মধ্যে অদ্বিতীয়।'[৪১]

ভূগোল বইয়ের এই অংশটি প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুহম্মদ সইফুল ইসলাম বলেছেন, অক্ষয়কুমারের ভূগোল-এর গদ্য কতটা সুস্বাদু ছিল, তার নজির বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদটিতে একমাত্র ব্যতিক্রম 'হইয়াছে'-কে বাদ দিলে আর কোনো ক্রিয়ার ব্যবহার চোখে পড়ে না। কিন্তু তাই বলে অনুচ্ছেদটি আড়ষ্ট হয়ে পড়েনি কোথাও। এখানে বক্তব্য কিছুটা মন্তব্যধর্মী বলে ক্রিয়াপদের ব্যবহার অনেকটাই সংকোচিত হয়েছে। কিন্তু যতিচিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহারে ভাষা পেয়েছে গতি, বর্ণনা হয়েছে স্বচ্ছ। গদ্যের এই দুই গুণ- 'গতি' এবং 'স্বচ্ছতা', গদ্য ভাষার মৌলিক গুণ। গদ্য শিল্পীর হাতেই কেবল এ গুণের সৃষ্টি সম্ভব। আধুনিক বাংলা গদ্যের যা গুণ-স্পষ্টতা এবং শৃঙ্খলা-যতিচিহ্নের সুনিয়মিত ব্যবহারে যে গদ্য স্বচ্ছন্দ এবং গতিশীল হয়, অক্ষয়কুমারের ভূগোল-এর গদ্য ভাষায় এসব গুণ অনায়াসে লক্ষ করা যায়।[৪২]

তিনি চারুপাঠের তৃতীয় ভাগের 'স্বপ্নদর্শন-বিদ্যাবিষয়ক'-এ লিখেছেন- "পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া আমি কিয়ৎকালাবধি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানা স্থান পর্যটনপূর্বক এখন মথুরা সন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্বক সুললিত লহরীলীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরকখণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে দিব্য-

[৪১]অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভূগোল*, পৃ. ৫১ ও ৫২।

[৪২]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, পৃ. ৪৫২।

লাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিতরণপূর্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণবিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে ঊষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল, কখনও গগনালম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, পশু-পক্ষী সকল নীরব ও নিস্পন্দ হইয়া স্ব-স্ব স্থানে নিলীন হইল, এবং সর্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখন্ডে উপবিষ্ট হইয়া আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে জগতের আদি অন্ত, কার্জ্জব কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্মাধর্ম সমুদায় মনে মনে পর্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল-কল্লোলের কলকল ধ্বনি, বৃক্ষ-পত্রের শরশর শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল দ্বারা পরম সুখানুভব হইয়া মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিলেক। আমার বোধ হইল যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোনো স্থানে কেবল নবীনদূর্বাদলপরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝরতীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্বিদিক বিবেচনা না করিয়া, যতদূর দৃষ্ট হইল, ততদূরই মহোৎসাহে ও পরম সুখে পর্যটন করিতে লাগিলাম।

.....অবশেষে যখন পর্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কী অনির্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল! তথাকার সুশীতল মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিসংবাদ, চৌর্য, অত্যাচার এ-সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্ব-সংসারে এমন রম্যস্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিছুকাল ইতস্তত ভ্রমণান্তর দূর হইতে এক অপূর্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি পরম-পবিত্র সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাহাঁদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী এবং সারল্য ও বাৎসল্য স্বভাব অবলোকন করিয়া অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য এই যে, তাহাঁদিগের শরীরে কোনো অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্তত ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম, ইঁহারা দেব-কন্যা হইবেন তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, ইঁহারা দেব-কন্যাই বটেন এবং এই ধর্মাচল ইঁহাদের বাসভূমি; ইঁহাদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইঁহাদের রূপ ভুবনবিখ্যাত।.....[৪৩]

এই রচনাটি প্রসঙ্গে অধ্যাপক ইসলাম বলেছেন- "স্বপ্নদর্শন-বিদ্যাবিষয়ক' নভেম্বর ১৮৪৯ সালের আগে বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষায় এরকম সুন্দর রচনা সুলভ নয়। এ রচনার ভাষা শুধু পরিষ্কার রূপে অর্থ প্রকাশের ভাষা নয়, রস সাহিত্যের মহাগুণ যে সৃষ্টি, যা মানব মনের

[৪৩]অক্ষয়কুমার দত্ত, *চারুপাঠ* (তৃতীয় ভাগ), ১৯১২, পৃ. ১-১০।

কতকগুলো সূক্ষ্ম-কোমলভাব নিজের অজান্তে সঙ্কীর্ণ সীমানা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, এবং ভাব ও ভাষা মিলে যে বস্তুকে উজ্জ্বল করে তোলে, অক্ষয়কুমার দত্তের এ বর্ণনায় সেরকম একটি সাহিত্য-ভাব মূর্তিমান হয়ে উঠেছে।[৪৪]

শুধু সাহিত্য রচনার উপযুক্ত বাংলা ভাষাই নয়, অক্ষয় দত্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনারও পথিকৃৎ। সংস্কৃত ভাষা দ্বারা বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়। তাই তিনি বাংলা ভাষা ও পরিভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। এই ব্যাপারে অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য: "রামমোহন রায় ধর্মীয় তত্ত্ব ও সামাজিক আচারমূলক প্রবন্ধ রচনার যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যস্থতায় এক সম্পূর্ণ নতুন ধারা এসে যুক্ত হল। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, বাংলা প্রবন্ধের সাহিত্য ধর্ম রক্ষা করেও তিনি তার মধ্যে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করেছেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, তিনি বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসাধনার অগ্রদূত। সেই সূত্রেই সে যুগে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের তিনি ভবিষ্যত পথপ্রদর্শক। রামমোহন ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে সেদিন যে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর সীমা উত্তীর্ণ হয়ে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের তপস্যা কেবলমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর ধ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অনাগত যুগের মধ্যেও তার সম্ভাবনা রেখে গিয়েছিল। অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্র যে কত বিস্তৃত, তার বিষয়ের মধ্যে যে অন্তহীন বৈচিত্র্য আছে, তা আমরা তাঁর মধ্যেই প্রথম দেখতে পেলাম। পাশ্চাত্য জ্ঞান-

[৪৪]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, ২০০৯, পৃ. ৪৫৬।

বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ও যে সেই যুগের বাংলা গদ্য ভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবার যোগ্য ছিল, তা অক্ষয়কুমারই প্রথম প্রত্যক্ষ করালেন।”[৪৫]

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করতে গেলে চাই উপযুক্ত এবং বিভ্রান্তিহীন পরিভাষা, এবং প্রবন্ধের উপযোগী ভাষার কাঠামো ও বিন্যাস, যার মাধ্যমে অনায়াসে সাহিত্য সমালোচনা, গদ্য সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনার প্রাথমিক দায়িত্ব যথাযথ ও নির্ভুল হওয়া, এর পরে আসে তার সরল ও মনোগ্রাহী উপস্থাপনা। এই কাজ সুষ্ঠ পদ্ধতিতে করার জন্য চাই যতি চিহ্নের ব্যবহার, যে বিষয়টি সেকালের পয়ার ছন্দে রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবশ্যিক এক উপাদান ছিল না। তখন তিনি প্রথম যতি চিহ্নের ব্যবহার শুরু করলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে ধার করে।

(ছ) *যতিচিহ্নের* প্রবর্তক

গদ্য রচনার উপযুক্ত বাংলা ভাষাই শুধু নয়, অক্ষয়কুমার দত্ত রচনাকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলা সাহিত্যে ‘যতি চিহ্ন’-এর প্রবর্তন করেছিলেন। অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, *“আধুনিক রীতির গদ্য বাক-ধারা নির্মাণে তাঁর (অক্ষয় দত্ত) সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ইংরাজি থেকে যতিচিহ্ন আত্মসাৎ করে তাদের বাংলা ভাষার কোলে-কাঁখে গুঁজে দেওয়া। পূর্ণচ্ছেদ যতিচিহ্ন হিসাবে দাঁড়ির ব্যবহার আগে থেকেই ছিল। সংস্কৃত শ্লোকের এক দাঁড়ি দুই দাঁড়ি গ্রহণ করে। বাকিগুলি, অর্থাৎ, কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:), হাইফেন (-), ড্যাশ (--), প্রশ্নবোধক-চিহ্ন (?), বিস্ময়চিহ্ন (!), উহ্যবাচক ঊর্ধব কমা (‘), দুরকম উদ্ধৃতি-চিহ্ন (“ এবং ””), তিন*

[৪৫]অশোক মুখোপাধ্যায়, *ডিরোজিও ও অক্ষয়কুমার দত্ত*, ২০১৩, পৃ. ৩২।

রকমের বন্ধনী (() {} []), অনুক্তিবাচক বহু ডট (.....), ইত্যাদি এমনভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন যে আজ এগুলি যে বাংলা ভাষার ভেতরে এক কালের আমন্ত্রিত বিদেশি অতিথি তা বলে না দিলে আর বোঝার কোনো উপায় নেই।"[৪৬]

কিন্তু অক্ষয়ের এই কৃতিত্ব পেতে অনেক দেরি হয়েছে। প্রথমে অনেকেই এই কৃতিত্ব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়েছিলেন! এমনকি অক্ষয়কুমার জনমানসে অপ্রচারিত হওয়ায় এখনও তাঁর পরিবর্তে বিদ্যাসাগরকেই সকলেই 'যতিচিহ্নের পথিকৃৎ' মনে করেন। আসলে, বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্ন ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের কথা সর্বপ্রথম বলেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কথা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। যার দরুন রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে যতিচিহ্নের প্রবর্তক হিসেবে সম্মানিত করেন। এবং এটাই স্থায়ী রূপ পেয়েছিল। কিন্তু শিশিরকুমার দাশের অনুসন্ধানের ফলে যতিচিহ্ন ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। প্রধানত তাঁরই জিজ্ঞাসা এ বিষয়ে সত্য নির্ণয়ে সহায়তা করে। এবং যতি চিহ্নের প্রবর্তকের সম্মান অক্ষয়কুমার দত্তের বলে স্বীকৃত হয়। .....শ্রীশচন্দ্র দাসের 'সাহিত্য-সন্দর্শন' বইটি বাংলা যতিচিহ্নের বিভ্রান্তিতে সহায়তা করেছে প্রবলভাবে।[৪৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা লেখার সর্বপ্রথমে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ছেদ চিহ্নগুলি প্রচলিত করেন। [....] বাস্তবিক একবার সমভূম বাঙ্গালা রচনার মধ্যে এই ছেদ আনয়ন একটা নবযুগের প্রবর্তন। এতদ্বারা, যাহা জড় ছিল তাহা গতি প্রাপ্ত হইয়াছে।"[৪৮] এই বিভ্রান্তিটা রবীন্দ্রনাথের অজান্তে ও তাঁর মাধ্যমে সত্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় দীর্ঘস্থায়ী লাভ করে।

---

[৪৬]তদেব, পৃ. ৩৩।

[৪৭]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, ২০০৯, পৃ. ৪৬১।

[৪৮]তদেব, পৃ. ৪৫৮।

নবেন্দু সেন দুঃখ করে লিখেছেন: 'বাংলা গদ্যের জনক', 'প্রথম যতি চিহ্নের প্রবর্তক' ইত্যাদি স্তূতিবাচক 'ফ্রেজ'-এর ব্যবহারে বিদ্যাসাগর বা বাংলা গদ্য, কোন বিষয়েরই সঠিক কিছু বলা হয় না। বরং সত্য ও তথ্যের বিকৃতি হয় বলে ভারতবর্ষের এত বড় এক অনন্যসাধারণ পুরুষের অবমাননাই করা হয়। জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এ ভ্রান্তি অপরাধ; এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের উচিত এই পাপের মোহ থেকে মুক্ত হওয়া।[৪৯]

এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়ের রচনার উল্লেখ করে কয়েকজন গবেষক দেখিয়েছেন যে, বিদ্যাসাগর প্রথম এই ধরনের সুসংগঠিত বাংলায় লেখেন *'বেতাল পঞ্চবিংশতি'* তে, যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। পক্ষান্তরে অক্ষয় দত্তের ১৮৪১ সালে রচিত 'ভূগোল' গ্রন্থেই আধুনিক যতি চিহ্নের প্রয়োগ দেখা যায়।[৫০] তাঁদের রচনাগুলি একটু বিশ্লেষণ করলেই এ সত্য প্রমাণিত হয়।

অক্ষয়কুমার দত্তের "ভূগোল" গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়টি এরকম-

আসিয়ার উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা হিন্দী মহাসাগর, পূর্ব্বসীমা পাসিফিক মহাসাগর, পশ্চিম সীমা ইউরাল পর্ব্বত, বলগা নদী, ডন নদী, আজব সাগর, কৃষ্ণ সাগর, মার্মোরা সাগর, ভূমধ্যস্থ সাগর, সুযেজ ডমরুমধ্য এবং লোহিত সাগর।

আসিয়ার মধ্যে এই কতিপয় দেশ আছে যথা উত্তর ভাগে রুষিয়া বা রুষদেশ, পশ্চিম ভাগে তুর্কী এবং আরব দেশ, পূর্ব্ব ভাগে চীনতাতার ও চীন, মধ্য ভাগে তির্ব্বত, স্বাধীন তাতার,

[৪৯]তদেব, পৃ. ৪৬১।

[৫০]অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

পারস্য ও কাবুল, দক্ষিণ ভাগে ভারতবর্ষ, শ্যাম, ব্রহ্মরাজ্য এবং বালুচিস্থান। আসিয়ার পূর্ব্বদিকে যাপান ও অন্য২ (অন্যান্য) ক্ষুদ্র উপদ্বীপ যাপান রাজ্য নামে খ্যাত আছে।[৫১]

অক্ষয় দত্ত ভূগোল গ্রন্থে যতিচিহ্নের ভিত্তি রচনা করে বাংলা গদ্যের মুক্তির পথ নির্মাণ করে দিয়েছেন। এই যতিচিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহার বাংলা গদ্যকে ছন্দময় ও গতিশীল করে তোলে।

তাঁর ১৮৪৫ সালের *'শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা'*-তে আমরা পাই- *"সপ্তাহ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পরে সূর্য প্রকাশ হইলে চিত্ত কী প্রকার প্রফুল্ল হয়! গ্রীষ্মেতে গাত্রদাহ হইয়া পরে মন্দ মন্দ শীতল বায়ুর হিল্লোল শরীর স্নিগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে অন্তঃকরণে কী প্রকার সন্তোষের উদয় হয়! সেইরূপ হিন্দুদিগের মলিন চরিত্রকে ক্রমশ উৎকৃষ্ট দেখিয়া চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি যে, স্বদেশের মঙ্গল চেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান ধর্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে- অনুৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা, দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ আমাদিগের মহাশত্রু হইয়াছে। আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি যে, আমারদিগের জ্ঞানের প্রতি সমাদর নাই, সত্যের প্রতি প্রীতি নাই, কোনো কর্মের উদ্যম নাই, এবং যতক্ষণ কোনো বিপদ মস্তকোপরি পতিত না হয় ততক্ষণ তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও হয় না। আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি যে, এদেশীয় লোক ইতর জন্তুর ন্যায় আহার-বিহারাদি অলীক আমোদকেই জীবনের মূলাধার-কার্য বোধ করেন, এ-প্রযুক্ত কিঞ্চিৎকালের ঐন্দ্রিয় সুখনিমিত্তে রাশি রাশি ধন সমর্পণ করেন, কিন্তু ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, জগদীশ্বর কী নিমিত্তে তাঁহারদিগকে ইতর পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া বুদ্ধির সহিত ভূষিত করিয়াছেন? তাঁহার নিয়মানুসারে উপযুক্তরূপে ক্ষুধা শান্তি না করিলে যে-প্রকার শরীরের সুস্থতা*

[৫১]অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভূগোল*, পৃ. ১১।

ভঙ্গ হয়, উপযুক্তরূপে বুদ্ধির আলোচনা না করিলে সেইরূপ মূর্খতা ও কদাচার-রূপ মানসিক রোগ উপস্থিত হয়, এই সত্যকে অজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা জ্ঞানের অবহেলা সর্বদা করিয়া আসিতেছেন। পুত্রের বিবাহোপলক্ষে কত ব্যক্তি লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু সেই পুত্রের বিদ্যা উপার্জন-নিমিত্তে মাসে পাঁচ টাকাও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এক রজনীর অপবিত্র আমোদ উপলক্ষে যাঁহারা সহস্র টাকা অনায়াসে ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারা কোনো বিদ্যালয়ের সাহায্য-জন্য দশ টাকা দান করিতেও বিমুখ হইয়াছেন। এই প্রকারে এদেশস্থ লোকের মনুষ্যত্বের চিহ্ন প্রায় ছিল না।'[৫২]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা *"বেতাল পঞ্চবিংশতি"* ১৮৪৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান গবেষক ১৮৫৮ সালের 'সপ্তম বার মুদ্রিত' বেতাল পঞ্চবিংশতি বইটি দেখেছেন। বইটির ১৯নং পৃষ্ঠার একটা অংশ উদ্ধৃত করা হল-

"প্রথম উপাখ্যান।

বেতাল কহিল মহারাজ শ্রবণ কর।

বারাণসী নগরীতে প্রতাপমুকুট নামে এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার বজ্রমুকুট নামে নন্দন ও মহাদেবী নাম্নী মহিষী ছিল। একদিবস রাজকুমার অমাত্র পুত্রকে সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। ক্রমে ক্রমে নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন নিবিড় অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক তন্মধ্যবর্ত্তী পরম রমণীয় এক সুশোভিত সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন ঐ সরসীর তীরে হংস বক চক্রবাক সারস প্রভৃতি নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ

[৫২]অক্ষয়কুমার দত্ত, হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), ২০০৮, পৃ. ১০৯।

কলরব করিতেছে। প্রফুল্ল কমল সমূহের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে । মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ ধ্বনি করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব ফল কুসুম সমূহে সুশোভিত আছে। তাহাদিদের ছায়া অতি স্নিগ্ধ ও সুশীতল বিশেষিতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধ বহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা পরম রমণীয় হইয়াছে। তথায় প্রবেশ মাত্রেই শ্রান্ত ও আতপতাপিত ব্যক্তির ক্লান্তি দূর হয়। ঐ সরসীর চারিদিকে চারি প্রস্তরময় ঘাট ছিল। রাজকুমার অন্যতম দ্বারা অবতীর্ণ হইয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলেন।"

দেখাই যাচ্ছে, এখানে একমাত্র দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোন যতিচিহ্ন নেই।

শিশিরকুমার দাশ তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতির প্রথম মুদ্রণে একমাত্র দাঁড়ি ছাড়া অপর কোনো চিহ্ন ছিল না। এমনকি দ্বিতীয় সংস্করণেও শুধু দাঁড়িই লক্ষ করা যায়।[৫৩] বিদ্যাসাগর নিজে বলেছেন, 'বেতালপঞ্চবিংশতি দশমবার প্রচারিত হইল। এই পুস্তক, এতদিন, বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী অনুসারে, মুদ্রিত হইয়াছিল; সুতরাং, ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরামচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে সে সমুদয় পরিগৃহীত হয় নাই।....."[৫৪]

[৫৩]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, পৃ. ৪৬০।

[৫৪]তদেব, পৃ. ৪৫৯।

(জ) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সর্ব্বজন *প্রশংসিত 'পাখী সব করে রব'* কবিতার অপূর্ব্ব সমালোচনা[৫৫]

"একদিন চাঁদড়া নিবাসী আমার (মহেন্দ্রনাথ রায়) পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে বাংলা পদ্য সংক্রান্ত নানারকম কথোপকথন হচ্ছিল। মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'পাখী সব করে রব' এই কবিতার কথা উঠলে, অম্বিকাবাবু বলেন, "তা আদ্যোপান্ত ভুলে পরিপূর্ণ। "তা শুনে আমি বললাম, "কিন্তু সর্বসাধারণের মতে তা অতি মনোহর। "আমার আগের ধারণা প্রবল দেখে তিনি আমায় বললেন, "এ বিষয় আমি বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের কাছে শুনেছি। "এই কথা শোনামাত্র আমি তটস্থ ও কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে অক্ষয়বাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি তর্কালঙ্কারের রচনা মাধুর্যের যথেষ্ট প্রশংসা করে অবশেষে বললেন, "কিন্তু প্রভাত বর্ণনটি প্রকৃত স্বভাব বর্ণনা নয়; প্রত্যুত, স্বভাবের বিরুদ্ধ বর্ণনা। "এই কথা শুনে আমি (মহেন্দ্রনাথ) জিজ্ঞাসা করলাম, "সে কিরকম, বলে দিন। "তার পরে তিনি (অক্ষয় দত্ত) বললেন, "তুমি এক এক পংক্তি আবৃত্তি কর। আমি তাঁর (মদনমোহনের কবিতার) ভুলগুলি বলে যাই। "আমি ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করতে লাগলাম, তিনি (অক্ষয়) পর পর উত্তর [দিয়ে] গেলেন।" তখন আমার নিশ্চয় মনে হল, তা এখনই বই থেকে উঠিয়ে দেওয়া কর্তব্য। বইয়ের মধ্যে তা রাখলে

[৫৫]মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৯।

উদ্বোধন পত্রিকার ১২৯০ বঙ্গাব্দের ১৭ কার্তিক সংখ্যায় মহেন্দ্রনাথ রায় 'প্রভাত বর্ণন' কবিতা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার দত্তের বিশ্লেষণ-বিষয়ে এক কৌতুকপ্রদ কাহিনি শুনিয়েছেন। [মদনমোহন তর্কালঙ্কার, *শিশুশিক্ষা,* আশিস খাস্তগীর (সম্পা.), কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর ২০০৩, প্রথম আকাদেমি সংস্করণঃ জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১১৪।]

শিশুগণের আর কুসংস্কার জন্মিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সেই জন্যই আমি সাধারণের গোচরার্থে আমার আবৃত্তি ও অক্ষয়বাবুর উত্তর নীচে লিখছি,

আবৃত্তি।–পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।

কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।।

উত্তর।– রাত্রি প্রভাত হওয়ার সময় "সকলি" দূরে থাক, অতি অল্প ফুলই প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। বেল, মল্লিকা, নবমল্লিকা, বনমল্লিকা, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ, জুথী, জহর চাঁপা ইত্যাদি অনেক সুপ্রসিদ্ধ সুগন্ধি ফুল বিকেলে বা প্রদোষ কালে ফোটে। কৃষ্ণকলি প্রভৃতি কতগুলি সুদৃশ্য ফুলও বিকালে ফোটে। শেফালিও সন্ধ্যার পরে বিকশিত হয়ে গন্ধ বিস্তার করে। পদ্ম, সূর্য্য-মণি, অপরাজিতা, করবী এই সমুদায় পূজার ফুল সূর্যোদয়ের পরে এবং কোনটা কিছু বেলাতে ফুটে উঠে, কুমুদ, টগর, ধুতুরা প্রভৃতি কতগুলি ফুল রাতে ফোটে। আমার "শোভনোদ্যানে" দু-এক প্রকার ফুল আছে, তা সকালে প্রস্ফুটিত হওয়া দূরে থাকুক, মধ্যরাত্রিতে প্রস্ফুটিত হয়ে সকালেও কোনটা কিছু বেলায় মুদিত হয়ে যায়। অন্যান্য অনেক ফুল সকাল ছাড়া অন্য সময় ফুটতে দেখা যায়।

আবৃত্তি।– রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।

শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।।

উত্তর।– যে সময়ে রাত্রি সকালের উপক্রম হয় পাখির "রব" শুনতে পাওয়া যায়, "রাখালেরা" সে সময়ে "গরুর পাল" নিয়ে "মাঠে যায়" না। তারা দুধ দোহন করে সূর্যোদয়ের কিছু পরে গোচরণে যায়।

আবৃত্তি।– ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।

পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।।

উত্তর।– মালতী ফুল বিকালে ফোটে। এ সম্বন্ধে আর কি বলব?

আবৃত্তি।– শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।

পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।।

উত্তর।– যে ঋতুতে "পাতায় পাতায়" টপ্ টপ্ করে "নিশির শিশির পড়ে", সেই ঋতুর প্রভাত সময়ের শীতল বায়ু প্রহারে সহজ লোকের 'শরীর জুড়ায়' না। এবং যে ঋতুতে "পাতায় পাতায় নিশির শিশির পড়ে", সে ঋতুতে "মালতী ফুল" প্রস্ফুটিত হয়না।

মদনমোহনের এই কবিতা তৎকালীন সময়ে শিশু পাঠ্য ছিল। অক্ষয় দত্ত দ্বারা এই সমালোচনা দত্তের সাহিত্যিক প্রতিভা, বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তিবাদের পরিচয় বহন করে। শিক্ষা যেন নির্ভুল তথ্য ভিত্তিক হয় সেটা তাঁর রচিত ভূগোল-পদার্থবিদ্যা-চারুপাঠ ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকগুলিতে আমরা লক্ষ্য করেছি। এই কবিতাটি যে ভুলে ভরা এবং এর পরিবর্তন হওয়া দরকার বা এই পাঠ্যটি শিশুদের পড়ানোর প্রয়োজন নেই একথা আমরা তাঁর সমালোচনা থেকেই বুঝতে সক্ষম। সর্বোপরি, বর্তমান গবেষকও তার ছোটবেলায় এই কবিতাটি পড়েছিলেন। ফলে এই ভুলের চর্চা অক্ষয়ের সমালোচনার এতদিন পরেও বিদ্যমান ছিল।

(ঝ) অন্যান্য বিষয়াবলীঃ গ্রন্থাগার-কৌতুকাগার, ছাত্রপ্রীতি ও শিক্ষার জন্য অনুদান (হিন্দু হোস্টেল প্রসঙ্গ/উইলে বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি)

তিনি একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষার প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। এখানে ছাত্রদের সাথে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করা হচ্ছে, যা তাদের সাথে তাঁর

ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক। ঘটনাটি এরকম, কলকাতার হিন্দু হস্টেলের আবাসী বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররা ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে অক্ষয় দত্তের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই বিষয়টি শুনে দত্ত ভাবলেন, বহু সংখ্যক ছাত্রের তাঁর কাছে আসার থেকে তাঁর সেখানে (হস্টেলে) যাওয়াই সুবিধাজনক এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়করও বিষয়টি।

সেইমত একদিন তিনি ব্রজনাথকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দু হস্টেলে উপস্থিত হলেন, তখন আবাসী সকল ছাত্ররা একসাথে তাঁর কাছে 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার প্রয়োজন আছে কি না?' এই বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি সেই বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। এই কথোপকথনটি গবেষণা সন্দর্ভের যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু একটি তথ্য উল্লেখ করা আবশ্যক— এই আলোচনার সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন।

তিনি মৃত্যুর পূর্বে উইলের মাধ্যমে তাঁর সম্পত্তির ৭ ভাগের ১ ভাগের অর্ধেক অংশ কলকাতার ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভায়, অর্থাৎ Indian Association for the Cultivation of Science নামক সভায় (প্রতিষ্ঠানে) দান করেন। এবং যাতে দুঃখী লোকের দুঃখ দূর হয়, তার জন্য বাকি অর্ধেক অংশ প্রদান করেন।

এছাড়া সম্পত্তির সাত ৭ ভাগের অন্য এক ১ ভাগ দ্বারা গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি কিনে তার উপস্বত্বের অর্ধেক অংশ থেকে বালি বা উত্তরপাড়া বা কলকাতার কাছের কোন সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকের মধ্যে সেই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ও কর্মাধ্যক্ষের মতে যে ছাত্রটি যে বছর সর্বাপেক্ষা সৎ চরিত্র বলে বিবেচিত হবে, সেই বছর তাকে পারিতোষিক দেবেন ঘোষণা করেন। যদি ঐ উপস্বত্ব একজনের বেশি সংখ্যক ছাত্রকে দেওয়ার কথা বিবেচিত হয়, তবে এগজিকিউটররা তাদের বিবেচনা অনুসারে আলাদা আলাদা বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে তা

দেবেন। অন্য অর্ধেকাংশ (অবিভক্ত) বাংলাদেশের অন্তর্গত কোনও স্থানের লোকের ব্যায়াম অভ্যাস বিষয়ে নিয়োজিত করে দেন।

তাঁর বালির বাড়ির আড়ম্বরহীন ঘরগুলি দেখলে কোন বৈজ্ঞানিকের ঘর বলে মনে হত। জানা যায়- নানাবর্ণের কত প্রকার শঙ্খ, শামুক, প্রস্তরীভূত জীব-জন্তু, উদ্ভিদ, অকরীয় ধাতু, প্রবাল, স্ফটিক, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র, বাঘের চামড়া, সাপের চামড়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের তামা ও রুপার মুদ্রা; রাজা রামমোহন রায়, ডারউইন, নিউটন, হাক্সলি ও জন ষ্টুয়ার্ট মিল-এর প্রতিকৃতি; বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের ভূতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব বিদ্যা বিষয়ে ছবি; পুরানো ভারতবর্ষের মানচিত্র; তাজমহলের ছবি; কত প্রকার শিল্প কাজ ইত্যাদি আরও কত সুশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে মহামূল্য দ্রব্য সেখানে ছিল। তিনি উইলে বলেছেন, তাঁর এই শিক্ষাদায়ক ও কৌতুকাবহ দ্রব্যগুলি যদি এগজিকিউটররা তাঁর কোনও উত্তরাধিকারীকে ব্যবহার করার উপযুক্ত জ্ঞান করেন, তবে তাঁকেই দেবেন। নতুবা, কোনও সাধারণ লোকের শিক্ষাস্থানে সেগুলি দান করবেন।[৫৬]

শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রন্থাগার (Library) স্থাপন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এই বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন, *নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠাগার সংস্থাপন করাও কর্তব্য। আবশ্যকমত সমুদায় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাহারও পক্ষে সাধ্য নহে। অতএব, সাধারণ পুস্তকালয় ও তৎসংক্রান্ত সাধারণ পাঠাগার নিতান্তই আবশ্যক। তাহা হইলে, লোকে তথায় গমন করিয়া তথা হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠজনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে,.....*[৫৭] শোভাবাজার রাজবাড়ির গ্রন্থাগারে তাঁর পড়াশুনা করার বিষয়টি বর্তমান গবেষক পূর্বেই উল্লেখ করেছেন।

---

[৫৬]নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।

[৫৭]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ২০০৭, পৃ. ৪১।

শিরঃপীড়া হওয়ার পর তিনি একান্ত নিরাপদ স্থান গঙ্গার পূর্ব পাড়ে বালি গ্রামে একটি বাড়ি কিনে বসবাস করতে থাকেন। তার ঘরের সাথে একটি বড় উদ্যানও (শোভনোদ্যান) ছিল। বিদ্যাসাগর এটিকে 'চারুপাঠ চতুর্থ ভাগ' বলেছিলেন। কেন এমন নামকরণ? অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ নামে তিন খণ্ড শিশুকিশোর পাঠ্যবই ছিল। চারুপাঠ-এ বিধৃত নানা নতুন জ্ঞানের সমষ্টির মতো অক্ষয়কুমারের এই বাড়িটিও ছিল একাধারে উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও ভূ-তাত্ত্বিক সংগ্রহের এক বৈজ্ঞানিক আবাসন। এটাই ছিল এমন নামকরণের কারণ।[৫৮] বর্তমানে এই শোভনোদ্যান প্রায় ভগ্নস্তূপ। তাঁর মৃত্যুর পর এর কোনরকম রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি।

উনিশ শতকের বাংলা ছিল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসক সেই সম্ভাবনা পূর্ণ করতে দেয়নি। বা অন্যভাবে বলা যায় তারাই সেই 'সীমিত' সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। উনিশ শতক হল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-শিক্ষা সংক্রান্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময়। সেই সময়কালে এই বাংলার শিক্ষা (সমাজ) সংস্কারের অন্যতম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বিশেষতঃ মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ।

[৫৮]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *মুক্তচিন্তার বিস্তার*, ২০১৮, পৃ. ১৬।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ
পত্রিকা সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত

এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন রচনায় তাঁর চিন্তা-মতাদর্শ যেভাবে ফুঁটে উঠেছে, পাঠকবর্গের সাথে তার পরিচয় করানো। সময়ের প্রভাবে প্রথমে তিনি *'অনঙ্গমোহন'* (১৮৩৪) কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন, যা চটুল জাতীয় ছিল। গবেষকরা মনে করেন তাঁর এই কাব্যগ্রন্থটি *'বটতলা সাহিত্য'* গোত্রীয় ছিল। তাই হয়তঃ এর কোন কপি তার পরিবারের সদস্যরা সংগ্রহ করে রাখেননি। এর কোন কপি আর এদেশে উপলব্ধ নেই। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে (লন্ডন) এর একটি কপি নাকি রয়েছে।

তিনি এরপর সময়ের দাবী মতন 'গদ্য' লিখতে শুরু করেছিলেন। লিখেছেন তৎকালীন সময়ের স্বনামধন্য কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত *'সংবাদ প্রভাকর'* পত্রিকায়। পরে নিজে *'বিদ্যাদর্শন'* পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত *'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'* সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘ ১২ বছর (১৮৪৩-৫৫ সাল) একাগ্রচিত্তে, নিয়মিতভাবে। এই সম্পাদনা একদিকে সেই পত্রিকাকে জনপ্রিয় করেছে, অন্যদিকে তাঁকে উনিশ শতকের বিশিষ্ট গদ্য শিল্পী, প্রবন্ধকার, চিন্তক, সমাজ সংস্কারক হিসেবে বাংলাদেশে (অবিভক্ত বাংলায়) পরিচিত করেছে।

(ক) গদ্য রচনার সূত্রপাত

অক্ষয়ের জ্যাঠতুতো দাদা হরমোহন দত্ত ওকালতি করতেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯ সাল)-এর সাথে তাঁর পরিচয় ছিল। গুপ্ত তাঁর পত্রিকার জন্য হরমোহনের

কাছে আদালতের বিজ্ঞাপন নিতে আসতেন। সেই সূত্রেই গুপ্ত কবির সাথে অক্ষয় দত্তের পরিচয় হয়। এভাবেই অক্ষয় সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। অন্যমতে, দর্জিটোলায় নরনারায়ণ দত্তের *বাংলা ভাষানুশীলনী সভা* ছিল। সেই সভায় অক্ষয় দত্ত প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের সাথে পরিচিত হন। এই পরিচয় অক্ষয়ের জীবনের গতিপথ পাল্টে দিয়েছিল।

অক্ষয় একদিন গুপ্ত কবির আমন্ত্রণে তাঁর পত্রিকা অফিস দেখতে যান। সেদিন ঘটনাচক্রে অফিসের এক কর্মী অনুপস্থিত থাকায় গুপ্ত কবি তাঁকে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার কিছুটা অংশ বাংলায় (গদ্যে) তর্জমা করে দিতে বলেন। কিন্তু তাঁর গদ্য লেখার অভিজ্ঞতা একেবারেই ছিল না। ইতিপূর্বে তিনি পদ্যই লিখতেন। কিছুটা ইতস্ততঃ করে গুপ্ত কবির বলপূর্বক আবেদনে তিনি সেই তর্জমাটি করেছিলেন, যা পড়ে মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বর গুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন, 'যিনি সর্বদা গদ্য লিখছেন তিনিও এরকম পারবেন না!' সেই থেকে তাঁর গদ্য রচনার সূত্রপাত। অক্ষয় দত্ত এরপর এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখতে থাকেন। তখন গুপ্ত কবি তাঁকে শিষ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। শেষে অক্ষয় দত্ত যখন বাংলা সাহিত্য জগতের বড় নাম, খ্যাতির চূড়ায়, তখন তিনি লিখেছিলেন- 'একদিন যে তাঁর শিষ্য ছিলেন, এখন তাঁকে তিনি গুরু বলে মেনে নিয়েছেন।'

(খ) বিদ্যাদর্শন পত্রিকা

অক্ষয় দত্ত *বিদ্যাদর্শন* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৭৬৪ শকাব্দ/আষাঢ় ১২৪৯ সাল/জুন ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ), টাকিবাসী প্রসন্ন কুমার ঘোষের সহায়তায় তিনি এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকাটি মাত্র ৬ মাস প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এই পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি লিখেছেন- "যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তখন পূর্ব্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে। এই পরমপ্রিয়কর নিয়মের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আমরাও বঙ্গদেশের (বাংলার) মৃতপ্রায় (বাংলা) ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ (ইচ্ছা প্রকাশ) করিয়াছি, কিন্তু পাঠকগণকে কি প্রকারে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিব, এই চিন্তা এইক্ষণে কেবল সংশয়ে পরিপূর্ণ রহিল, যেহেতুক আমাদিগের এবস্প্রকার উদ্যোগের ন্যায় এতদ্দেশে পূর্ব্বে এরূপ কোন কল্পনার সৃষ্টি হয় নাই, যে তাহার অনুগামী হইয়া আমরাও আমারদিগের অভিপ্রেত ব্যাপারে তত্তুল্য রচনাদি করিতে উদ্যত হই, সুতরাং, এ প্রকার নূতন বর্ত্মে আমরা অতিশয় ভীতচিত্তে অগ্রসর হইলাম, এবং সংশয়াপন্ন হইয়া বিদ্যার্থিগণকে এই পথকে অবলম্বন করতে নিমন্ত্রণ করিতেছি।

[.....] সম্প্রতি এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিবার জন্য ইহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নদেশে প্রকাশ করিতেছি। এতৎপত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যাৎদ্বারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদি লিখনে এক-এক প্রকাশ নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।

এইক্ষণে কবিতার রীতি আমারদিগের ভাষায় উত্তম নাই, অতএব তাহার প্রতি অধিক যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বোধে সর্ব্বদাই সাধারণ লেখকদিগকে তর্কদ্বারা (সমালোচনা) সাবধান করিব, এবং উত্তম২ (উত্তম) কবিতা লিখিয়া যিনি প্রেরণ করিবেন তাহা অবশ্য আমারদিগের

বিচারের সহিত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।"[১] মুহম্মদ সাইফুল ইসলামের মতে, এই কথাগুলিই "তাঁর (অক্ষয় দত্তের) চিন্তার সুর, তাঁর মুক্ত মনকে প্রতিফলিত করে।"[২]

খ. ক) বিদ্যাদর্শনে কী প্রকাশিত হত?

বিদ্যাদর্শন পত্রিকাটি মাত্র ছয় (৬) মাসের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল এবং অক্ষয় দত্ত পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারের আদর্শ পত্রিকার প্রত্যেকটি রচনায় সুপরিস্ফুট। বহুবিবাহ, অধিবেদন, এদেশীয় স্ত্রীলোকদের ব্যভিচারের কারণ, হিন্দু স্ত্রীদের বিদ্যাবুদ্ধির সৎ পরামর্শ, বঙ্গদেশের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব, স্ত্রীলোকদের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি রচনা তার নিদর্শন।[৩]

উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসের দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাব, সেই সময়কার বাংলা অনেকগুলি (নারীকেন্দ্রিক) সামাজিক সমস্যাতে জর্জরিত ছিল। সেই সামাজিক সমস্যাগুলির অন্যতম ছিল 'বহুবিবাহ প্রথা'। তিনি অনেকের আগেই এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বিদ্যাদর্শনের পাতায়। বিদ্যাদর্শনের ২য় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৭৬৪ শক) *বহুবিবাহ* বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

"স্ত্রীগণ (সপত্নী) এই শব্দের প্রতি যে প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করে এবং দ্বেষের সহিত নিয়ত তাহার অমঙ্গল চেষ্টা করে, আর পুরুষগণ অপরের সহিত আপন ভার্য্যার কোন অসদ্ব্যবহার দৃষ্টি করিলে যে রূপ ঈর্ষা এবং ঘৃণা অনুভব করিয়া থাকে, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে পরমেশ্বর মানুষ্যের অন্তঃকরণে এই উপদেশক দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, যে কি স্ত্রী কি

---

[১]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, ২০০৯, পৃ. ৫৮ ও ৫৯।

[২]তদেব, পৃ. ৫৮।

[৩]বিনয় ঘোষ (সম্পা. ও সংকলিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্রঃ ১৮৪০-১৯০৫* (তৃতীয় খণ্ড), ১৯৬০, পৃ. ৬৩ ও ৬৪।

পুরুষ উভয়ের পক্ষই এক স্বামী বা এক দারা সত্ত্বেও অপর বিবাহ করা কদাপি উচিত ও সুখজনক নহে।

.....স্ত্রী গ্রহণকালীন আমরা মস্তক উপরে এক বৃহৎ ভার ধারণ করি, এবং অসঙ্খ্য কর্ম্মসূত্রে অন্তঃকরণকে বদ্ধ করিয়া থাকি, বিশেষতঃ এই এক উত্তম ব্রত পালন করিতে স্বীকৃত হই, যে আমরা সাধ্যানুসারে আমারদিগের অর্দ্ধাঙ্গী ভার্য্যাকে আনন্দ বিতরণ করিতে ত্রুটি করিব না। এইরূপ স্ত্রীও স্বামীর সুখ জন্য সকল চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে অঙ্গীকার করেন। অতএব স্ত্রীর সুখ অন্বেষণ স্বামীর প্রধান কার্য্য, এবং পতির সুখ চিন্তা ভার্য্যার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হইয়াছে, কি যে স্থলে স্ত্রীর সঙ্খ্যা একের অধিক, সেস্থলে স্বামীর প্রেম নানা পাত্রে বিভক্ত হয়ে সামান্যতঃ প্রতেকের প্রতি আদরের অল্পতা জন্মায়, এবং পতিও সকলের প্রণয়কে তুল্যরূপে গ্রহণ করিতে অপারগ হয়েন। এই স্থানেই উচিত কর্ম্মের অন্যথা হইতেছে, ইহাতে যদি মনের স্বভাবকে লক্ষ্য করা যায়, তবে অধিবেদন অর্থাৎ বহুবিবাহের অধিকতর ঘৃণিত ফল প্রতীত হইবেক।....

.....অনেক রমণী ঐক্য পূর্ব্বক কদাপি এক স্বামীর প্রেমভাগ গ্রহণ করিতে তৃপ্ত হয়েন না, বরং কোনকালে সপত্নীর মুখাবলোকন না করিয়াও তাহার প্রতি দ্বেষাচরণ করেন। অতএব আলোকের ন্যায় দৃষ্টি করিতেছি, যে যখন পরমেশ্বর এক প্রকার প্রণয় দলের মধ্যে দম্পতির প্রেমকে এরূপ পৃথক করিয়া দিয়াছেন, এবং ঈর্ষা ক্রোধ প্রভৃতি কদর্য্য ফলের সহিত যুক্ত করিয়াছেন, তখন অধিবেদন কদাপিও তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

.....এক স্বামী অনেক স্ত্রীকে সন্তোষ প্রদান করিতে স্বভাবতঃ অশক্ত হয়েন, সুতরাং তাহারাও মনের প্রবৃত্তিকে চালনা করিতে ব্যভিচারের পথকে আশ্রয় করে। শরীরের আলস্য এবং মনের শৈথিল্য অধিক সম্ভোগের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া আন্তরিক পাপ ও বাহ্য দুষ্কর্ম্মকে উন্নত করে, এবং জ্ঞান ও বিবেচনারভার বহন করিতে অপারগ হয়। পূর্ব্বখণ্ডের অর্থাৎ আসিয়ার লোকসকল

বিশেষতঃ ধনিবর্গ এই প্রকার চরিত্রের নিমিত্তে বহুকালাবধি চিহ্নিত আছেন, এবং তত্রস্থ রাজাগণ পুর্ব্বকালে রাজ্যের পরিত্যাগ করিয়াও অন্তঃপুরে কালযাপন করিতেন। ইহা ব্যতীত যে দেশে বহুবিবাহ প্রচলিত হয়, সে দেশীয় স্ত্রীলোক অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায় পতিতা থাকে, যেহেতু তাহারা কেবল অপরাজিত অর্থাৎ পুরুষের ঐন্দ্রিয় সুখের দাসী স্বরূপ হইয়া সময়ক্ষেপ করে, সুতরাং জ্ঞান অভ্যাস প্রভৃতি জীবনের উচিত কার্ম্ম এবং উৎকৃষ্ট আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহে।.....

কোন কোন ব্যক্তি কহেন, "অধিক স্ত্রীর গর্ভে অনেক সন্তান জন্মিতে পারে, অতএব যে কর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীর প্রজা (জনসংখ্যা) বৃদ্ধি হইয়া সৃষ্টি রক্ষা হয়, তা অবশ্যই কর্ত্তব্য" অতি অল্প বিবেচনা করিলেই এ অভিপ্রায়ের ভ্রম প্রত্যক্ষ হইবে, যেহেতু আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে এক (অধিবেত্তা) পুরুষ দশ স্ত্রীর দ্বারা অধিক পুত্রের জনক হইতে পারেন কিন্তু যদিস্যাৎ দশ স্ত্রী দশ ব্যক্তিকে বরণ করে, তবে সর্ব্বসুদ্ধ তদপেক্ষা বহুতর সন্তানের উৎপত্তি হয় কি না? অতএব এস্থলে অভিবেদন লোক বৃদ্ধির সহায়তা না করিয়া বরং তাহার অনিষ্ট ব্যবহার করে।.....

.....(বহুবিবাহ) কুলীন সমাজে দিন দিন যেরূপ যন্ত্রণা ও দুষ্কর্ম বিস্তার করিতেছে তাহার স্মরণ (করা) মাত্রেই অন্তঃকরণ অসহ্য যাতনায় অস্থির হয়। .....(কুলীনদের) জিজ্ঞাসা করিতে আস্না করি, যে কি জন্যে এই কুব্যবহারের প্রবৃত্তিকে পোষণ করিতেছেন? হিন্দুশাস্ত্র যাহাতে তাঁহারা অবশ্যই বিশ্বাস রাখেন, কদাপি এ প্রকার কুরীতির পোষকতা করে না, বরং ইহার দমন নিমিত্তে স্থানে স্থানে বিলক্ষণ শাসন করিয়াছেন। মিতক্ষরার আচারধ্যায়ে অধিবেত্তা পুরুষের প্রতি দন্ড নির্ণয় আছে। যথা,

"আজ্ঞাসম্পাদনীং দক্ষাং বীরসূং প্রিয় বাদিনীং।

তজন্দাপ্য প্তৃ তীয়াংশমদ্রব্যোভরণং স্ত্রিয়াঃ।।"

অর্থাৎ যদিসাৎ কোন ব্যক্তি আজ্ঞাকারিণী নিপুণা পুত্রবতী বা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যাকে কচ্চিৎ ত্যাগ করিয়া অপর বিবাহ করেন তবে এই দুষ্কর্মের দণ্ড স্বরূপ আপন ধনের তৃতীয়াংশ সেই স্ত্রীকে দিবেন, নির্ধন হইলে জীবনাবধি গ্রাসাচ্ছাদন দিতে হইবে। কি আশ্চর্য্য কুলীনাভিমানি দ্বিজবর্গ স্বয়ং শাস্ত্র উপদেশক হইয়াও অনায়াসে তাহার নিয়ম অবজ্ঞা করিতেছেন। ধনের অংশ দূরে থাকুক তাঁহারা জীবনাবধি অনেক স্ত্রীর দুই বার মুখাবলোকন করেন নাই।

অপিচ শাস্ত্রে কথিত আছে যে "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা" অর্থাৎ পুত্রের নিমিত্তে ভার্য্যা গ্রহণ করিবেক, এস্থলে ভার্য্যা এই শব্দের একবচন প্রযুক্ত স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে এক ভার্য্যা অর্থাৎ এক স্ত্রীকেই বিবাহ করিবেক।

হে কুলীন ভাত্রাগণ, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় সন্ধিপূর্ব্বক আপনারদিগের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, তথাচ আপনারা যে কি গুপ্ত মর্ম্মের আস্বাদ বশতঃ এই দুশ্চরিত্রকে পরিবার মধ্যে প্রবল রাখিতেছেন, তাহা অনুভব করা আমারদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর।.....[৪]

এই বিষয়ে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন, "১৭৬৪ শকাব্দে, অর্থাৎ ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে দেখা যায় যে বিদ্যাদর্শন 'অধিবেদন' প্রবন্ধে আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ করার জন্য গবর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করছে। এই আবেদনের গুরুত্ব আছে, কারণ সমাজসংস্কার আরও আগে থেকে আরম্ভ হলেও, আইনের সাহায্যে (by legislation) কুংস্কারগুলি উচ্ছেদ না করলে কোন সংস্কার কর্মই যে আসলে কার্যকর হবে না, এ সত্য আমাদের দেশের প্রথম যুগের সংস্কারকরা বুঝেও বোঝেননি। রামমোহন রায়ও সহমরণ প্রথা উচ্ছেদ করতে হলে সরকারী আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক, এমন কথা প্রকাশ্যে জোর গলায় বলতে পারেননি। তার কারণ ভিন্নধর্মী বিদেশী গবর্ণমেন্ট যদি আইন প্রণয়ন করে হিন্দুসমাজের সংস্কার করেন তাহলে তাঁরা

[৪]তদেব, পৃ. ৫৫৭-৫৬০।

হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ করছেন বলে বিরোধীদের পক্ষে দেশের ধর্মান্ধ জনসাধারণকে উত্তেজিত করা আরও সহজ হবে। এই কারণে সংস্কারকরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপর্বে আইন প্রণয়নের কথা প্রকাশ্যে স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। বিদ্যাদর্শনে (মনে হয় অক্ষয়কুমার) এই প্রসঙ্গটি সমাজসংস্কার প্রসঙ্গে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।[৫]

ইংরেজরা আমাদের শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই আমাদের সমাজের পুরনো সামাজিক কাঠামোকে আঘাত করেনি। যা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। তারা ভারতের পুরনো সামাজিক কু-রীতি, কু-পন্থা, কু-সংস্কারগুলি দূর করার জন্য প্রথমেই সচেষ্ট হয়নি। তাই তারা শাসনের শুরুতেই 'প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন' করে ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক কাঠামোকে আঘাত করতে চাননি। শাসনের পরবর্তী সময়ে অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল।

সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে আইনী হস্তক্ষেপের পক্ষে 'বিদ্যাদর্শন'-এর ৩য় সংখ্যায় (ভাদ্র ১৭৬৪ শক) অক্ষয় দত্ত লিখেছেন, " .....সুশীল রাজারা রাজ্য মধ্যে কুকর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সহ্য করিতে না পারিয়া রাজনিয়মের (আইনের) দ্বারা তাহার উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। .....দেশের কদাচার নষ্ট করা রাজার এক প্রধান উচিত কর্ম্ম, অতএব আমাদিগের গবর্ণমেন্ট সমুদয় প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সম্পূর্ণ রূপে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু এই এক আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে হিন্দুজাতির সহিত শাসন-কর্ত্তাদিগের ধর্ম্ম রীতি এবং অভিপ্রায়াদি বিষয়ে এ প্রকার অনৈক্য দেখিতেছি, যে রাজপুরুষদিগের সর্ব্বদা সাবধান রহিয়া কার্য্য করিতে হয় এবং প্রজাগণের অন্তঃকরণ সুস্থির রাখিয়া কর্ম্ম করা অতিশয় কঠিন বোধ হয়, বিশেষতঃ গবর্ণমেন্ট স্বীকৃত আছেন, যে এদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি বিরোধ আচরণ করিবেন না, অতএব তাঁহারা কিরূপে এই বহুবিবাহের কুনীতিকে রাজদণ্ডের দ্বারা নিবারণ করিতে পারেন।....

[৫]তদেব, পৃ. ৬৪।

.....আমরা যে সকল কারণে গবর্ণমেন্টকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহার বিবরণ লিখিঃ প্রথমতঃ এরূপ অধিবেদনের প্রথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ নহে, কেবল লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে মাত্র, ফলতঃ কদাপি এরূপ সম্ভব হয় না, যে শাস্ত্র এই দুশ্চরিত্রের পোষকতা করিবেন; অতএব দেশধিপতিরা ইহার নিবৃত্তি করিলে কখন দোষি হইবেন না। দ্বিতীয়তঃ এই কুরীতি (-এর জন্য) সংসারের অশেষ পাপ এবং উপদ্রব জন্মাইতেছে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণের যন্ত্রণা এবং ব্যভিচারের কারণ হইয়াছে। অন্যা অন্য কারণ দূরে থাকুক যখন শাস্ত্রে ইহার কোন বিধি (বিধান) নাই, তখন গবর্ণমেন্ট এতৎ কুকর্ম্মের উচ্ছেদ না করিলে অবশ্যই উচিত কর্ম্মের অন্যথা করিবেন, যেহেতু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দুষ্কর্ম্মের দমন করা রাজার এক শ্রেষ্ঠ করিয়া হইয়াছে।”[৬]

বিদ্যাদর্শনের এই রচনার গুরুত্ব সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অপরিসীম। একদিকে বহুবিবাহ বিরোধী সামাজিক আন্দোলনের পরিকল্পনা ও অন্যদিকে তা দূরীকরণে আইন প্রণয়ন এই দুইয়ের পথিকৃৎ ছিলেন বিদ্যাদর্শনের কর্মকর্তারা। তাই মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেছেন, “বহুবিবাহ নিবারণের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন-প্রণয়নের এবং সরকারী হস্তক্ষেপের আবশ্যকতার কথা তাঁরাই (বিদ্যাদর্শনের লেখকরা/প্রকাশকরা) প্রথম প্রচার করেন। বিদ্যাসাগরের সমদর্শী ও অন্যতম সহযোগী অক্ষয়কুমার দত্তই মনে হয় ১৮৪২-এর এই বহুবিবাহ-নিবারণ আন্দোলনের প্রধান পরিকল্পক ছিলেন।”[৭]

কেবলমাত্র নারীদের প্রতি অবিচার-অত্যাচার বন্ধ করার উপায় বলেই বিদ্যাদর্শনের লেখকরা ক্ষান্ত হননি। তাঁরা নারীদের ক্ষমতায়ণের উদ্দেশ্যে ‘নারী শিক্ষা’র উপর জোর দিয়েছেন।

---

[৬]তদেব, পৃ. ৫৬৯।

[৭]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, ২০০৯, পৃ. ৬৩।

শিক্ষা কেন কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য বরাদ্দ থাকবে, এই বিষয়টি তাঁরা মানতে পারেননি। তাই তাঁরা নারী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে জোরাল প্রচার করেছিল পত্রিকায় পাতায়। সেই বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধাংশ এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ১ সংখ্যা আষাঢ় ১৭৬৪ শকে *'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা'* শিরোনামে লেখা হয়,

"এদেশীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণ বিদ্যাধিকারি, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে কি জন্য তাহাতে বঞ্চিত তাহার কোন কারণ প্রত্যক্ষ হয় না।.....

উক্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে, এবং নিঃসন্দেহের সহিত ব্যাখ্যা করণের জন্য এস্থলে এই বক্তব্য, যে দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ, স্মরণ, চিন্তন, ও তুলনাদির বুদ্ধি শক্তি, এবং সুখ, দুঃখ প্রেম ঘৃণা আশা, ক্রোধদি চিত্তবিকার ইত্যাদি সমুদয় বিদ্যার উপযোগি যে মনের কার্য্য তাহা কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয় জাতিতেই এ প্রকার সমান রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছে, যে উভয়ের পক্ষেই সমূহ জ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত এই সংসার মধ্যে কালযাপন করা অসাধ্য।.....

.....যদিও যুক্তি কদাপি ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে, তাথাপি সাধারণের অন্তঃকরণে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে এ বিষয়ে শাস্ত্রের মত জানা আবশ্যক, প্রথমে পূর্ব্বপক্ষগ্রাহিদিগের প্রতি জিজ্ঞাসিতে ইচ্ছা করি, যে স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস নিবারণ সূচক কোন প্রমাণ শাস্ত্রে প্রাপ্য কিনা, বোধ করি সমুদয় শাস্ত্র অন্বেষণ করিলেও তন্নিবারণের পোষকতা পাওয়া যাইবে না, ইহা সকল শাস্ত্র বেত্তারা অবশ্য স্বীকার করিবেন।.....

রমণীগণের জ্ঞানবিরহে দেশের কি অসঙ্খ্য অনিষ্ট ঘটিতেছে, দুষ্কর্ম্ম, কুব্যবহার, এবং নির্লজ্জতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা সভা, পাঠশালা, প্রকাশ্য পত্র সংস্থাপন দ্বারা দেশের সুখ, সভ্যতা, সৎকর্ম্ম, ও জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তে যত্ন করিতেছি, কিন্তু স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রতি অযত্ন সত্ত্বেও সে অভিপ্রায় কদাপি সুসম্পাদ্য নহে। যদিও কখন এদেশীয় সমুদয় পুরুষ বিদ্বান এবং

পুণ্যশীল হয়েন, (যাহা অতি দুঃসাধ্য) তথাপি ভারতবর্ষের সদবস্থার সম্ভাবনা নাই। হাঃ যে দেশের সকল স্ত্রী, অর্থাৎ অর্দ্ধেক লোক মূর্খ, দুষ্কর্ম্মি, এবং অসভ্য সে দেশের যে সুখের আশা, সে স্বপ্নমাত্র আমরা বহিঃস্থ মানুষ্যগণের সহিত নানা প্রকার সদালোচন করিয়া সুখী হইতে পারি, কিন্তু তাৎপরেই গৃহে গিয়া কি মূর্খতা, অসভ্যতার নাট্য দেখিয়া ঘৃণা করিতে হয়।[৮]

অক্ষয় নারীদের শিক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছিলেন, তাই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও আমরা দেখতে পাই তাঁর এই বিষয়ক রচনাগুলি। ৪ সংখ্যা আশ্বিন (১৭৬৪ শক) সংখ্যায় তিনি *'হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সম্বাদ'* শিরোনামে লিখেছেন, ".....আমরা পৃথিবীর মধ্যে যে সকল বিষয়কে আনন্দ প্রদানকারী বলে জানি হিন্দু নারীদের বিদ্যাভ্যাস, এবং সভ্যতার শিক্ষা তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে পরিচিত আছে। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হবেন এই খবরটি আমাদের কানে খুবই মিষ্টভাবে আসে, এবং এর ছবিতে মন আনন্দ সাগরে ভেসে বেড়ায়। আমরা আশঙ্কাহীনভাবে বলতে পারি, হিন্দু স্ত্রীদের অশিক্ষা অবস্থায় (অজ্ঞানাবস্থায়) হিন্দু জাতির সভ্য সংজ্ঞা কখনও হতে পারে না।.....

তিনি আরও লিখেছেন- "যাঁরা মনে করেন এদেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা প্রদান করা হোক, স্ত্রীজাতিরা বিভিন্ন (শিক্ষা গ্রহণকারী) স্থানে গিয়ে সভ্যতা শিখুক, সভ্য দেশীয় নারীদের মত সম্মান প্রাপ্তা হন, তাঁরা এই খবরে সন্তুষ্ট হবেন, স্ত্রীলোকদের শিক্ষা লাভের পরিষ্কার হচ্ছে আমরা গভীর আশায় বলছি ঐ সকল মহাশয়েরা খুব শীঘ্রই দেখবেন, কলিকাতা রাজধানীর মধ্যে এক (শিক্ষা) মন্দির হয়েছে এবং এই দেশের শিক্ষকরা সেখানে গিয়ে নারীদের শিক্ষাদান করছেন। যাঁরা শিক্ষিকা হবেন, তাঁরা ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষায় সুশিক্ষিতা।.....

[৮]বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৬ ও ৫৭৮।

.....এই দেশের স্ত্রীলোকদের চোখের কেবলমাত্র আকৃতি ছিল, চক্ষু দান হয়নি এবং তাদের মন ভস্মাচ্ছন্ন আগুনের মত থাকত তাঁরা এতদিন ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ফুলের পাত্রে পূজার উপকরণ সাজাতে পারতেন, এবং রান্না ঘরের কর্ত্রী হয়ে বেড়ীটানা শিক্ষায় সুশিক্ষিতা ছিলেন। এখন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীরা পরিবার-সংসারের সব কাজ ভালভাবে জানতে পারবেন, এতে তাঁদের সৌভাগ্য বাড়বে, দিন-রাত্রি হাতে বই থাকবে, নির্জন স্থানে একা বসে (বইয়ের) আনন্দ গ্রহণ করতে পারবেন, এবং রাত্রিতে স্বামীর সাথে কথোপকথনের জন্য দাসী প্রভৃতি স্ত্রীদের কাছে যে উপন্যাস শিখতে হত আর তা করতে হবে না। স্ত্রী-পুরুষ নিরালায় বসে বই নিয়ে আনন্দ করতে পারবেন। এছাড়া আর এক সুখের বিষয় এই যে স্ত্রীলোকেরা বসে বসে বাজেবাজে বিষয়গুলি ভাবতে পারবেন না। জ্ঞানোদয় হলে শিক্ষার গুণে মনকে আকর্ষণ করে রাখবে, তাতে কুকর্মগুলিকে অবশ্যই ঘৃণা করবেন, অতএব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এই বিষয়টি দ্রুত যেন সুসিদ্ধ হয়।"

কীভাবে এই শিক্ষার বিষয়টি সুসিদ্ধ হতে পারে? তার উত্তরে তিনি লিখেছেন, প্রথমতঃ অল্পবয়সে বালিকাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে হবে, এবং ৯-১০ বছর বয়স্ক না হলে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে পারবেন না, এইভাবে আস্তে আস্তে জ্ঞানের স্বাদ অনেকেই পাবেন, এবং এক পরিবারের মধ্যে দুই-একজন নারী শিক্ষিতা হলে তার পরিবারের অন্যান্য নারীরাও (শিক্ষা গ্রহণের জন্য চেষ্টা করতে পারেন, অর্থাৎ সুশিক্ষিতা ভগ্নী বা ননদাদির কাছে তাঁরাও পড়তে আরম্ভ করবেন, ...[৯]

এছাড়া তিনি আরও লিখেছেন (*'বঙ্গদেশের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব'*, কার্ত্তিক ১৭৬৪ শক), ".....শিক্ষার বিষয়ে দেশীয় ব্যক্তিরা খুবই আগ্রহী, এবং তার উন্নতির জন্য তাঁরাও সাহায্য

[৯]তদেব, পৃ. ৫৭৯ ও ৫৮০। (গবেষক দ্বারা কেবলমাত্র সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় পরিবর্তন করা হয়েছে।)

করে থাকেন; অতএব দেশীয় লোকের সাথে যুক্ত হয়ে যদি গভর্নমেন্ট এদেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হন, তবে খুব সহজেই আমারা আশাতীত বিষয়ে সফল হতে পারব এতে আমরা আশাবাদী.....

.....এটি সকলেই স্বীকার করেন, যে শুধু গভর্নমেন্টের দ্বারা বাংলাদেশের মত দীর্ঘ রাজ্যের সকল ব্যক্তির শিক্ষালাভ দুষ্কর। যে পর্যন্ত সাধারণ জনগণ ঐক্যবদ্ধ হবেন, ততদিন সকল রাজ্যগুলিতে কখনই শিক্ষার আলো পৌঁছতে পারবে না, অতএব দেশের জনগণের প্রথমে উৎসাহী হওয়া উচিত, তারপরে গভর্নমেন্টও তাতে সাহায্য করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, এবং সব শেষে শাসক-শাসিত উভয় পক্ষের পরস্পর সাহায্যের মাধ্যমে সমাজের মধ্যেও শিক্ষার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে।.....

.....আমরা মনে করি, নিম্নোক্ত উপায় দ্বারা এই বিষয়ের সুফল দেখা যেতে পারবে, অর্থাৎ যে যে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং সেই গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে উপযুক্ত কয়েকজনকে অধ্যক্ষ (প্রধান) পদে ঐ বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা যায়। যাঁরা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ের সব কাজ সম্পন্ন করবেন এবং বিদ্যালয়ের সকল বিবরণ এডুকেশন কাউন্সিলে প্রেরণ করবেন।

আমাদের এই ইচ্ছায় যদি দেশের বিদ্বানরা সন্মত হন, তবে আমরাও তাঁদের প্রতিনিধি রূপে কাজ করতে স্বীকৃত আছি অর্থাৎ ঐ সকল আসন্ন বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা আমাদের দায়িত্ব মনে করব। এখন এই বিষয়ের সূচনার জন্য আমরা অন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করছি। প্রথমতঃ এক প্রকাশ্য স্থানে পল্লিগ্রামের ধনী এবং বিদ্বান লোকেরা একত্রে মিলিত হন, এবং ঐ স্থান রাজধানী কলকাতা হলে সবথেকে ভাল হয়, অতএব আমরা অনুরোধ করছি, দয়ালু ব্যক্তিরা দ্রুত উদ্যোগী হয়ে রাজধানীর মধ্যে স্থান ও দিন ঠিক করে প্রকাশ্যে বিজ্ঞপ্তি পেশ করুন এই

বিষয়ের বিবেচনার জন্য ঐ সভা হবে। এখন দেশহিতৈষী জনগণের কাছে আমাদের এই নিবেদন, যে তাঁরা একবার এই মহৎ ব্যাপারে অগ্রসর হোন।[১০]

'স্ত্রীলোকদের বিদ্যাভ্যাস'-এ (অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শক) তিনি বলেছেন, ".....এখন হিন্দু স্ত্রীদের যেরকম কুলধর্ম এবং জাতি রক্ষার যেরকম কঠিন নিয়ম দেখা যাচ্ছে, তাতে স্ত্রী শিক্ষা সহজে হওয়া কঠিন। এই উদ্যোগ সম্পন্ন করা সেরকম কঠিন মনে হত না, যদি ইউরোপের স্ত্রীলোকদের মত এদেশের নারীদের স্বভাবে ভয় ও লজ্জা প্রভৃতি কম থাকত। সুতরাং ঐ সব বাধা সমাধান করা সামান্য কাজ নয়; অতএব এই বিষয়ে জনগণকে আমরা এক প্রস্তাব পেশ করেছি। তা সঠিক মনে করে যদি অন্যান্য (পত্রিকা) সম্পাদকরা প্রচারে এগিয়ে আসেন, তবে অনুমান করছি, সাধারণ জনগণেরও উৎসাহ বাড়তে পারে। কিছু দিন হল, ইংল্যান্ডের কোন প্রকাশ্য সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল যে ভারতবর্ষের স্ত্রীদের সহযোগিতার জন্য তাদের কোন সাহায্য কার্যকরী হতে পারে কি না, তাতে সেই সভার অধিকাংশ সদস্যই বলেছিলেন যে "হিন্দু স্ত্রীদের শিক্ষার জন্য তাদের সাহায্য করা ব্যর্থ পরিশ্রম হবে, হিন্দুদের মনোযোগ ছাড়া সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে; অতএব এদেশীয় জনগণের দয়া ছাড়া এদেশের নারীরা শিক্ষার মতন পরম শক্তি পাবেন না।"[১১]

"বিদেশীয় দয়াশীললোকের এবম্প্রকার উক্তিতে অবশ্যই খেদ করিতে হয় যে, কেবল মনোযোগের অভাবই হিন্দুরমণীরা বহুকাল পর্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টিবিহীনা রহিয়াছেন। এইক্ষণে যদিও অল্প সঙ্খ্যক ব্যক্তিরা স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ের পোষকতা করিয়া থাকেন বটে, তথাচ কেহই তাহার পত্তনের প্রতি দৃষ্টি করেন না।

---

[১০]তদেব, পৃ. ৫৮৩। (ঐ)

[১১]তদেব, পৃ. ৫৮৪ ও ৫৮৫। (ঐ)

আমরা সকল উপায়াপেক্ষা এই বিষয়ের জন্য একতার প্রতিই অধিক নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রীবিদ্যার উন্নতিকল্পে দেশহিতৈষি জনসমূহের যুক্ত সাহায্য ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না; অতএব আমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি, দয়াশীল মহাশয়েরা ঐক্যবাক্যে একত্র হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করুন, এবং দৃঢ়রূপে তৎসমাজের কার্য বিষয়ে মনোযোগী হউন। এইস্থলে এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, যে, এদেশের স্ত্রীলোক সকল যেরূপ লজ্জাবতী তাহাতে বালকগণের ন্যায় পুরুষ শিক্ষক দ্বারা তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা কোনমতেই নির্বাহ হইতে পারে না, অতএব অগ্রে শিক্ষাদাত্রীর অন্বেষণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

.....তিনি (ভাস্কর সম্পাদক) স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "আমরা গূঢ় সমাচার বলিতেছি, দেশীয় মহাশয়েরা অতি শীঘ্র দেখিতে পাইবেন, রাজধানীর মধ্যে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহাতের এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক সকল বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন।"

এই বিষয়ের আর এক খুব শুভ সূচক লিখিয়াছেন; যাঁহারা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার অনুকূল তাঁহারা এতদ্দর্শনে অতি আহ্লাদিত হইবেন। এক দিবস ডফ সাহেবের (আলেকজান্ডার ডাফ্) স্ত্রীর আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়া কথোপথন ক্রমে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি দৃঢ়রূপে স্বীকার করিয়াছেন যে, যদি ভদ্রবংশের স্ত্রীগণ বিদ্যাভ্যাস করিতে অভিলাষ করেন, তবে তিনি স্বয়ং পরিশ্রম গ্রহণপূর্বক তাহাদিগের শিক্ষা প্রদান করিবেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, অন্য অন্য অনেক ইংরেজ রমণী এরূপ দয়াবতী আছেন যে, তাঁহারা বিনা বেতনে হিন্দু স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দান করিবেন। দোহাই বঙ্গশের ধনীবর্গ, আপনারা এই বিষয়ে উৎসাহি হউন।[১২]

[১২]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পা.), *শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, পৃ. ৬৪ ও ৬৫।

খ. খ) বিদ্যাদর্শনের মূল্যায়ন-

বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় তৎকালীন বাংলার নারীদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা—নারী শিক্ষা, বহুবিবাহ, কুলীন প্রথা ইত্যাদি ইস্যুগুলি নিয়ে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন অন্যান্য সমাজ সংস্কারক বা প্রাবন্ধিকদের পূর্বেই। আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, নিশ্চয় তৎকালীন সময়ের এই রচনাগুলি প্রাচীন হিন্দু সমাজকে ধাক্কা দিয়েছিল।

বিদ্যাদর্শন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও ধারণা করা যায়, আর্থিক অনটনই তার প্রধান কারণ। কেননা দেখা যায়, যে-শকাব্দে বিদ্যাদর্শন প্রকাশ শুরু হয়, তার শেষান্তে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার চাকরিটিও তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। তাঁর চাকরিটি খুবই স্বল্প বেতনের হলেও তাতে কিছুটা নির্ভরতা ছিল। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, পত্রিকার অপর সহযোগী প্রসন্নকুমার ঘোষ পত্রিকা প্রকাশে অমনোযোগী হয়ে পড়েন অথবা আর্থিকভাবে আনুকূল্য করতে অসমর্থ হন।[১৩]

আমরা এই পত্রিকা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাই, সেগুলি নিম্নরূপ- "অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করে সেই প্রথম বাংলা ভাষায় রামমোহন-চর্চার সূত্রপাত করেন।"[১৪] এর বিশদ কর্মকাণ্ড আমরা দেখতে পাব পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (প্রকাশকাল ১৮৪৩ সাল) পাতায়, যা পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে।

মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যাদর্শন পত্রিকা সম্পর্কে বলেছেন, "যাহা পাঠ করিলে ভ্রম ও কুসংস্কার তিরোহিত হইয়া জ্ঞানোদ্রেক হইতে থাকে, উহাতে এবম্ভূত সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রীতিপ্রদ বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ ও নীতিপূর্ণ প্রবন্ধসকল প্রকটিত হইত। আক্ষেপের বিষয় উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী

[১৩]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, পৃ. ৬১।
[১৪]তদেব, পৃ. ৭০।

হয় নাই। কিন্তু সর্ব্ব শুদ্ধ যে ৬ মাস ছিল, তাহাতে অতি পরিপাটী নিয়মেই উহার দ্বারা বিস্তর কার্য্য হইয়াছিল।"[১৫] এই পত্রিকা সম্পর্কে বিনয় ঘোষের বক্তব্যঃ 'বিদ্যাদর্শন মাত্র ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র ছয় মাসের জন্য প্রকাশিত হলেও অক্ষয়কুমার দত্তের প্রত্যক্ষ সংযোগের জন্য সামাজিক বিষয়বস্তুর আলোচনার দিক থেকে পত্রিকাখানির বিশেষ গুরুত্ব আছে।'[১৬]

(গ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়ে আলোচনার পূর্বে সেই পত্রিকা প্রকাশকদের মানসিক অবস্থা, চিন্তা-চেতনা-লক্ষ্য আমাদের জেনে রাখা উচিত। ৬ই অক্টোবর ১৮৩৯ (২১শে আশ্বিন ১৭৬১ শক) তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকো বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল *'তত্ত্বরঞ্জনীসভা'*।[১৭] ১৮৩৯ সালে যখন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করার প্রবল আগ্রহ দেবেন্দ্রনাথের মনকে আচ্ছন্ন করে, তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ হননি; এই কারণে, তখন তিনি নিজের ইচ্ছার উপযোগী নতুন একটি সভা প্রতিষ্ঠা করে নেন, যা হল তত্ত্ববোধিনী সভা।

দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন এইরকম: "এর উদ্দেশ্য আমাদের সব শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।"[১৮] দশ জন সদস্য নিয়ে এই সভা শুরু হয়। তত্ত্ববোধিনী সভা অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা

---

[১৫]তদেব, পৃ. ৬০।

[১৬]ঐ।

[১৭]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), পৃ. ৪৩৯।

[১৮]তদেব, পৃ. ৪৪০ ও ৪৪১।

লাভ করল, ১৭৬২ শকে (১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দ) এবং পরবর্তী তিন বছরে এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৫, ১১৫, ৮৩ ও ১৩৮। ষষ্ঠ বছর থেকে এর সদস্য সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে কয়েক বছরের মধ্যে ৮০০ পর্যন্ত হয়েছিল।[১৯] .....ক্রমে....শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর.....প্রভৃতি দেশের অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা তার সদস্য হন।[২০]

ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা কেন এত জনপ্রিয় হয়েছিল, তার আলোচনা প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লেখেন: "তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম এদেশীয় লোকের সামাজিক দোষ দূর করার প্রতিবন্ধক নয়- অথচ এটিই সনাতন হিন্দুধর্ম বলে প্রচারিত হয়ে থাকে। এরকম জায়গায় ঐ ধর্মপ্রণালী বৈদেশিক শিক্ষায় প্রাচীন ব্যবস্থাগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন যুবকদের যে মনোরম হবে তা বিস্ময়ের বিষয় কি?"[২১]

তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে একটি পত্রিকা (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা) প্রকাশ করার প্রস্তাব হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *আত্মজীবনী*তে লিখেছেন, ...*আমি ভাবলাম তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সদস্য কার্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁরা সভার কোন খবর পান না, অনেক সময় উপস্থিত হতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তা অবগত নয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যা অনেকেই শুনতে পান না; তাঁর প্রচার হওয়া দরকার। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যেসব বই রচনা করেন, তারও প্রচার দরকার। এছাড়া, যেসব বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র পরিবর্তনের (শোধনের) সহায়তা করতে পারে, এমন সব বিষয়ও প্রকাশ হওয়া দরকার।*

---

[১৯]তদেব, পৃ. ৪৪১।

[২০]তদেব, পৃ. ২৯৭।

[২১]তদেব, পৃ. ৪৪১।

আমি এরকম চিন্তা করে ১৭৬৫ শকে (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্র মাসে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।[২২]

পত্রিকার প্রকাশক, কি প্রকাশিত হবে এবং কারা পাঠক হবেন সেই বিষয়গুলি তো মোটামুটি ঠিকই ছিল। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদক, লেখকবৃন্দ ঠিক করার প্রয়োজন ছিল। প্রকাশকের দায়িত্ব তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে দেবেন্দ্রনাথ নিজেই নিয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ রায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছাপিবার জন্য একটী (একটি) মুদ্রাযন্ত্র (ছাপার যন্ত্র) দিয়াছিলেন। সেই যন্ত্রেই তত্ত্ববোধিনী ছাপা হইত।[২৩] ছাপাখানা (যন্ত্রালয়) হেদুয়ার দক্ষিণ দিকে ছিল।

কোন ব্যক্তিকে পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া যায়? এই গুরুতর বিষয়টি সভার বিবেচ্য হলে অবশেষে ঠিক হয় যে, পদ প্রার্থীরা *"বেদান্ত ধর্ম্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্ম্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ"* এই বিষয়টি অবলম্বন করে একটি প্রবন্ধ লিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঠাবেন। যাঁর প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট হবে তিনিই সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হবেন। (ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার প্রমুখ ব্যক্তিদের মধ্যে এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়।) অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পত্রিকা সম্পাদক মনোনীত করেন।[২৪] অক্ষয়ের এই রচনাতে গুণ ও দোষ (সীমাবদ্ধতা) দুই-ই দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন—গুণের কথা এই যে, তাঁর রচনা খুব হৃদয়গ্রাহী ও মধুর; আর দোষ (সীমাবদ্ধতা) এই যে, এতে তিনি জটা-জূট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃ-সন্ন্যাস দেবেন্দ্রনাথের মত

[২২]তদেব, পৃ. ৩৫ ও ৩৬।

[২৩]নকুড়, পৃ. ১৯।

[২৪]নকুড়, পৃ. ১৮।

বিরুদ্ধ। তিনি মনে করেন, যদি মতামতের জন্য তিনি সতর্ক থাকেন, তাহলে অক্ষয়কুমার এর দ্বারা অবশ্যই তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করাতে পারবেন।[২৫]

১৮৪৩ সালের অগাস্ট (১৭৬৩ শকের ভাদ্র) মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা একদিনেই দেশের জনগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে নেয়।[২৬] এর পুরো কৃতিত্বই ছিল অক্ষয় দত্তের। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে। বেদ বেদান্ত ও পরমব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।[২৭] এই পত্রিকার দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার ও তার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের নাম চারদিকে আরও ছড়িয়ে পড়ল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের সময় থেকেই "....পত্রিকার সংশ্রব তাঁহার সর্ব্ববিধ উন্নতির কারণ হয়। ইহার দ্বারা তাঁহার আয় বৃদ্ধি হইল, এবং জ্ঞান উপার্জ্জনের দ্বার উন্মুক্ত হইল।'[২৮] অক্ষয় বলেছেন, "আমাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্য্যে নিযুক্ত করিবার মূল কারণ দেবেন্দ্র বাবু। তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত না করিলে, আমি কখন অভিলষিত (মনমত) কার্য্য করিবার পথ প্রাপ্ত হইতাম কি না জানি না। এ জন্য তাঁহার নিকটে আমার তন্নিবন্ধন কৃতজ্ঞতা কখন মন হইতে অপনীত হইবার নয়।"[২৯]

---

[২৫]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, পৃ. ৩৬।

[২৬]তদেব, পৃ. ৩০৩।

[২৭]তদেব, পৃ. ৩৭।

[২৮]তদেব, পৃ. ৩০৮ ও ৩০৯।

[২৯]মহেন্দ্রনাথ রায়, *বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত*, পৃ. ২৩৯-২৪০।

ঈশ্বর জ্ঞান প্রচার এই পত্রিকার উদ্দেশ্য থাকলেও অক্ষয় দত্তের চেষ্টায় এতে ধর্মীয় বিষয় ছাড়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি উৎকৃষ্ট বিষয়গুলিও প্রকাশিত (আলোচিত) হত। বাঙ্গালা ভাষার যে ওজস্বী, গম্ভীর রচনা হইতে পারে এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি প্রভৃতি যে কোন বিষয়ই যে, ইংরাজী ভাষার ন্যায়, বাঙ্গালা ভাষাতেও আলোচিত হইতে পারে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তখন তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিপাদন করিয়াছিল।[৩০]

অক্ষয় দত্ত "তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করাতে, যে মানুষ যে কাজের উপযোগী, যেন তাঁর হাতে সেই কাজই এল। তিনি পদোন্নতি ও অর্থ আয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করে নিজের ও দেশীয় মানুষদের জ্ঞানোন্নতির জন্য দেহ-মন নিয়োগ করলেন। তত্ত্ববোধিনী বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়ে দাঁড়াল। তার আগে বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত দেশীয় সংবাদপত্রগুলির অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য জগতে কি পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, তা স্মরণ করলে, তাঁকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলে থাকা যায় না। .....ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লেখা পত্রিকাগুলিতেও [তখন] এমন-সব ব্রীড়াজনক বিষয় প্রকাশিত হত, যা ভদ্রলোকেরা (অন্য) ভদ্রলোকদের সামনে পড়তে পারতেন না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিও-এর শিষ্যরা ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করত না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন প্রকাশিত হল, তখন তাঁরা আনন্দিত হয়ে উঠল।"[৩১]

"অক্ষয়বাবু যে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গদ্য রচনার রীতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই তাহা সম্যক্ প্রকাশিত হয়। দেশের হিতকর, সমাজের সংশোধক, বস্তুতত্ত্বের নির্ণায়ক কত কত জ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ যে, তৎকালে ঐ পত্রিকায় প্রকটিত (প্রকাশিত) হইয়াছিল, তাহার

---

[৩০]যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত*, ১৯৭৮, পৃ. ১৪৯।

[৩১]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯। (গবেষক দ্বারা কেবলমাত্র সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় পরিবর্তন করা হয়েছে।)

সংখ্যা নাই। 'চারুপাঠ', 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তক সকলের অধিকাংশই সর্ব্বপ্রথমে ঐ পত্রেই প্রচারিত হয়। তাঁহার ঐ সকল রচনা পাঠ করিবার জন্য গ্রাহকেরা ব্যগ্রভাবে পত্রিকা প্রকাশের দিনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং অনেকে তাঁহার উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া আপন আপন আচার ব্যবহারের সংশোধন করিয়াছিলেন।"[৩২]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১ সাল) লিখেছেন, "তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে তত্ত্ববোধের জন্য তত্ত্ববোধিনী মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬ খ্রিঃ) এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করে নিজেকে চিরস্মরণীয় করেছেন ও দেশের বহু মঙ্গল করেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তখন এখনকার মত একটি মাত্র সভার কাগজ হয়নি, তা তখন সমস্ত বাংলায় ইউরোপীয় ভাব প্রচারের মিশনারি (মাধ্যম) ছিল, তা ভারতবর্ষীয় ধর্মগুলি সম্বন্ধে কত যে নতুন আবিষ্কার করেছে, তা যাঁরা তত্ত্ববোধিনীর আদ্যোপান্ত পড়েছেন, তাঁরাই বলতে পারবেন।"[৩৩]

পত্রিকাতে ইউরোপীয় ভাব প্রচার শুধু নয়, বর্ণনাও ছিল। ইউরোপীয় ভাবধারা যুবক, সাধারণ মানুষ প্রত্যেকের মধ্যে প্রবাহিত হল। এবং এভাবে দেশীয় মানুষরা এক ভিন্ন স্বাদের আস্বাদন পেল। কিন্তু এই প্রভাব, তখন বেশিরভাগ মানুষরা বুঝেই উঠতে পারেননি। যখন অক্ষয়ের রচনাগুলি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এল তখন তিনি মৃত। এটাই বোধহয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনার জন্য দেবেন্দ্রনাথ এশিয়াটিক সোসাইটির অনুকরণে *পেপার কমিটি* (Paper Committee) নামে একটি প্রবন্ধ নির্বাচনী সভা স্থাপন করেন। কমিটিতে

---

[৩২]রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), পৃ. ২৫১। (ঐ)
[৩৩]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, পৃ. ৮৩। (ঐ)

পাঁচ (৫) জন সদস্য (এরা গ্রন্থাধ্যক্ষ নামে পরিচিত) ছিলেন; অন্যান্য সভা-সমিতির যেরকম নিয়ম এরও সেরকম ছিল—একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করলে অন্য একজন মনোনীত হয়ে তাঁর স্থান পূর্ণ করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিদ্বান মানুষরা এই কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৭৬৮ শক থেকে ১৭৭৪ শক পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক বিবরণের মধ্যে গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভার এই সকল গুণী, জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়।[৩৪]

সভার নিয়ম এই ছিল যে, কি গ্রন্থ-সম্পাদক (পত্রিকা সম্পাদক), কি-গ্রন্থাধ্যক্ষ, কি অন্য কোনও ব্যক্তি যদি পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য কোন প্রবন্ধ লেখেন, প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক আগে তা মনোনীত ও আবশ্যক হলে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে তবে পত্রিকায় প্রকাশিত হত। এদের মধ্যে যে কোন ৫ জনের মত নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।[৩৫]

অক্ষয় বাবুর প্রস্তাবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যান্য সভ্যগণের সমর্থনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত "পেপার কমিটীর" অন্যতম সদস্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন (১৮৪৮ সালের অগাস্ট মাসে)। .....ব্রাহ্ম সমাজের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না। "পেপার কমিটী" বা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল, কেবল সাহিত্যের সংস্রবে, ধর্ম্মের টানে নহে।[৩৬]

---

[৩৪]তদেব, পৃ. ৭৩।

[৩৫]তদেব, পৃ. ৭২।

[৩৬]বিহারিলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, ১৯২২, পৃ. ১২৫।

মহেন্দ্রনাথ রায় এই 'গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা' সম্পর্কে লিখেছেন, "কিছু দিন তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা নামে একটি সভা ছিল। ঐ সভার সদস্যদের নাম গ্রন্থাধ্যক্ষ এবং অক্ষয় বাবুর উপাধি গ্রন্থ-সম্পাদক ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে যেকোন বই বা প্রবন্ধ ছাপা হবে, তা গ্রন্থাধ্যক্ষদের সম্মতি নিয়ে ছাপাতে হবে এরকম নিয়ম ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা দেবেন্দ্র বাবুর স্নেহের পাত্রী। তিনি অন্যত্র কোন সদ্ব্যবস্থা দেখলে তা ঐ সভাতেও প্রবর্তিত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। তিনি এশিয়াটিক-সোসাইটির পেপার কমিটি দেখে তত্ত্ববোধিনী সভাতেও সেইরকম গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা প্রবর্তিত করেন। এতে উপকার দেখা গিয়েছিল। অবিশুদ্ধ ভাষায় লেখা বা অন্যরকম ত্রুটিযুক্ত কোন প্রবন্ধ বা বই ছাপা হতে পারত না। এমন কি, গ্রন্থাধ্যক্ষদের লেখা প্রবন্ধও কখন কখন অধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থ-সম্পাদকের একটি বাক্যও কখন বাদ যায় নি।....."[৩৭]

এই সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এই পেপার কমিটির কাজে দেবেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরেছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী থেকে পাই, "একবার রাজনারায়ণ বাবু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটা বক্তৃতা পাঠ করেন। সেই বক্তৃতা তাঁর (দেবেন্দ্রনাথের) অত্যন্ত ভাল লেগেছিল; কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা সেটা পত্রিকায় প্রকাশের যোগ্য বলে মনে করেনি।

(যা শুনে) দেবেন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে লিখেছেন (২৬শে ফাল্গুন ১৭৭৫ শক),- "এই বক্তৃতা আমার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরাই তৃপ্ত হয়েছেন; কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা একে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশের যোগ্য মনে করলেন না। কতগুলি

[৩৭]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪। (গবেষক দ্বারা কেবলমাত্র সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় পরিবর্তন করা হয়েছে।)

নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হয়েছে, এদেরকে এই পদ থেকে তাড়িয়ে না দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নেই।"[৩৮]

এই নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ বলতে দেবেন্দ্রনাথ আসলে অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগরকে বুঝিয়েছিলেন। এঁদের সাথে দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ বাড়তেই থাকে (অক্ষয়ের সাথে দেবেন্দ্রনাথের মতবিরোধ পরের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। এছাড়া ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার আপেক্ষিক মূল্য বিষয়ে মতভেদের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার সাথে, এবং পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচন প্রভৃতি নিয়ে তৎকালীন 'গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা'র সাথে, সময়ে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ হতে থাকত।[৩৯]

দেবেন্দ্রনাথ লিখছেন, তিনি (অক্ষয় দত্ত) যা লিখতেন, তাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কেটে দিতাম[৪০] এবং আমার মতে তাঁকে আনার চেষ্টা করতাম; কিন্তু তা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজছি, ঈশ্বরের সাথে আমার কি সম্বন্ধ; আর, তিনি খুঁজছেন, বাহ্য বস্তুর সাথে মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ;- আকাশ পাতাল প্রভেদ![৪১] এই ছিল অক্ষয়ের চিন্তা-চেতনা, যা আমরা নির্দ্বিধায় বস্তুবাদী বলতে পারি।

অক্ষয় দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক ও পেপার কমিটির গ্রন্থ-সম্পাদক ছিলেন। সভার কার্যাধিক্যর জন্য ১৭৬৮ শকের ১১ই পৌষ তারিখে সভার বিশেষ অধিবেশনে তিনি, "সভার কাজ অত্যন্ত বাহুল্য হওয়াতে সহকারী সম্পাদকের যেসব কাজ আছে তা এখন আমার দ্বারা উপযুক্ত ভাবে সম্পন্ন হওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে, কেবলমাত্র পত্রিকার কাজ করার

---

[৩৮]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১ ও ৪১২।

[৩৯]তদেব, পৃ. ৩০৮।

[৪০]'এক এক দিন অক্ষয় বাবুর লেখা প্রস্তাবগুলি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করার আগে তা সংশোধন করতে করতে তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) গলদঘর্ম হতেন।' -রাজনারায়ণ বসু।

[৪১]তদেব, পৃ. ৩৭।

জন্য সব সময় শেষ হয়ে যায়। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে সভার সব বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের জন্য আমার পরিবর্তে অন্য একজন সহকারী সম্পাদককে নিযুক্ত করা হোক" এই প্রস্তাব করলে এবং সদস্যরা তাতে সম্মত হলে, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় অবৈতনিক সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন; অক্ষয় তখন থেকে কেবলমাত্র পত্রিকার দায়িত্ব নিয়েই থাকেন। এই সময় তাঁর বেতন বৃদ্ধি (প্রথমে ৪৫ টাকা, তারপর ৬০ টাকা) হয়।

দেবেন্দ্রনাথের কথায়, 'তিনি বেশি (অধিক) বেতন দিয়ে অক্ষয় বাবুকে সম্পাদকের কাজে নিযুক্ত করেন।'[৪২] ১৮৪৩ সালে যখন অক্ষয় দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন, তখন তাঁর মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৩০ টাকা। যা কাজের নিরিখে "বেশি বেতন" ছিল না। এই বেতনের ব্যাপারে একজন গবেষক বলেছেনঃ "পত্রিকা সম্পাদনার কাজে সেদিন অক্ষয়কুমারের জন্য বেতন ধার্য হয়েছিল মাসে তিরিশ টাকা। ক্রমে এই বেতন বৃদ্ধি পেয়ে পঁয়তাল্লিশ (৪৫ টাকা) হয়ে শেষে ষাটে (৬০ টাকা) পৌঁছয়। এই সময়ের অন্য একটি পত্রিকা সম্পাদকের বেতনের সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য অক্ষয় দত্তের মাসিক এই অর্থ-প্রাপ্তিকে (বেতনকে) খুব 'বেশি বেতন' বলতে পারি না। ১৮৫১ সালে কলকাতার ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি থেকে মাসিক 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সম্পাদক করে। এজন্য ঐ কমিটির কাছ থেকে রাজেন্দ্রলাল মাসে আশি টাকা (বেতন) পেতেন।"[৪৩]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেনঃ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি (অক্ষয় দত্ত) মাসিক ষাট (৬০) টাকা বেতনে তার সম্পাদকতায় নিযুক্ত হন (আমরা দেখেছি প্রথমে তাঁর বেতন ছিল ৩০ টাকা, তারপর ৪৫ টাকা, শেষে ৬০ টাকা। সুতরাং প্রথমেই তাঁর বেতন ৬০ টাকা ছিল না।)। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে এত স্নেহের চোখে দেখতেন যে পরে তিনি পত্রিকার কারণে

---

[৪২]তদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

[৪৩]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, পৃ. ৭১।

দেড়শ (১৫০) টাকা বেতনের পদও (শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর) গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। [.....] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করে অক্ষয়বাবুর আয় কিছুই বেশি হত না। কিন্তু তিনি তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে কার্যান্তর পরিহারপূর্বক প্রতিনিয়তই এর উন্নতির চেষ্টা করতেন। ঐ চেষ্টা সফল করতে তিনি নিজে নানারকম ইংরেজি বই পড়তেন, ফরাসি ভাষা শেখেন এবং মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে দুই বছর ধরে রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাস করেন।"[৪৪]

দারিদ্র্য ছিল তাঁর জীবনের ছায়াসঙ্গী। অথচ বেশি উপার্জনের হাতছানি, সুযোগ বা প্রলোভন তাঁর জীবনে এলেও তিনি সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যখন তিনি মাসিক মাত্র ৪৫ টাকা বেতন পান, তখন বাংলার সরকার শিক্ষা বিভাগের জন্য কিছু ডেপুটি ইন্সপেক্টর-এর পদ সৃষ্টি করে, তখন সেই পদের বেতন ছিল মাসিক ১৫০ টাকা। বিদ্যাসাগর তাঁকে এই পদে যোগ দিতে অনুরোধ করেন এবং সরকারকে বলে এই চাকরি যাতে তাঁর হয় তা দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দেন। অক্ষয় এতে রাজি হননি, সেই চাকরি গ্রহণ করেননি। আসলে আর্থিক স্বচ্ছলতার চেয়েও তাঁর কাছে সেই মুহূর্তে অনেক বড় হয়ে উঠেছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে সমকালে জ্ঞানের মশাল জ্বালানো ও জ্ঞান-বুদ্ধির চর্চা করা।

গ. ক) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কি প্রকাশিত হত?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভাদ্র ১৭৬৫ শক বা অগাস্ট ১৮৪৩ খ্রিঃ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। অক্ষয়কুমার দত্ত যতদিন (১৭৭৭ শক বা ১৮৫৫ খ্রিঃ) পর্যন্ত এই পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন ততদিন পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রতি মাসের শুরুতেই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

[৪৪]তদেব, পৃ. ৭২।

কী বেশ ধারণ করে এই পত্রিকা প্রকাশিত হত, সে সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "একমেবাদ্বিতীয়ং' বাক্যটি শিরোনাম করে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আবির্ভাব হয়। কিন্তু এই বাক্যটি ছাড়া আর কোন বচন প্রথম দিকে পত্রিকাকন্ঠে শোভা পেত না। পরে দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, তখন পত্রিকাকন্ঠেও বিভিন্ন মন্ত্র ও বাণী ছাপা হতে থাকে। এই বিষয়টি সাধারণত কারও চোখে পড়ার কথা নয়, কিন্তু এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র রচনার মধ্যে তো বটেই, তার শিরোনামের উদ্ধৃতিতেও ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রত্যয়-সন্ধানী সংগ্রামের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে।"[৪৫]

এ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য হল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ থেকে তার শিরোভাগে এক বেদবাক্য প্রকাশ করতে থাকিঃ অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো অথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে।[৪৬]

বর্তমান সময়ে আমরা পত্রিকায় সম্পাদকীয় দেখি, বা কোন প্রবন্ধটি কোন লেখকের লেখা তার উল্লেখ দেখি। কিন্তু দত্ত যখন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তখন এসবের কোনও লক্ষণ ছিল না। পত্রিকায় প্রকাশিত যেকোন লেখার দায়ভার সম্পাদককেই নিতে হত। একাধারে পেপার-কমিটির গ্রন্থ-সম্পাদক হিসেবে তিনি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, অন্যদিকে পত্রিকার জন্য লিখেছেন।

---

[৪৫]তদেব, পৃ. ৭৫ ও ৭৬।

[৪৬]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দো জ্যোতিষ এই হল অপারবিদ্যা (ভূতাদি বিষয়ক জ্ঞান)। আর যার দ্বারা এদের মনের অক্ষরব্রহ্ম অধিগত হয় তা হল পরাবিদ্যা। -বর্তমান গবেষক।

বিদ্যাদর্শন ও তত্ত্ববোধিনীর বহু লেখায় তাঁর নামোল্লেখ না থাকলেও সেগুলি যে তাঁর রচনা তা পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারেন। কারণ সেই সময় এরকম পারদর্শী ও গুণী লেখক খুব কমই ছিলেন। তাছাড়া লেখকের সংখ্যাও ছিল হাতেগোনা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ক্ষেত্রে তাঁর পত্রিকা সম্পাদনে সুবিধা হয়েছিল পেপার-কমিটি থাকায়। এবং এই পেপার কমিটি তৎকালীন সময়ের খুবই শক্তিশালী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল একথা আমরা আগেই জেনেছি।

কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথমে এক বছরের মেয়াদ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। এই এক বছর (ভাদ্র থেকে চৈত্র) আট মাসে শেষ হয়েছিল। অক্ষয় বাবুকে প্রথম বছর সম্পূর্ণরূপে পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশ মতই পত্রিকা চালাতে হয়েছিল। অক্ষয় বাবু যা লিখতেন মতের মিল না হলে দেবেন্দ্রনাথ তা কেটে দিতেন। সুতরাং প্রথম বছরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুমোদিত ধর্মকথা, ব্রাহ্মসভার মামুলী বক্তৃতা ও ব্যাখ্যা, রামমোহন রায়ের উপনিষদের চূর্ণক, তত্ত্ববোধিনী সভার কাজের বিবরণ ইত্যাদি ছাড়া সাধারণের পড়ার (উপযোগী) কোন বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে পারেনি।

দ্বিতীয় বছর থেকে সম্পাদক অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনীতে তাঁর স্বাধীন মত প্রকাশ করতে অগ্রসর হলেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের সাথে অক্ষয়কুমারের মতবিরোধ উপস্থিত হল। সুখের বিষয়, এই মত বিরোধের আলোচনা উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ধীরভাবে চলত। [.....] এইভাবে কিছু কিছু করে অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনীকে নিজের হাতে নিয়ে স্বাধীনভাবে তাতে দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন তত্ত্ববোধিনী কেবলমাত্র ধর্ম বিষয়ক না হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পত্রিকা হয়ে দাঁড়াল।"[৪৭]

[৪৭]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯ ও ৮০।

এই পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু অক্ষয়ের হাত ধরে তাতে শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। আসলে দেবেন্দ্রনাথ উল্লিখিত *'যেসব বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র পরিবর্তনের (শোধনের) সহায়তা করতে পারে, এমন সব বিষয়ও প্রকাশ হওয়া দরকার।'* এই কথাই তিনি কাজে করে দেখিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর গোষ্ঠীর বিরোধীতা বা সমর্থন না পেয়েও।

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে অক্ষয় দত্তের হাতে বাংলা গদ্য বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে আধুনিক, দৃঢ় সংঘবদ্ধ ও দার্শনিক আলোচনার যোগ্য বাহন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। অক্ষয় দত্ত ১৮৪৩-৫৫ সাল পর্যন্ত ১২ বছর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দত্ত যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন, তাঁর সেই সময়কার রচনাগুলি আমরা আলোচনার সবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি-

- *সামাজিক* লেখায় নারী সমস্যা-নারী অধিকার সংক্রান্ত বিষয় (বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ/কৌলিন্য প্রথা) যেমন আছে, ঠিক তেমনই সুরাপানবিরোধী প্রস্তাব, কৃষকদের সমস্যা (পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন) ইত্যাদি বিষয়গুলি আমরা দেখতে পাব।
- *রাজনৈতিক* রচনাগুলি মূলত ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী ও খ্রিষ্টান মিশনারীদের ধর্মান্তরিত করার বিরুদ্ধে।
- অন্যদিকে, *শিক্ষা সংক্রান্ত* বিষয়ে বাংলা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক (কেন দরকার), বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এছাড়া রয়েছে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বিষয়ক রচনাগুলি, পদার্থবিদ্যা-ভূগোল-চারুপাঠ ইত্যাদি

পাঠ্য পুস্তকের অংশবিশেষ। স্বদেশী ভাষায় বিদ্যাভ্যাস, বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি রচনা।

- *রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার*-এর জীবনী।
- *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের কিছু অংশ।*

এখন এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। আর এই কাজগুলির (লেখাগুলির) জন্যই তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয় এবং এগুলিই (লেখাগুলিই) তাঁকে বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক করেছে।

কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহের পক্ষে সনাতনপন্থীদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে অক্ষয় দত্ত *'বিদ্যাদর্শন'*-এর ২ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৬৫ শকে (১৮৪২ সাল) *'বহুবিবাহ'* শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে "বিধবা বিবাহ" আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন তৈরির জন্য 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র ১৫২ সংখ্যা চৈত্র ১৭৭৭ শকাব্দ বা ইংরাজি ১৮৫৫ সালে 'বহুবিবাহ' প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর *'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'* প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮৫৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায়। তাঁর মত সমর্থন করে অক্ষয় দত্ত ঐ বছরের চৈত্র সংখ্যায় তাঁর অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ এবং জোরালো সমর্থনমূলক প্রবন্ধ—*'বিধবা বিবাহ'* প্রবন্ধটি লেখেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইয়ং বেঙ্গলিদের মুখপত্র *'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'*-এ ১৮৪২ সালে বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন করে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৮]

তিনি লিখেছেন, "কয়েক বছরের মধ্যে বিধবাদের পুনঃসংস্কার (পুনরায় বিবাহ প্রথা) প্রচলিত হওয়ার বিষয়টি এই দেশে বারবার উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু এই বছরে এই বিষয়টি নিয়ে

[৪৮]Susobhan Sarkar, On the Bengal Renaissance, 1979, p. 35.

যেরকম আন্দোলন হচ্ছে, সেরকম আন্দোলন অন্য কোন বছর হয়নি। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত বিধবাবিবাহ বিষয়ক যে বইটি আগের মাসে (এই) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেটাই ঐ আন্দোলনের মূল কারণ। .....উল্লিখিত বইয়ে বিধবাদের পুনঃসংস্কার বিষয়ে যেরকম সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখানো হয়েছে, তাতে এই বিষয়টি শাস্ত্রানুসারে বৈধ বলে এদেশের জনগণ অনায়াসেই বিশ্বাস করতে পারে।

.....স্ত্রী'র মৃত্যু হলে, পুরুষেরা আবার বিয়ে করে যদি পাপগ্রস্ত না হয়, তবে স্বামীর মৃত্যু হলে, স্ত্রীরা আবার অন্য পুরুষকে বিয়ে করলে কিজন্য অধর্ম-দোষে দূষিত হবে, তা কোন ভাবেই নির্ধারণ করা যায়না।.....যখন একজাতি (পুরুষ) আবার বিয়ে করে এই পাপে (ব্যভিচার দোষ) লিপ্ত না হয়, তখন অন্য জাতি (নারী) দ্বিতীয়বার বিবাহিত হলে, তারও পাপগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ উপলব্ধ হয় না।.....বিধবা নারীর নিজের দুঃখ তার বিয়ের একমাত্র ফল না। তাঁর পিতা-মাতা প্রভৃতি স্বজন ব্যক্তি খুবই শোকাগ্রস্ত হয়। যদি/যখন বিধবা কন্যা জীবিত থাকে, মনে হয়, যেন তার সুখের বার্তা এই জনম থেকে একেবারে উঠে গেছে। তার শোকাগ্নি-শিখা নির্বাণ হওয়ার উপায় নেই।

.....যে বাল্যকালে বৈধব্যদশায় পতিত হয়, তারা সকলেই যে চিরজীবন স্বভাবসিদ্ধ প্রবল রিপুর একেবারে বশীভূত বা উৎসিন্ন করে সতীধর্ম পালন করবে তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তা সম্ভব হলে, বাংলাদেশ বিধবা নারীদের কলঙ্কে যেরকম কলঙ্কিত হয়েছে, তা কখনই হত না। .....ভ্রূণহত্যা ঐ পাপময়ী প্রথার (ব্যভিচার) অবশ্যম্ভাবী ফল। ব্যভিচারিণী বিধবা স্ত্রীদের মধ্যে অনেকে নিজের অপত্যোৎপাদন শক্তির একেবারে সংহার করে ফেলে। যারা সে বিষয়ে প্রবৃত্ত অথবা কৃতকার্য না হয়, তারা ভ্রূণহত্যার মতন মহাপাপে বারবার লিপ্ত হয়ে পৃথিবীকে পাপভারে আক্রান্ত করতে থাকে। ....স্বামীহীনা স্ত্রীলোকেরা ভ্রূণহত্যা পাপে যত লিপ্ত হয়, সধবাদের তত

হতে হয় না। কৌলীন্য মর্যাদা প্রচলিত থাকাতে, বিধবাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং তার জন্য অশেষবিধ অনর্থ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিধবা বিবাহ প্রতিষেধ ও বল্লাল (সেন) প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্য মর্যাদা এই দুই অনর্থকারী রীতি এই দেশে ধর্ম পথের কাঁটা হয়ে রয়েছে। তার দ্বারা বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, জারজের (বন্ধ্যা নারীর) সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, পাপের পরাক্রম বৃদ্ধি হচ্ছে। ঐ দুই প্রথার প্রভাবে, কলিকাতা নগরী বেশ্যায় ভরে উঠেছে, বেশ্যাদের ঘরের অশুদ্ধ উল্লাস ধ্বনি গৃহিণীদের ঘরের মধ্যেও প্রবেশ করছে, এবং জারজদের লজ্জা ও সঙ্কোচ দূর হয়ে সদ্বংশজাত ভদ্র সন্তানদের অবমাননা করছে।...

....কেউ কেউ বলে থাকেন, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে, স্ত্রীলোকেরা নিজের অনভিমত স্বামীর প্রাণবধ করে দ্বিতীয় স্বামীর পাণিগ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হবে। যাঁরা মানব প্রকৃতির বিষয় বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে দেখেননি, তাঁরা ছাড়া অন্য লোকেরা এরকম আপত্তি উত্থাপন করতে পারে না। এরকম অযুক্তিমূলক আপত্তি উত্থাপন করার আগে একবার বিবেচনা করা উচিত ছিল,....[৪৯] এই বলিষ্ঠ যুক্তি তিনি বাংলা জুড়ে প্রচার করে সকলের মনে বিধবা বিবাহের পক্ষে যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সমকালের এক জ্বলন্ত সমস্যা ছিল কৃষকদের সমস্যা, যা ব্রিটিশের বিরূপ হস্তক্ষেপের কারণে আরও ভয়াবহ চেহারা নেয়। অক্ষয় দত্ত সমসাময়িক এই সমস্ত বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তাঁর *'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন'* রচনাটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বৈশাখ, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ ১৮৫০ সাল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছেন-

"যে রক্ষক সেই ভক্ষক"-এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামিদিদের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা এক দিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে

[৪৯]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পা.), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ২০১২, পৃ. ২৯-৩৬।

না; কি জানি কখন কী উৎপাত ঘটে ইহা ভাবিয়াই তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তিনি (ভূস্বামী) কি কেবল নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি (ভূস্বামী) ছলে বলে কৌশলে তাহারদিগের যথা সর্ব্বস্ব হরণে একাগ্র চিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন।'[৫০]

তিনি এই কথার দ্বারা ঔপনিবেশিক বাংলার জমিদারি প্রথার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। কৃষি প্রধান দেশ ভারতে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিকরা বেশি রাজস্ব/কর আদায়ের জন্য বিভিন্ন ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত/নীতি গ্রহণ করে। যেমন- *'সূর্যাস্ত আইন'* (প্রত্যহ সূর্য ডোবার পূর্বে রাজস্ব প্রদান), *'পাঁচসালা বন্দোবস্ত'* (অর্থাৎ পাঁচ বছরের জন্য রাজস্ব প্রদান চুক্তি), *'একসালা বন্দোবস্ত'* (অর্থাৎ এক বছরের জন্য রাজস্ব প্রদান চুক্তি), *'দশসালা বন্দোবস্ত'* (অর্থাৎ দশ বছরের জন্য রাজস্ব প্রদান চুক্তি) ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বন্দোবস্তগুলি ব্যর্থ হলে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে *'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'* প্রবর্তন করেন। যা চিরস্থায়ীরূপে এক নতুন জমিদার শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল। যারা ইংরেজদের অনুকরণ করতে গ্রাম বাংলা ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতেন। ফলে তাদের উপ-জমিদাররা কৃষকদের উপর জুলুম করতে থাকে। তারই কুফল অর্ধ শতাব্দী পরে এই বাংলায় দেখা যেতে থাকে।

অক্ষয় দত্ত বাংলার জমিদারদের মতন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেন নি বলেই সহজেই তৎকালীন বাংলার কৃষক সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পেরেছিলেন। এবং এই রচনাগুলি তার শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক (ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কৃষকদের সমর্থন করতে ভয় পেত, কিন্তু অক্ষয়ের সেই পিছুটান ছিল না)।

'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন' রচনাটি সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেনঃ "সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকাতেও এ দেশের সাধারণ কৃষক-প্রজাদের আর্থিক দুরবস্থার বর্ণনা

[৫০]তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৪ ভাগ ৮১ সংখ্যা বৈশাখ ১৭৭২ শক, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন, পৃ. ৫।

পাওয়া যায়, কিন্তু যতদূর বর্তমান সঙ্কলকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তাতে আর কোন বর্ণনাই এত বাস্তব, জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী বলে মনে হয়নি। আজকের দিনেও যদি কোন উপন্যাস-কাতর পাঠক শতাধিক বছর আগের গদ্য ভাষায় লেখা এই রচনাগুলি পড়েন, তাহলে ছবির মত গত শতাব্দীর মধ্যভাগের বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের অত্যাচার-পীড়িত শোষিত জীবনের ছবি তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হবে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে বিদেশী শাসকদের হাতে হাত মিলিয়ে এদেশীয় উপ-শাসকেরা (জমিদাররা) কীরকম নৃশংসভাবে কৃষকদের শোষণ ও পীড়ন করতেন। রচনার মধ্যে শুধু যে পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, কালের বিচার এমন সাহসেরও পরিচয় পাওয়া যায় যা এযুগের অতি প্রগতিবাদী পত্রিকাতেও দুর্লভ।"[৫১]

দত্তের এই রচনাটি প্রকাশের দশ বছর পর দীনবন্ধু মিত্রের *'নীল দর্পণ'* নাটকটি প্রকাশিত হয় (১৮৬০ সাল)। অনুমান করা যায়, অক্ষয়ের এই লেখাটির দ্বারা দীনবন্ধু অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমন ইঙ্গিতই করেছেন অক্ষয় দত্তের জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায়। *History of Political Thought* গ্রন্থে বিমানবিহারী মজুমদার উল্লেখ করেছেন, 'পরবর্তীকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লঙ সাহেব ও দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা এই বিষয়ে যে আন্দোলন করেন অক্ষয়কুমার তার পুরোগামী'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *নীল দর্পণ* নাটকটি (ইংরেজি তর্জমা) নিয়ে যখন বিতর্ক দেখা গিয়েছিল তখন রেভারেন্ড লঙ-এর পাশে যেসকল ব্রাহ্মরা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কালী প্রসন্ন সিংহ প্রমুখ।[৫২]

তাই মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সগর্বে বলেছেন, "অক্ষয়কুমারের অন্তত ২৩ বছর পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন *'বঙ্গদেশের কৃষক'* (১৮৭২ সাল)। অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা

[৫১]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

[৫২]David Kopf, *The Brahmo Samaj and the shaping of the Modern Indian Mind*, 1979, pp. 118.

পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দেখা যাবে, দুজনের দৃষ্টিতে আকাশ-জমিন পার্থক্য। অক্ষয়কুমার কৃষকের পরম বন্ধু। তাই কৃষক-শ্রমিকের ওপর জমিদারের উৎপীড়ন, শাসক শ্রেণীর অত্যাচার এবং তাঁদের অনুগত দেশীয় কর্মচারীদের প্রতি তিনি খড়গহস্ত। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের দুঃখে কাতর কিন্তু জমিদারের ওপর শ্রদ্ধাশীল এবং শাসকশ্রেণীর প্রতিও অনুগত! অনেক বাঙালি মনীষীদের জীবন ও কর্মের দিকে একটু চোখ-কান খুলে তাকালেই দেখা যাবে, তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত নানারকম গুরুতর দুর্বলতা। এমনকি চিন্তার ক্ষেত্রেও নানা বিভ্রান্তি। অক্ষয়কুমার এক ব্যতিক্রম। তার মধ্যে এরকম দুর্বলতা সহসা চোখে পড়ে না। এর ফলে তিনি হতে পেরেছেন বাঙালি চিন্তানায়কদের বাদশা।"[৫৩]

বিটন সাহেব (জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটন) ছিলেন একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং ব্রিটিশ শিক্ষা আধিকারিক। তিনি খুবই বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। অক্ষয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৬৯ সংখ্যা, বৈশাখ ১৮৪৮ *'স্বদেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান'* (বিদ্যাভ্যাস) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি সেই প্রবন্ধে লিখেছেন-

"শিক্ষা সমাজাধিপতি বিদ্যোৎসাহী বিটন সাহেব অনেকানেক বিষয়ে ছাত্রদের যথোচিত প্রতিষ্ঠা করে এরকম ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, হিন্দু ছাত্ররা যেরকম প্রখর বুদ্ধিশালী, তাতে যদি তাঁরা অল্প বয়সে বিদ্যানুশীলনের অভ্যাস ত্যাগ না করেন, তবে ভূমণ্ডলে বুদ্ধি-বিষয়ে খুব প্রধান বলে গণ্য হতে পারেন। বিশেষত তিনি এদেশীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা-বিষয়ে যে সদ্বিবেচনাসিদ্ধ বক্তৃতা করেছেন, তা পড়ে পরমাপ্যায়িত হয়েছি। তিনি এরকম বলেছেন যে, এখন যাঁরা ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন রকম বিদ্যাশিক্ষা করছেন, স্বদেশীয় লোকদেরকে সেই সমস্ত বিদ্যার উপদেশ দেওয়া তাঁদের সর্বতোভাবে কর্তব্য।"

[৫৩]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, পৃ. ৮৪।

তিনি আরও লিখেছেন: "কলিকাতায় যেসমস্ত যুবকরা ইংরেজি ভাষায় গদ্য-পদ্য রচনা করে শ্লাঘাপূর্বক আমার কাছে আসে, আমি তাদেরকে সবসময় বলি যে বাংলা ভাষা শেখাই তোমাদের যশ:প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। তাঁদের লেখা প্রস্তাবগুলি যথা উপযুক্ত প্রশংসা করে পরে বলেছি যে, যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, তবে এভাবে প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা ত্যাগ কর। যদি তোমাদের লেখক হওয়ার অনুরাগ ও সেই রকম ক্ষমতা থাকে, তবে নিজের (মাতৃ) ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতে, অথবা ইংরেজি গ্রন্থের উত্তমোত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করতে আগ্রহী হও, তাহলে স্থায়ী কীর্তিলাভ করতে পারবে। যাঁরা প্রথমে এই পথাবলম্বী হয়ে কৃতকার্য হবেন, তাঁদের জন্য বিপুল যশ সঞ্চিত রয়েছে।"[৫৪]

শ্রীযুক্ত হর্বট মেডাক সাহেবও এই বছর (১৮৪৮ খ্রিঃ) হিন্দু কলেজের পরীক্ষা পাশ করা ছাত্রদের পারিতোষিক বিতরণের সময় যে বক্তৃতা দেন, তাতেও বালকদের স্বদেশীয় ভাষানুশীলনের আবশ্যকতা বিষয়ে অনেক অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।[৫৫] এটা ঠিক যে, ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রায় সকলের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল। কারণ এতে সরকারি চাকরি পাওয়া (কেরাণি হওয়া) সহজ ছিল। কিন্তু মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চাও সমানভাবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার যোগ্য ছিল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা তৎকালীন সময়ে জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াতে সাহায্য করেছিল।

অক্ষয় দত্ত মনে করতেন জনগণকে শিক্ষা প্রদান করা, শিক্ষা প্রণালী ঠিক করা, সবটাই শাসকের কর্তব্য। তাই তিনি *'বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা'* প্রবন্ধে নির্দ্বিধায় লিখেছিলেন (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৪০২ সংখ্যা, মাঘ ১৮৭৬)- "শিক্ষা জাতীয় উন্নতির মূল। শিক্ষা প্রণালী যদি অপকৃষ্ট হয়, তবে কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য

[৫৪]তদেব, পৃ. ১৩৭।

[৫৫]তদেব, পৃ. ১৩৮।

মানুষের সবরকম মানসিক বৃত্তির উন্মেষ ঘটান। যাতে মানুষের শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, শিক্ষার সেটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। তার কারণ কোন কারণে শিক্ষা কাজের ভুল হলে জাতীয় উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে থাকে, অতএব শিক্ষার মতন গুরুতর কাজ জগতে আর নেই। রাজ্যের (দেশের) লোকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা রাজার (ব্রিটিশ প্রশাসকদের) একটি প্রধান কর্তব্য।"[৫৬]

তিনি আরও লিখেছেন, ".....আজকের দিনে ইংরেজিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকলে কোনমতেই চলেনা এবং ইংরেজদের কাছ থেকে আমাদের এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে, তাও এটি প্রকৃত জাতীয় উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক বলতে হবে। নিজের (মাতৃ) ভাষায় অনুশীলন করে স্বাভাবিকভাবে যে জাতীয় উন্নতির উদ্ভব হয় তাই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি।...."[৫৭]

তাই তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসারের জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছেন, ".....যদি আমাদের দেশের ধনী ও অন্যান্য ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে একটি জাতীয় শিক্ষাসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই জাতীয় শিক্ষাসমাজে যাঁরা বাংলা ভাষায় শিক্ষার উচ্চতম বিষয়ে বই রচনা করবেন তাঁদেরকে এবং যেসব ব্যক্তি ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাওয়ার পর সেই সব বইয়ে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হবেন, তাঁদেরকে লোভনীয় অর্থপারিতোষিক ও উপাধি দেন তাহলে দেশের গৌরব কতদূর রক্ষা করা যায়, তা বলা যায়না (অনেকটা রক্ষা করা যায়)। যখন আমাদের দেশের লোকজন যাঁরা উল্লিখিত শিক্ষাসমাজ থেকে উপাধি পাবেন না তাঁদেরকে প্রকৃত বিদ্বান বলে গণ্য করবেন না, তখন বাঙালির সমাজে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে এ রকম বলা যাবে।"[৫৮] এমনকি, তিনি কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের শারীরিক উন্নতির জন্যও গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

---

[৫৬]তদেব, পৃ. ১৪১।

[৫৭]তদেব, পৃ. ১৪২।

[৫৮]তদেব, পৃ. ১৪৪।

তিনি রাজা রামমোহন রায়-কে *"ভারতের বন্ধু"* বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়পতাকা তাঁদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হয়েছে, তা পতিত হল না, হবেও না, প্রতিনিয়ত একভাবে উড্ডীয়মান রয়েছে। আগে যে ভারতবর্ষীয়রা তোমাকে পরমশত্রু বলে জানতেন, তার সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরমবন্ধু বলে বিশ্বাস করছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু।"[৫৯]

রামমোহন রায় (ভারতের) রাজস্ব ও বিচার প্রণালী সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখে বোর্ড অফ কন্ট্রোল নামে রাজকীয় কার্যালয়ে পাঠান এবং সেই কার্যালয়ের অধ্যক্ষরা হৌস (হাউস) অব কমন্স (ব্রিটিশ আইনসভার নিম্নকক্ষ) নামে সভায় সেই সমস্ত পাঠিয়ে দেন।"[৬০] "তাঁর ঐ বই ও প্রবন্ধগুলি অনেকটাই উপকারী ছিল। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ধীরে ধীরে অনেক কাজ করেছেন ও তার দ্বারা (ভারতের) বিশেষ উপকারও হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

সে সময়ের পক্ষে একী কান্ড! কী ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মহিমা! তুমি ইংল্যান্ডে গিয়ে বসবাস করলে, সেখানকার সুপন্ডিত সাধু ব্যক্তিরা তোমার অসাধারণ গুণ দেখে বিস্ময়াপন্ন হয়ে যায়। তোমার সাক্ষাৎলাভ করে, সেখানকার স্বজন সমাজে এক চমৎকার অপূর্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস বা নিউটন পৃথিবীতে আবার উপস্থিত হয়েছেন। তুমি নিজের সময়ের অতীত বস্তু। কেবলমাত্র সময়েরই কেন? নিজের দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য বাসস্থান নয়। এক ব্যক্তি বলে গেছেন, এরকম দেশে এরকম লোকের জন্মগ্রহণ পৃথিবীতে আর কখনও ঘটেছে (বলে) মনে হয় না।"[৬১]

---

[৫৯]তদেব, পৃ. ১৫৫।

[৬০]তদেব, পৃ. ১৫৬।

[৬১]তদেব, পৃ. ১৫৬-৫৭।

অক্ষয় দত্তের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনাকালে এরকম বিভিন্ন রচনা আমরা দেখতে পাই। শুধুমাত্র দেশের মঙ্গল ও দেশীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কেই তিনি সচেতনমূলক মন্তব্য করেছিলেন এরকমটা নয়। তিনি শিক্ষাবিদ্ ডেভিড হেয়ার (ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা) সম্পর্কে তাঁর তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকীর (১৮৪৫ সাল) স্মরণ সভায় (*হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা*) বলেছিলেন-

"ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কালেজ (কলেজ), তাহা স্থাপনের মূলাধার কারণ কোন ব্যক্তি? — সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান কোন মনুষ্য? — ডেবিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন পুরুষ? —ডেবিড হেয়ার সাহেব। অশেষ মঙ্গলের কারণ যে মুদ্রাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা স্থাপনে বিশেষ উদযোগী কোন মহাত্মা? —ডেবিড হেয়ার সাহেব।"[৬২]

ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির কার্য ইংরাজীতে নিষ্পন্ন হওয়া যেন অবশ্য কর্তব্য বলিয়া পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত সে সংস্কারের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ারের স্মরণার্থ সভা ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব (১৮৪৫ সাল) উপলক্ষে অক্ষয়বাবু বাঙ্গালা ভাষাতে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সভায়, বোধ হয়, ইহার পূর্বে কখনও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হয় নাই।

অক্ষয়বাবুর বক্তৃতা হইতে যেন এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। যে সকল ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি এতদিন বাঙ্গালা ভাষাকে "বর্ব্বরের ভাষা" বলিয়া মনে করিতেন এবং যাঁহাদিগের

[৬২]অক্ষয়কুমার দত্ত, হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), ২০০৮, পৃ. ১১১-১১২।

বিশ্বাস ছিল যে বাঙ্গালা ভাষা, শিশুর ও মূর্খের হৃদয়ের ভাব বিকাশের উপযোগী হইলেও সুশিক্ষিতের চিন্তা প্রকাশের উপযোগী নয়; অক্ষয়বাবুর তেজস্বিনী ভাষা হইতে তাঁহারা আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তৎকাল প্রসিদ্ধ পত্রিকা ইন্ডিয়ান ফিল্ডের সম্পাদক, খ্যাতনামা বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় তাদৃশ অধিকার ছিল না। অক্ষয়বাবুর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, তিনি নিজের মন্তব্য প্রকাশের সময়, পুলকিত চিত্তে বলিয়াছিলেন-

*".....The discourse we have just heard is very clever and interesting, and it is not the less so because of its being a Bengali one, I know*** that there is a large number of or educated friends who can relish nothing that is Bengali, their taste being diametrically opposed to all that is written in their own tongue, The most elevated thoughts and the most sublime sentiments, when embodied in it, become flat, stale and unprofitable. But this prejudice is, I am disposed to think, fast wearing out, and the necessity and importance of cultivating the Bengali Language-the language of our country, the language of our infancy, the language in which our earliest ideas and associations are entwined-will ere long be recognised by all."*[৬৩]

[৬৩]যোগীন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০। (মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২১২।)

গ. খ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্যায়ন-

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বারা পত্রিকার সম্পাদক, লেখকরাই শুধুমাত্র বিখ্যাত বা সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন এরকমটা নয়। পত্রিকা প্রকাশ করে প্রকাশক হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও যথেষ্ট সন্মানের অধিকারী হয়েছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, *"তিনি (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ না করলে এবং বহু কষ্ট ও পরিশ্রম করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথমদিক কার প্রকাশিত প্রস্তাবগুলি (রচনাগুলি) বিশেষভাবে সংশোধন করে না দিলে বাংলা ভাষার বর্তমান উন্নতির পত্তনভূমি স্থাপিত হত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন নিজের লেখা বেতাল-পঞ্চবিংশতি বইয়ের মাধ্যমে বাংলা ভাষার বর্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন, দেবেন্দ্রবাবুও সেই একই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ ও সংশোধন করে সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন।"*[৬৪]

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের বিভিন্ন রূপান্তর ঘটে। এ কাজে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সে সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের এই নতুন রূপান্তরিত পর্বের একমাত্র ও অন্যতম ধারক-বাহক হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। পত্রিকার জন্ম ও দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা গ্রহণের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও মাত্র চার মাস কয়েক দিনের। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র ও ব্রাহ্মোপাসনা প্রণালী প্রবর্তনের ফলে ব্রাহ্মসমাজ ঠিক পুনর্জীবন নয়, এক 'নবজীবন' লাভ করে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্ম থেকেই এই নবজীবনের সূচনা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৃষ্ঠায় এই রূপান্তরের প্রতিটি পর্বের পদাঙ্ক আঁকা আছে। এরপর ব্রাহ্মসমাজের জীবনে এক বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। ১৮৪১ (সাল) থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে এবং তারপরে ১৮৫০ (সাল) থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে

[৬৪]রাজনারায়ণ বসু, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা*, ১৯৩৫, পৃ. ৬৫।

কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বাংলাদেশের সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হতে থাকে। আদর্শের প্রচারে ব্যবস্থা না থাকলে নিশ্চয় তার এরকম প্রসার কখনই সম্ভব হত না। এই প্রচারের ব্রত প্রধানত গ্রহণ করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। এই পত্রিকা না থাকলে শুধু ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকদের দ্বারা এ কাজ তখন সম্ভব হত কি না সন্দেহ।"[৬৫]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে কীভাবে সাহায্য করেছিল সে সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, *"In this act of propagation, the Tattwabodhini Patrika rendered great help. Its columns carried the new message everywhere in Bengal amongst the educated classes. There having been no regularly appointed missionaries of the Samaj at that time, the Patrika largely fulfilled that want. In the course of a few years Samajes sprang up in many stations outside Calcutta through the influence of the paper. Some amongst the educated men, who were its readers, imbibed the new principles, took counsel together and established Samajes in their own localities."*[৬৬]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের বাঙালি হৃদয় কিভাবে আলোড়িত হয়েছিল, সে সম্পর্কেও শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, *"তত্ত্ববোধিনী বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়ে দাঁড়াল। তার আগে বাংলা সাহিত্যের বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্রগুলির অবস্থা কি ছিল অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য জগতে কি পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তা স্মরণ করলে, তাঁকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলে থাকা যায় না।"*[৬৭]

---

[৬৫]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, পৃ. ৭৭।

[৬৬]ঐ।

[৬৭]তদেব, পৃ. ৭৪।

একথা বলার পরে শিবনাথ শাস্ত্রী সেই সময়কার অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তুলনা করে লিখেছেন, "রসরাজ', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি অশ্লীল ভাষার কাগজগুলি ছেড়ে দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' মত ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লেখা পত্রিকাগুলিতেও এমন সব ব্রীড়াজনক বিষয় প্রকাশিত হত, যা ভদ্রলোকেরা পড়তে পারত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যরা ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল (প্রকাশিত হল), তখন তাঁরা আনন্দিত হয়ে উঠলেন।[৬৮]

অক্ষয় দত্ত এই কৃতিত্বের সম্পূর্ণ অধিকারী। তাঁর হাত ধরেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। কি দেশী কি বিদেশী, কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান কি ব্রাহ্ম ব্যক্তি মাত্রে প্রায় সবাই এই পত্রিকার গ্রাহক হতে থাকে। যাঁদের অবস্থা কিছু খারাপ, তাঁরা সিকি বা অর্ধেক দামে পত্রিকা পাওয়ার আশায় কর্তৃপক্ষর কাছে আবেদন করেন। ১৭৭২ শকের ৩১শে বৈশাখে (মে, ১৮৫০ সাল) তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব "গ্রন্থ-সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়, কারণ তাঁদেরই বিশেষ পরিশ্রমে গত বছর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উৎকর্ষের জন্য সভারও উন্নতি হয়েছে" গৃহীত হয়। ১৭৬৫ শক (১৮৪৩ সাল) থেকে ১৭৭৭ শক (১৮৫৫ সাল) পর্যন্ত, এই বারো (১২) বছর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অতি উন্নত অবস্থা—বাংলা সাহিত্যের নতুন যুগের উৎপত্তির সময়।[৬৯]

এর প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীকার অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য লিখেছেন, "পুস্তকাকারে প্রকাশের আগেই এই সব রচনা সেদিনের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের

---

[৬৮]তদেব, পৃ. ৭৪-৭৫।

[৬৯]নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, *অক্ষয় চরিত*, পৃ. ২৫-২৭।

পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছিল সরাসরি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেই অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচন করার ফলে। বঙ্কিমচন্দ্র তার চৌদ্দ (১৪) বছর বয়সে হুগলী কলেজের বিদ্যালয় শাখায় পড়ার সময় অক্ষয় দত্ত সম্পাদিত এক বছরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ১৮৫৩-র জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার মধ্যে পেয়েছিলেন। সে বছর পরীক্ষা পাঁচ মাস পিছিয়ে যাওয়ায় অতিরিক্ত (Supplementary) পাঠ্যরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৭৪ শকের বৈশাখ থেকে চৈত্র (১৮৫২-৫৩ খ্রিঃ) সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিষয়ক রচনার প্রধান লেখকের ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং (পত্রিকা) সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত।"[৭০]

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর একটি বিষয়ের সূত্রপাত করে বাংলার তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে চমকিত করে তুলেছিল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয় নিয়মিতভাবে আলোচনা করতে সচেষ্ট হওয়া সেকালের কাছে খুবই নতুন মনে হয়েছিল। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা ও অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য কৌশল প্রকাশ করার অঙ্গীকারসূত্রে বিজ্ঞান বিষয়ক নানা প্রবন্ধ সচিত্র হয়ে পত্রিকার অঙ্গ ভূষিত করতে লাগল। আমরা জানি যে সেকালের বাংলার শিক্ষিতমণ্ডলীর অনেকে এই সব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতেন। তাঁরা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সুচারুভাবে লেখা যেতে পারে।"[৭১]

বাংলা ভাষার শৈশব অবস্থাকে অক্ষয় দত্ত ১০ বছরের মধ্যে যৌবনে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন- "এই (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনাকালীন) দশ বছর অক্ষয়কুমার অগাধ এবং অকাতর পরিশ্রম করে ইউরোপের প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও ধর্মনীতি এবং ভারতের প্রত্নতত্ত্ব আলোড়িত করে, সামান্য অসামান্য

[৭০]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, পৃ. ৮২।
[৭১]ঐ।

সবরকম রত্ন উদ্ধার করত, তত্ত্ববোধিনীকে বিভিন্ন ভূষণে ভূষিত, এবং উজ্জ্বল করতে লাগল। এই সময়ে তরুণ কিশোর পাঠ্য চারুপাঠের, যুবক-পৌঢ়-পাঠ্য ধর্মনীতির ও বাহ্যবস্তুর এবং প্রত্নপ্রিয়-পণ্ডিত-পাঠ্য ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় বইয়ের ভ্রূণ তত্ত্ববোধিনী-গর্ভে বর্ধিত হতে থাকল। তেমন দক্ষ, ব্রতপরায়ণ, নিষ্ঠাবান, শ্রমসুখী প্রতিপালকের উপর তরুণ বাংলা গদ্যের লালনের ভার না পড়লে, আজ আমাদের কি দুর্দশাই না হত।"[৭২]

তাই দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, *"প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের উপস্থিতিতে নব বাঁড়ুয্যা একদিন তাঁকে বলেন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বড় ভাল কাগজ। আমি বাবুর (প্রসন্ন কুমার ঠাকুর) লাইব্রেরীতে বসে এটি পড়ি; তা পড়লে জ্ঞান হয়, চৈতন্য হয়।'"*[৭৩] পাদ্রী লং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে লিখেছিলেন: *"To those who wish to know what the expressiveness of the Bengali language mean, we would recommend the perusal of the Tattwabodhini Patrika, a monthly publication in Bengali, which yields to scarce any publication in India for the ability and originality of its articles."*[৭৪]

(ঘ) অসুস্থ অবস্থায় পত্রিকা কমিটির দান ও পরবর্তী ঘটনাবলী (পীড়া ও পত্রিকার অবনতি)

অক্ষয় দত্ত শারীরিকভাবে ১৮৫০-এর দশক থেকেই অজীর্ণ, উদারময় ও অর্শ রোগে ভুগছিলেন। তার উপর মানসিক পরিশ্রম (বিশেষতঃ পত্রিকা সম্পাদনা ও সেই সংক্রান্ত কাজগুলি) অত্যন্ত বেশি হওয়াতে শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পরতে থাকে। এই অসুস্থতার জন্য তিনি রাত্রে লেখাপড়া ও

[৭২]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পা.), *শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ২০০৭, পৃ. পরিশিষ্ট ১৮।
[৭৩]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।
[৭৪]মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

অন্যান্য কোন কাজ করতে পারতেন না। তিনি ১৭৭৭ শকের (১৮৫৫ সাল) আষাঢ় মাসে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময় হঠাৎ মূর্ছা যান। উপাসনায় উপস্থিত বন্ধুরা তখন অনেক কষ্টে তাঁর জ্ঞান ফেরান।

এই দুর্ঘটনার কিছু দিন পরে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অফিসে কাজ করছিলেন, এমন সময় তাঁর উৎকট 'শিরারোগ'-এর সূত্রপাত হয়। এই বিষম দুশ্চিকিৎসার জন্য তিনি আজীবনের জন্য তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দায়িত্ব থেকে বিদায় গ্রহণ করেন (১৮৫৫ সাল)। এতে পরিবার-আত্মীয়দের পাশাপাশি, ব্রাহ্মসমাজ ও বাংলার জনগণের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

অক্ষয়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছাড়ার পর থেকেই এই পত্রিকার অবনতি ঘটতে থাকে। এমনকি দেবেন্দ্রনাথ গোষ্ঠীর চাপে পত্রিকার সাথে জড়িত থাকা বহু মানুষই তাদের সংশ্রব ত্যাগ করেন। আমরা জানতে পারি, সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম্মভাব বিজাড়িত দেখিয়া এবং কোন কোন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাবুর সহিত তাঁহার ঠিক মতমিল হইতেছে না বুঝিয়া, অক্ষয় দত্তের কিছু কাল পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর সম্পর্ক ত্যাগ করেন।[৭৫]

অক্ষয় দত্তের মস্তিষ্ক আক্রান্ত (শিরোরোগ) হওয়ার প্রধান কারণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁর শরীর ও মনের অমানুষিক পরিশ্রম। দত্ত শিরোরোগের জন্য পত্রিকা সম্পাদনার কাজ ও পরে শিক্ষক-শিক্ষণ নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন (১৮৫৮ সাল)। ফলস্বরূপ অক্ষয়কুমার আর্থিক অনটনে পরেছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় (বিদ্যাসাগর ছিলেন একাধারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক, গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার অন্যতম

[৭৫]বিহারিলাল সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

প্রভাবশালী সদস্য এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক।) উদ্যোগ নিয়েছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে দত্তকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৩য় ভাগ ১৭১ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৭৭৯ শকে প্রকাশিত হয়-বিশেষ সভার প্রস্তাব (২৯শে ভাদ্র ১৭৭৯ শক)—*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকদিগের যে নানা গুরুতর উপকার লাভ হইয়াছে, ইহা বোধ বিশিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সৃষ্টির এক জন প্রধান উদ্যোগী এবং এই মহোপকারিণী পত্রিকার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি লাভের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহারই যত্নে ও পরিশ্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বত্র এরূপ আদর ভাজন ও সর্ব্বসাধারণের এরূপ উপকার সাধন হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনেই নিয়ত নিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অবিশ্রান্ত অত্যুৎকট পরিশ্রম দ্বারা শরীর পাত করিয়াছেন, বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। তিনি যে অতি বিষম শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা কেবল ঐ অত্যুৎকট মানসিক পরিশ্রমের পরিণাম, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব যিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নিমিত্ত শরীরপাত করিয়াছেন, সেই মহোদয়কে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করা ও তাঁহার প্রতি তথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক, না করিলে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়।*

দীর্ঘকাল দুরন্ত রোগে আক্রান্ত থাকাতে অক্ষয়কুমার বাবুর আয়ের সঙ্কোচ, ব্যয়ের বাহুল্য এবং তন্নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ঘটিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। এ সময় কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারিলে প্রকৃতরূপে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, এই বিবেচনায় গত শ্রাবণ মাসের দ্বাদশ দিবশীয়

বিশেষ সভায় শ্রীযুত বাবু কানাইলাল পাইন প্রস্তাব করেন, যে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে কিছু কালের জন্য অক্ষয়কুমার বাবুকে সাহায্য প্রদান করা যায়। তদনুসারে অদ্য সমাগত সভ্যেরা নির্দ্ধারিত করিলেন, অক্ষয়কুমার বাবু যত দিন পর্য্যন্ত সম্যক্ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ শরীর হইয়া পুনরায় পরিশ্রম ক্ষম না হন, তত দিন তিনি সভা হইতে আগামী আশ্বিন মাস অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা (২৫ টাকা) মাসিক বৃত্তি পাইবেন। আর ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে এই প্রতিজ্ঞার প্রতিলিপি অক্ষয়কুমার বাবুর নিকট প্রেরিত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও অবিকল মুদ্রিত হয়।

বিহারীলালের লেখা থেকে জানতে পারি, অক্ষয় দত্তকে এই মাসিক বৃত্তি দেওয়ার প্রস্তাবে "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহাতে এই বলিয়া প্রতিবাদী হন, কেবল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আয়ে যদি বৃত্তি দেওয়া হয়, তবে তাহা হইতে পারে, তত্ত্ববোধিনী সভার আয় ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আয় একত্র মিলিত করিয়া তাহা হইতে দেওয়া অবধি। সাধারণ সভ্যের মতানুসারে উহার বিপরীত ব্যবস্থা ধার্য্য হয়।"[৭৬]

দত্ত এই সাহায্য ৫ বছর গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৫ সাল নাগাদ তাঁর বইপত্রের বিক্রি থেকে আয় বাড়তে থাকলে। তিনি তখন সভাকে এতদিন সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুরোধ করেন সেই সহায়তামূলক বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৪র্থ ভাগ ২৩১ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৭৮৪ শকের বিজ্ঞাপনে সম্পাদক শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ লিখেছেন-

"শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সমাজ হইতে যে বার্ষিক বৃত্তি পাইতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি তাহা গ্রহণ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় উপকার স্বীকার পূর্ব্বক এক্ষণ অবধি আর না লইবার

[৭৬]বিহারিলাল সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

প্রার্থনায় এক পত্র লিখিয়াছেন, অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিলেন, ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিলেন।"

তাঁর অসুস্থতার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এমনকি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও লিখেছেন- *"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময়ে ৭০০ (সাত শত) জন গ্রাহক ছিল তাহা কেবল এক অক্ষয় বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময়ে পত্রিকা সম্পাদনা না করিতেন, তাহা হইলে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না। পুনর্বার ইহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার চাই।"*[৭৭]

কিন্তু পত্রিকার উন্নতি আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি। শিরোরোগের জন্য অক্ষয় দত্ত পত্রিকা সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করলে এরপর পত্রিকা সম্পাদক হন নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হন ১৮৫৯ সালের মার্চ মাসে। এই ১৮৫৯ সালেই তত্ত্ববোধিনী সভা উঠে যায়। সভার সাথে সাথে পেপার কমিটিও (গ্রন্থাধ্যক্ষ কমিটি) উঠে যায়।[৭৮]

অক্ষয় দত্ত একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদনাই তাঁর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল। তাঁর মৃত্যুতে (২৭শে মে ১৮৮৬ সাল) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেছিল, *"তিনি এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দেহ এই তত্ত্ববোধিনীর পরিচারণায় একপ্রকার নষ্ট হয়। কি ভাষা, কি বিষয় সকল প্রকারেই বঙ্গ সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী।"*[৭৯]

তাঁর মৃত্যুতে অন্যান্য অনেক পত্রিকাই বিভিন্ন মন্তব্য করেছিল। এর মধ্যে একটি উল্লেখ করা হল-*"We are sorry to hear of the death of Babu Akshoy Kumar Dutta the well known Bengali author and late editor of the Tatwobodhini Patrika at*

---

[৭৭]মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

[৭৮]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃ. ৪৫৪।

[৭৯]নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

his garden house at Bally on thursday night last (27th May, 1886). By his death the Hindu community have sustained a heavy and irreparable loss, and a gap has been caused in field of Bengali literature, which is not likely to be filled up again." -The Indian Mirror.[৮০]

[৮০] ঐ।

চতুর্থ অধ্যায়
অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন দর্শনের পরিবর্তন

অক্ষয়কুমার দত্ত একজন সত্য সন্ধানী ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর পরিশ্রম ও জ্ঞানতৃষা তাঁকে মুক্ত মানুষ হতে সাহায্য করেছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর কর্মজীবন শুরু হলেও তাঁর জ্ঞান অন্বেষণের প্রচেষ্টায় কোন ছেদ পড়েনি। অক্ষয়ের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর 'জীবন দর্শনের' পরিবর্তন ঘটেছিল, যা সহজেই লক্ষণীয়। বর্তমান গবেষক এই অধ্যায়ে তাঁর জীবনের দার্শনিক পরিবর্তনগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। জীবনের প্রারম্ভে পারিবারিক উদারতা-ধর্মভীরুতার পর্ব পার করে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন।

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কখনই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না, এমনকি খ্রিষ্টান প্রভাবও তেমন কাজ করেনি। কিন্তু তাঁর জীবন দর্শনে ইউরোপীয় চিন্তার গভীর প্রভাব ছিল। রামমোহন রায়ের আদর্শে ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে তিনি *ব্রাহ্মধর্ম* গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কখনও পৌত্তলিকতা, বেদের অভ্রান্ততা, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলি মানেননি। এবং তাঁর মতামতগুলি দেবেন্দ্রনাথকে (যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে) মানতে বাধ্য করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেনের মতন ব্যক্তিত্বরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন না করলেও তিনি মতবাদিক বিতর্ক চালিয়ে গিয়েছিলেন যা তাঁকে ব্রাহ্ম থেকে নিরীশ্বরবাদী হতে সাহায্য করেছিল।

(ক) ব্রাহ্মধর্ম-ব্রাহ্মসমাজ-ব্রহ্মবাদ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *"আত্মজীবনী"*তে (১৮৪৯ সাল) লিখেছেন, *'ব্রাহ্ম'* শব্দটি রাজা রামমোহন রায়ের সৃষ্টি নহে। সংস্কৃতে এ শব্দটি অতি পুরাতন, এবং ধর্মশাস্ত্রসকলে বহুল ভাবে ব্যবহৃত। রামমোহন রায়ের সময়ে এ শব্দটি সাধারণ লোকে না জানিলেও শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা জানিতেন। শাস্ত্রসকলে ইহার অর্থ, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়, বা (দেবতা) ব্রহ্মার সম্বন্ধীয়। কিন্তু সংস্কৃতে ইহা মানুষের ধর্ম্মমতের বা ধর্ম্মসাধনপ্রণালীর পরিচায়ক বিশেষণরূপে (অপেক্ষাকৃত আধুনিক তন্ত্রশাস্ত্র ভিন্ন) কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই।

বাংলা ভাষায় 'একমাত্র ব্রহ্মের উপাসক' অর্থে মানুষের বিশেষণরূপে এ শব্দটিকে রামমোহন রায়ই প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তাঁহার উক্তিতে তিন স্থানে এই অর্থে 'ব্রাহ্ম' কথাটি আছে। যথা- "প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না" (মান্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা); "সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি তাবৎকালে ব্রাহ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান ছিল" (কবিতাকারের সহিত বিচার); "সর্ব্বকালে মৌন ও নির্জ্জনে থাকা, ইহা ব্রাহ্মের নিত্য ধর্ম্ম নহে" (ঐ)। 'ব্রাহ্ম' শব্দটি রামমোহন রায়-কৃত এই নূতন ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ যে ব্রাহ্মোপাসক হইয়া এবং প্রতিমাদির পূজা হইতে বিরত হইয়া 'ব্রাহ্ম' এই বিশেষ নামে চিহ্নিত হইবেন, ইহা রামমোহন রায়ের কল্পনার অন্তর্গত ছিল।[১]

রামমোহন রায় মনে করতেন ব্যক্তি বিশেষকে 'ব্রাহ্ম' নামে পরিচিত করানোর দরকার। অর্থাৎ ব্যক্তিবর্গ ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হোক। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা ও ব্রত প্রবর্তন করে রামমোহনের এই চিন্তাকে বাস্তবে রূপদান করেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আন্দোলনে রামমোহনের পরবর্তীকালে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি রামমোহনের আদর্শ-

[১]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ১৯৬০, পৃ. ৩১৬।

চিন্তাধারাকে জনসমাজে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রাণপুরুষ।

'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি রামমোহন রায়ের সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার সময়ে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইত। সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পরে, যে সময়ে 'ব্রাহ্ম' কথাটি প্রবল হইয়া উঠিল, তখন হইতে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' এই নামটিও ঐ ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত নামরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল। ইহাও অসম্ভব নহে যে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি দেবেন্দ্রনাথেরই সৃষ্ট।[২] 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' কথার অর্থ, 'ব্রাহ্মের অবশ্য প্রতিপালনীয় ব্রতসমষ্টি'। দেবেন্দ্রনাথ 'ধর্ম্ম' বলিতে বুঝতেন, সারা জীবনের জন্য নিজেকে কতকগুলি সঙ্কল্পে বাঁধা; 'ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ' বলতে বুঝিয়েছেন, বিধিপূর্ব্বক আচার্য্যের কাছে সঙ্কল্প গ্রহণ। অক্ষয় আসলে এভাবেই জীবনকে বাঁধতে চেয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখছেন, "পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্মলাভ হয় না। ধর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ।" অর্থাৎ, যাঁহারা পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন বুঝিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম কি, এবং ঈশ্বরের জন্য তাঁহাদিগকে কিরূপ ধর্ম্মনিয়মে আপনাদিগকে বাঁধিতে হইবে। এবং ঈশ্বরকে লইয়াই ধর্ম্ম, ("ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না") ইহা সত্য বটে, কিন্তু ধর্ম্ম দিয়া অর্থাৎ সঙ্কল্পের বাঁধন দিয়া আপনাকে না বাঁধিলে কেহ ঈশ্বরকে পায় না (ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্মলাভ হয় না")।[৩]

---

[২]তদেব, পৃ. ৩১৭।

[৩]তদেব, পৃ. ৩১৭ ও ৩১৮।

১৮৪৭ সালের ২৮শে মে (১৭৬৯ শকের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ) তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে, 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম'-এর পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি গ্রহণ করা হয়। ১৮৪৯ সালে দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীটি প্রকাশিত হওয়াতে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়টি সকলের কাছে বহুল প্রচারিত হতে থাকে।

রামমোহন রায়কে ভারতের 'সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন'-এর জনক বলা হয়। আমরা দেখতে পাই, তিনি একদিকে সংগঠন তৈরি করেছেন *'একেশ্বরবাদ'* প্রচারের জন্য; অন্যদিকে সেই সংগঠনকে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার, কু-রীতির বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য যা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে এক অনবদ্য কৃতিত্বের দাবী রাখে।

২০শে অগাস্ট ১৮২৮ সালে (মতান্তরে ১৮২৯ সাল) রামমোহন রায় 'ব্রাহ্ম-সভা' নামে একটি নতুন ধর্মীয় সমাজ প্রবর্তন করেন, পরবর্তীকালে (১৮৪৩ খ্রিঃ/১৮৩০ সালে) যা *'ব্রাহ্মসমাজ'* নামে পরিচিত হয়। এই ব্রহ্ম-সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মের সংস্কার ও একেশ্বরবাদ প্রচার। এই নতুন ব্রহ্ম-সভা অনুসৃত ধর্মমতকে বেদ ও উপনিষদ প্রচারিত মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অন্য ধর্মগুলির মতামতও এই ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র ছিল সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের উন্মেষ, মূর্তি পূজার বিরোধিতা এবং সতীদাহ প্রথার মত সামাজিক কুপ্রথাগুলির অনিষ্টকরতা উদ্‌ঘাটন (সত্যরূপ উদ্‌ঘাটন)।[৪]

আসলে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রামমোহন পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা করতে চেয়েছিলেন। বেদান্ত ছিল তাঁর ধর্ম সাধনার মূল ভিত্তি। ঔপনিবেশিককালে এইভাবে তিনি কেবলমাত্র যথার্থ রূপে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি খ্রিষ্টান মিশনারিদের আক্রমণের হাত থেকেও হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ছিল একটি

[৪]বিপন চন্দ্র, *আধুনিক ভারত*, ২০১৩/বি, পৃ. ১৮২।

অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান; হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান- সকল ধর্মের মানুষের জন্যই এর দ্বার উন্মুক্ত ছিল। ব্রাহ্মরা প্রতিমা পূজাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা কোনরকম পৌত্তলিকতা বা ধর্মীয় গোঁড়ামিতেও বিশ্বাস করতেন না। রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের অধিকার পত্রে নিষেধ করে গেছেন, যে সমাজের মধ্যে কোনরকম ছবি বা মূর্ত্তি রাখা যাবে না।[৫] আমরা দেখতে পাই একদা দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্নকে জানিয়েছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া ধর্ম বিরুদ্ধ হয়েছে।[৬]

১৮৩৯ সালের ৬ই অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্বরঞ্জিনী সভা স্থাপন করেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সভার নাম পরিবর্তন করে *'তত্ত্ববোধিনী সভা'* রাখেন। ১৮৩৯ সালে (১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন) তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। (তিনি লিখেছেন) ইহার উদ্দেশ্য, আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম; বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা ছিল না।[৭]

একদিন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অক্ষয় দত্তকে সঙ্গে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা দেখতে যান। সেখানে দেবেন্দ্রনাথের সাথে অক্ষয়ের সাক্ষাৎ হয়। অক্ষয়ের সাথে কথাবার্তায় ও আলাপ-পরিচয়ে দেবেন্দ্র বাবু খুবই সন্তোষ ও আনন্দিত হন। ১৭৬১ শকের শীত ঋতুতে (১২৪৬ সাল, ১৮৩৯ সালের ডিসেম্বরে) মাত্র উনিশ বছর বয়সে (অক্ষয় দত্ত) এই সভার সদস্য হন।[৮] দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শ, তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যপদ ইত্যাদি বিষয়গুলি সুদূর গ্রাম থেকে আসা

---

[৫]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪-৩০৫।

[৬]তদেব, পৃ. ৩০৫।

[৭]তদেব, পৃ. ২৫ ও ২৬।

[৮]নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, *অক্ষয় চরিত*, ১২৯৪, পৃ. ১৬।

অক্ষয়কে কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত *নব্য ভদ্রলোক* সমাজের সদস্য করেছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সাথে অক্ষয়ের কোন মিল ছিল না—পরিবার, আর্থিক অবস্থা, না শিক্ষা-দীক্ষায়।

২১শে ডিসেম্বর ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মধর্ম ব্রত স্থাপিত হয়। তিনি (দেবেন্দ্রনাথ) সেই দিনে আচার্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কাছে ব্রাহ্মধর্ম-ব্রত গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমার প্রভৃতি তত্ত্বসভার (তত্ত্ববোধিনী সভা) সদস্যরাও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার ৫০০ জন সদস্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণের পরপরই। দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্য—'ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নতুন ব্যাপার। আগে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হল।' তিনি রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। এবং সেজন্য বলেছেন 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে আমরা ব্রাহ্ম হলাম, এবং ব্রাহ্মসমাজের সার্থক্য সম্পাদন করলাম।'[৯]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম ভাগ দ্বিতীয় কল্প ৪৫ সংখ্যা, বৈশাখ ১৭৬৯ শকাব্দে দেখা যায় একটি বিজ্ঞাপনে—যা ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৯ শক শুক্রবার [১৮৪৭ মে ২৮] প্রস্তাব হয়ঃ "১৭৬৮ শকের নিয়ম পত্রের প্রথম সংখ্যক নিয়মে যে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম' এই বাক্য আছে তাহার পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' এই শব্দ হয়।"[১০]

রামমোহনের দেশত্যাগ ও মৃত্যুর (ব্রিস্টল, ১৮৩৩ সাল) পর ব্রাহ্মসমাজ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পরে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলে ব্রাহ্ম আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। তাঁর চেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ নানা স্থানে বিস্তৃত হয়। নানা নিয়মকানুন ও রীতির প্রবর্তন করে তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনকে একটি

[৯]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

[১০]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, ২০০৯, পৃ. ৭৬।

সংগঠিত ধর্মীয় রূপ দেন। তাঁর আমলে ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষা বিস্তার ও বিধবা-বিবাহ প্রচলন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ ও অন্যান্য সামাজিক কুসংস্কার দূর করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল।

এছাড়া (ঐসময়) তত্ত্ববোধিনী সভা ও তার মধ্যে দিয়ে রামমোহনের ধর্মচিন্তাকে ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়ে প্রচার করার উদ্যোগেও ব্যাপক সাড়া মিলেছিল। ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভা একত্রীকরণের দুই বছরের মধ্যে, ১৮৪৪ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা কলিকাতায় একটি বিখ্যাত সভা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে মৃতকল্প ও বিস্মৃত ব্রাহ্মসমাজকে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার আশ্রয় দান করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিলেন.....।[১১] ১৮৫৩ সালের মে মাসে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন।[১২]

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের মাধ্যমে বাংলায় এক নতুন ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিল। যা পরবর্তীকালে আরও বলিষ্ঠ নেতৃত্বদের পেয়ে শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছিল। দেবেন্দ্রনাথের, দুটি সংগঠনের একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত যে একেবারেই সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের একতা নষ্ট হয়ে যায়। ব্রাহ্মসমাজ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু, উপাসনা পদ্ধতি, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে বিভক্ত হতে থাকে।

১৮৫৮ সালে তরুণ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ সাল) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করলে ব্রাহ্ম আন্দোলন নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এবং নারী শিক্ষার প্রসার, নারী স্বাধীনতা, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ ও শ্রমিক কল্যাণের পক্ষে দেশে এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, ব্রাহ্ম আচার্যদের উপবীত গ্রহণ ও সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলায় মন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতি প্রশ্নে কেশবচন্দ্র

[১১]তদেব, পৃ. ৩০৩।

[১২]তদেব, পৃ. ৩৯৮।

সেনের নেতৃত্বাধীন তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বিরোধ বাধায় ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁরা *'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'* গঠন করেন (১৮৬৬ সাল) এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ *'আদি ব্রাহ্মসমাজ'* নামে পরিচিতি লাভ করে।

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, অসবর্ণ বিবাহ, সুলভ সাহিত্য প্রচার, নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা বিস্তার, পতিতা মেয়েদের উদ্ধার ও নানা জনহিতকর কার্যাবলীর পক্ষে এবং বাল্যবিবাহ, মদ্যপান ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে কয়েকটি নীতিগত প্রশ্নে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের' অভ্যন্তরে প্রবল বিতণ্ডার সূচনা হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্মরা ১৮৭৮ সালের ১৫ই মে *'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'* প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮০ সালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে কেশবচন্দ্র তাঁর 'নববিধান' ঘোষণা করেন এবং তাঁর ব্রাহ্মসমাজ *'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ'* নামে পরিচিত লাভ করে। কালক্রমে কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত 'নববিধান' তার প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলে এবং 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'-এর নেতৃত্বেই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজ চলতে থাকে।

ভারতীয় জনজীবনে ব্রাহ্মসমাজের অবদান অনস্বীকার্য। কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বুকে ব্রাহ্মসমাজই প্রথম আঘাত হানে। নারী স্বাধীনতা ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অসবর্ণ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন, শিক্ষা বিস্তার, হরিজন উন্নয়ণ, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ, মদ্যপান নিবারণ, পর্দাপ্রথা রদ প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবেই ইংরেজ শাসকরা বিখ্যাত *'তিন আইন'* (১৮৭২ সাল)[Act of 1872] পাশ করে। যার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ বন্ধ এবং বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ করা হয়। ব্রাহ্মদের আন্দোলনের ফলেই ধীরে ধীরে

হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলি দূর হতে থাকে। তাঁরা নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য ঢাকা শহরে *ব্রাহ্ম ইডেন ফিমেল স্কুল* প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(খ) অক্ষয় দত্তের মতাদর্শ পরিবর্তনের ধাপগুলি

বৃষ্টিপাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন হয়? আমাদের মতনই এই প্রশ্নের বিভিন্ন কাল্পনিক উত্তর অক্ষয় দত্ত তাঁর ছোটবেলায় শুনেছিলেন। তাঁর এই ভুল ধারণাগুলি ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারি (স্কুলে)-তে জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) ও ভূগোল পড়ে দূর হয়েছিল। 'হার্ডম্যান জেফ্রয় নামে একজন ইংরাজ তখন গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলের কর্তৃপক্ষীয় ছিলেন। জেফ্রয় সাহেব স্কুলেই থাকতেন। অক্ষয় সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গ্রিক, লাটিন, হিব্রু ও জার্মাণ ভাষা অধ্যয়ন করতে যেতেন।'[১৩] এই 'অধ্যয়ন'-এর সবটাই তাঁর ক্লাসে পড়ার *বাইরের পড়া* ছিল। তখনকার দিনে জার্মান (ভাষা) না জানলে বিজ্ঞানচর্চা করা যেত না। তাই তিনি জার্মান শিখতে আগ্রহী হন। অল্পবিস্তর ফরাসিও শিখেছিলেন।

ক্রমে তাঁর বিশেষ আগ্রহ জন্মায় গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যের প্রতি। আলেকজান্ডার পোপ-এর *ইলিয়াড*-এর ইংরেজি অনুবাদ তাঁর মন কেড়ে নেয়। একই সঙ্গে পড়েন ইংরেজি অনুবাদে ভার্জিল-এর *ইনিড*। অবাক হয়ে লক্ষ করেন, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীগুলির সঙ্গে এইসব প্রাক্-খ্রিস্টীয় ভূমধ্যসাগরীয় ধর্মগুলির কি আশ্চর্য মিল! আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, বর্তমানে ওই সব দেশের মানুষ(রা) আর বহু-দেববাদী ধর্মে বিশ্বাস করেন না, (বর্তমানে) তাদের ধর্ম একেশ্বরবাদী। অর্থাৎ, গল্পগুলো রয়েছে, কিন্তু ধর্মটা উবে গেছে। তার অর্থ, পুরাণের গল্পগুলো

[১৩]নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

গল্পই, সেগুলো মোটেই ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী নয়। ফলে সব রকম পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁর বিশ্বাস চলে যায়। তিনি হয়ে ওঠেন যুক্তিবাদী ও এক-'জগদীশ্বর'বাদী।[১৪]

অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে ছোটবেলা থেকে তাঁর মন যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপের প্রাচীন দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস পড়তে গিয়ে তিনি ক্রমশ অনুভব করেন যে পৌত্তলিকতা (idolatry) এবং বহুদেববাদ (polytheism) আসলে একটি অত্যন্ত প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস, যা পশ্চিমের লোকেরা খ্রিষ্টধর্মের একেশ্বরবাদের মধ্য দিয়ে বহুকাল আগেই কাটিয়ে উঠতে পারলেও সনাতন হিন্দু ধর্ম তা আজও পারেনি। অথচ ভারতেও শঙ্করাচার্য কতকাল আগেই তো ব্রহ্মোপাসনার মত প্রবর্তন করেছিলেন।[১৫]

এ প্রসঙ্গে আমরা তাঁর পিতার মৃত্যুর সময়কার একটি ঘটনার দিকে আলোকপাত করতে পারি। তাঁর পিতা পিতাম্বর দত্তের মৃত্যুর খবরটি তাঁর খুড়তুতো দাদা হরমোহন দত্ত তাঁকে দেন। কিন্তু এই কষ্টের কথা শুনেও তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর দাদাকে বলেন, "ভাই তার আর দুঃখ কি? বস্ত্র পুরাতন ও জীর্ণ হইলে আমরা যেরূপ উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ পিতার সময় হইয়াছে, তিনি গিয়াছেন, তাঁর জন্য আবার দুঃখ কি?"[১৬]

তিনি ধর্মকে আকড়ে ধরতে চাননি, বা ধর্মের মাধ্যমে মুক্তি খোঁজার চেষ্টা করেননি। উনিশ শতক জুড়ে শাসকের প্রত্যক্ষ মদতে খ্রিষ্টান মিশনারিরা দেশ জুড়ে ধর্মান্তরিত করছিল। অক্ষয় দত্ত বলিষ্ঠভাবে খ্রিষ্টান মিশনারিদের এই ধর্মান্তরিত করার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কারণ তিনি তাঁদের এই ধূর্ততা মেনে নিতে পারেননি। এর বিরুদ্ধে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় লিখেছেন। এবং ধর্মান্তর বন্ধ করার বিভিন্ন উপায়ও লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে

---

[১৪]আশীষ লাহিড়ী, *বঙ্গে বিজ্ঞান (উন্মেষ পর্ব)*, ২০১৮, পৃ. ৩৬।

[১৫]অশোক মুখোপাধ্যায়, *ডিরোজিও ও অক্ষয়কুমার দত্ত*, ২০১৩, পৃ. ৩৪।

[১৬]নকুড় চন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

রাখতে হবে, শৈশবে তাঁর ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও ইংরেজ শিক্ষাবিদদের সাথে মেলামেশা দেখে পরিবারের সদস্যরা ভেবেছিলেন, তিনি হয়ত খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে ফেলবেন। কিন্তু তাঁদের এই ভাবনা যে অমূলক ছিল, তা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়।

তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে রামমোহন রায়ের চিন্তার সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হন। রামমোহনের চিন্তা থেকে তিনি নিয়েছিলেন দুটি জিনিস- মানবতান্ত্রিকতা (মানুষকে কেন্দ্র করে চিন্তা-ভাবনা) এবং যুক্তিবাদ। এর বাইরে আর কিছুই তিনি নিতে চাননি বা গ্রহণ করেননি, ধর্মবিশ্বাস তো নয়ই। বরং বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পড়াশুনা করে এবং সেই বিষয়ে লেখার ফলে তিনি ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদেও আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। 'বেদ অপৌরুষেয়' কি না সেই বিষয়ে রামমোহনের বেদ ও বেদান্ত থেকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সাথে তর্ক-বিতর্ক করেন এবং দেবেন্দ্রনাথকে নিজের মতে আনতে সক্ষম হন। বেদ অপৌরুষেয়-এই বিশ্বাস থেকে তিনি ধীরে ধীরে সরে আসেন। তাছাড়া, রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে (গবেষণা সন্দর্ভের ২৪নং পৃষ্ঠা দেখুন) যেভাবে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের বিরোধিতা করে 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিলেন, তাও অক্ষয় দত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

জীব বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২ সাল)-এর *'অরিজিন অফ স্পিশিজ'* (১৮৫৯ সাল) বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অক্ষয়ের জীবনেও তা প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই বিজ্ঞান গবেষক আশীষ লাহিড়ী লিখেছেন, ১৮৫৯ সালে ডারউইনের অরিজিন অব স্পিশিজ বেরোবার পর অনেকেরই মতো তাঁরও চিন্তাভাবনা একটা সুনির্দিষ্ট বাঁক নেয়। অল্পকালের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন-তত্ত্বে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন অক্ষয়কুমার।

.....তিনি অবশেষে হয়ে ওঠেন অজ্ঞেয়বাদী, যাঁরা বলেন, ঈশ্বর থাকার যেমন কোনো প্রমাণ নেই, তেমনি না-থাকারও কোনো প্রমাণ নেই, সুতরাং যুক্তিশাস্ত্রের দিক থেকেও প্রশ্নটা মীমাংসার অযোগ্য। উনিশ শতকের মধ্যপর্বে ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে এ-ভাবনার সঙ্গে নাস্তিকতার প্রভেদ সামান্যই। অক্ষয়কুমার ঘোষণা করুন আর না করুন, তাঁর মধ্যবয়সে তিনি নাস্তিকই হয়ে গিয়েছিলেন।[১৭]

এ বিষয়ে আমরা দেখতে পাব সমাজ মানে না বা প্রচলিত ধারার বিরোধী তাঁর কিছু কর্মকাণ্ড। যেমন-পাঁজি-উল্লিখিত শুভদিনে সবাই যখন পুণ্যস্নান করবার জন্য গঙ্গার দিকে ছুটছে, তখন, বালির মতন রক্ষণশীল জায়গায়, সবাইকে দেখিয়ে তিনি উল্টোদিকে, পাড়ার কোনো পুকুরে চান করতে যেতেন! আবার, ইচ্ছে করে 'বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি অশুভ দিন ও অশুভক্ষণ' দেখে যাত্রা শুরু করতেন।[১৮] আমরা কিশোর ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা (বিদ্যাসাগর)-এর মধ্যেও এরকম চিন্তাভাবনা দেখতে পাই। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্যই হয়ত অক্ষয়ের পরিবারের সদস্যরা তাঁর শেষ জীবনে তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিলেন। তিনি যখন শিরোরোগে পীড়িত, তখন পরিবারের কোনও সদস্যই তাঁর সাথে ছিল না!

তিনি জাত-পাত, জাতের মধ্যে ভেদাভেদও মানতেন না। যা এই সময়ের অন্যান্য ব্রাহ্মদের থেকে তাঁকে পৃথক করেছিল। জাতি ব্যবস্থা যে তিনি মানতেন না তার দুটি উদাহরণ দেখা যাক। *'একবার দমদমা অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যাইবার সময়ে পোদ নামক এক নীচ জাতির হুঁকায় তামাক লইয়া বেড়াইতে যান। প্রত্যাগমন সময়ে অন্য একটি দোকানে গিয়া, তামাক খাইতে*

[১৭]আশীষ লাহিড়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।
[১৮]ঐ

চাহিলে মুদী বলিল-তোমাকে হুঁকা দিব না। তুমি পোদের হুঁকায় তামাক খেয়েছ, তোমার জাত নষ্ট হয়েছে। উহাতে অক্ষয়বাবু তাহাকে বলিলেন-আমি জাত মানি না।[১৯]

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে—দ্বিতীয় ঘটনাটিও নানাদিক থেকে শিক্ষাপ্রদ। অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, *'১২৯০ সালের (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) ৭ই বৈশাখে অক্ষয়বাবুর সহিত ইঁহার গাড়িতে বেড়াইতে যাই। পথের মধ্যে একজন ধাঙ্গড়কে (মেথর) দেখিতে পাইয়া অক্ষয়বাবু গাড়ি দাঁড় করাইতে বলিলেন; এবং তাহাকে সন্নিকটে ডাকিয়া তাহাদের যাবতীয় আচার ব্যবহার ও তাহাদের দেবদেবীর পূজার্চ্চনার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আর দু-একজন ধাঙ্গড় আসিয়া জুটিল। তাহারা নিজ জাতীয় ব্যবহারাদি বর্ণন করিতে লাগিল।.....পরে অক্ষয়বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—ইনি আমাদের দেশে গিয়াছিলেন, ইনি আমাদের ভেদ মারিয়াছেন।*[২০]

অক্ষয়কুমার সত্যিই জাতের 'ভেদ মারিয়াছিলেন'। 'নীচজাতীয়' ধাঙ্গড়দের তিনি ঘৃণা করেননি, নিছক গবেষণার উপাদান বা উপাত্ত বলেও মনে করেননি, মানুষের মর্যাদা দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন।[২১] উনিশ শতকের বাংলায় যেখানে জাতিভেদ-বর্ণভেদ প্রথা প্রবল ছিল তখন তিনি এরকম অবস্থান নিয়েছিলেন। সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন জাত-পাত, বর্ণভেদ না মানার কথা। ফলে তিনি একজন ব্যতিক্রমী সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত হবেন এটাই স্বাভাবিক।

---

[১৯]ঐ

[২০]ঐ

[২১]তদেব, পৃ. ৪৭।

(গ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তর্ক-বিতর্ক

অক্ষয় দত্ত দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে ও উৎসাহে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন (ডিসেম্বর, ১৮৪৩ সাল)। দত্ত বেদের অভ্রান্ততা মেনেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদের প্রচার না করে বিজ্ঞান প্রচারে মন দেন, তা আমরা দেখেছি। দেবেন্দ্রনাথের কাছে প্রধান কথা ছিল, পৌত্তলিকতা বাদ দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম/বেদের প্রচার। কিন্তু অক্ষয়ের কাছে মূল বিষয় ছিল যুক্তিবাদ। যুক্তির সাথে যা মিলবে সেটাই টিঁকে থাকবে, সেটাই প্রচার পাবে এবং সেটাই মেনে চলবেন। শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় একটা ভুল থাকলে বাকিটাও ভুল হতে বাধ্য। তাই তিনি যুক্তির পক্ষ নিয়েছেন, যেটা সঠিক সেটাই মেনে নেবেন। এই যুক্তি মানাই সঠিক নিয়ম।

এর কয়েক বছর পর থেকেই তাঁর সাথে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম উপাসনা ও অন্যান্য বিষয়ে দ্বন্দ্ব হতে থাকে। কিন্তু একের অপরের প্রতি সন্মান-শ্রদ্ধা কখনও কমেনি। ব্রাহ্মসমাজে অক্ষয়ের ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন।'[২২] ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গের এই প্রহরীকে তর্কে-যুক্তিতে পরাজিত করতে পারেননি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা। উপরন্তু তাঁরা অক্ষয়ের কাছে পরাস্ত হয়ে মেনে নিয়েছিলেন অক্ষয়ের দুর্ভেদ্য যুক্তিগুলি।

অক্ষয় *বেদ অভ্রান্ত নয়* এই বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে থাকেন। তার ফলে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে বেদান্ত নির্ভরতা ত্যাগ করেন ও ব্রাহ্মসমাজ বেদের প্রভাব মুক্ত হয়। অক্ষয় এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসুর সহযোগিতা পাবেন বলে আশা করেছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯ সাল) দেবেন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়েছিলেন। রাজনারায়ণের মতন শিক্ষিত-সুপণ্ডিত

[২২]তদেব, পৃ. ৩০।

ব্যক্তির এই ভূমিকার জন্য ও তাঁর কাছ থেকে কোনরকম সহযোগিতা না পেয়ে অক্ষয় আশাহত হন। তবুও একার উদ্যমে দেবেন্দ্রনাথের সাথে তর্ক-বিতর্ক করেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী পরিষ্কার করে সে-কথা লিখেছেন—"ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধর্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। .....১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয়বাবুর অবলম্বিত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্তবাদ পরিত্যাগ করিলেন।"

মহেন্দ্রনাথ রায় নির্জলা ভাষায় লেখেন, অক্ষয়কুমারের 'বুদ্ধি-শক্তি ও তর্ক-শক্তি অতিশয় প্রখর; সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি রাজনারায়ণ বসু অথবা অন্য কেহই ইঁহার কথা খণ্ডন করিতে পারিতেন না।' অক্ষয়কুমারের অকৃত্রিম ভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন যে 'প্রথমে মতদ্বৈধ হলেও অক্ষয়কুমার দত্তই দেবেন্দ্রনাথের মনে বেদবিচার ও বেদ-অন্বেষণের প্রেরণা দিয়েছিলেন।'[২৩] অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মতে, সম্ভবত অক্ষয়ের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ব্রাহ্ম গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর বৌদ্ধিক বিদ্রোহ। অধ্যাপক সরকার খুবই কম কথায় ব্রাহ্ম সংগঠনে বা ব্রাহ্মধর্ম মতবাদে অক্ষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন।[২৪]

আরও ঘটনা আছে। তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যেই অক্ষয় দত্ত, রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র রামমোহনের অনুসরণে *আত্মীয় সভা* (১৮৫২ সাল) নাম দিয়ে আর একটি সভার পত্তন করেন। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'র অনুকরণেই এর নামকরণ হয়।

---

[২৩]আশীষ লাহিড়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

[২৪]Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, 1979, p. 34.

দেবেন্দ্রনাথকে এর সভাপতি ও অক্ষয়কুমার দত্তকে তার সম্পাদক করা হয়েছিল। সভার বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন যুক্তিবাদী প্রশ্নশীল। তাঁরা অনেক সময় ভোটাভুটি করে ধর্মীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসার সমাধান করতেন। সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা দেবেন্দ্রনাথের প্রশ্নাতীত নেতৃত্বের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর উপর এই সভার অনেকে দাবী করতে শুরু করলেন, প্রার্থনা যদি করতেই হয় তাহলে সেটা বাংলায় কেন করা যাবে না? ঈশ্বর কি সংস্কৃত ছাড়া আর কোনো ভাষা বোঝেন না? একথা নিশ্চয়ই বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না যে এই ধরনের প্রশ্নগুলিই আসলে যে কোনো ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট ধ্বংসাত্মক।[২৫]

আত্মীয় সভার সভ্যদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক প্রশ্নগুলির আলোচনা করা; কিন্তু ক্রমশ ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্বগুলিও তাদের আলোচনার অন্তর্গত হয়ে পরে।[২৬] সভায় তাঁদের ভোটাভুটির বিষয়টি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হাস্যকর মনে করলেও তাঁদের ভূমিকাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। সামাজিক প্রশ্নগুলি আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনিই যে ব্রাহ্মধর্ম তাঁরা জীবনে-কর্মে ধারণ করতে চেয়েছিলেন তার সংশোধন করতেও তাঁরা পিছপা হননি।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, ব্রাহ্মধর্মকে (অবিভক্ত) বাংলাদেশের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ও তার সহযোগীদের সাথে হয়ত তাঁদের বিতর্ক-বিতণ্ডা ছিল, কিন্তু জ্ঞানদীপ্ত এই মানুষদের এই সভার ভূমিকা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

---

[২৫]অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

[২৬]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ব্রাহ্মধর্ম্ম* গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে রাখালদাস হালদার (আত্মীয় সভার সদস্য) *'ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান আন্তরিক অবস্থা-বিষয়ক পর্য্যালোচনা'* নাম দিয়া এক আবেদন লিখিয়া দেবেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেন। তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি লেখেন, 'তাহা [ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ] যে-প্রকার ভাষায় লিখিত, তাহা এইক্ষণকার পক্ষে সুশ্রাব্য নহে। প্রাচীন কালের মুনিঋষিরা যে-প্রকার অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন, আমরা সে প্রকারে অবস্থিত নহি। সুতরাং পরমেশ্বর বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশের যে প্রকার রীতি তাঁহাদের ছিল, আমাদের সেরূপ নহে।'

.....(ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত) উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি লেখেন, 'এক পদ্ধতিই চিরকালের নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে। ঈদৃশ নিয়মের এক দোষ এই যে, দুর্ব্বল উপাসকেরা অমনোযোগী হইয়া পড়ে। উপাসনাকালীন সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। .....যদি কেহ বলেন যে, যে-সকল সংস্কৃত বচন নির্দিষ্ট আছে, তাহার অর্থ জানিলেও তো হইতে পারে, তদ্বিরুদ্ধে আমাদের উত্তর এবং জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহার প্রয়োজন কি?' .....আবেদনের উপসংহারে লিখিতেছেন, 'আমাদের প্রস্তাব এই যে, ব্রাহ্মেরা .....সংস্কৃতে শ্রুতিপাঠ ও ব্রাহ্মধর্ম্মপাঠের পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষায় পরমেশ্বরের সংক্ষেপ উপাসনা করিবেন। পরে দেড় বা দুই ঘণ্টা কাল পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ ও আপনারদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয়ে কথোপকথন করিবেন।"[২৭]

ব্রাহ্মধর্মে লিখিত উপাসনার ভাষা বিষয়ে আত্মীয় সভার সদস্যদের অভিযোগের অন্ত ছিল না। তাই আমরা দেখি, ডিসেম্বর ১৮৫৫ সালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে ও সংস্কৃত মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাখালদাস হালদার অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[২৮] সংস্কৃত মন্ত্র বাদ দিয়ে বাংলা ভাষায় উপাসনা হোক, এটিই তাঁদের ইচ্ছা ছিল। কারণ অক্ষয়কুমার ও রাখালদাস মিলে

[২৭]তদেব, পৃ. ৪১২ ও ৪১৩।

[২৮]তদেব, পৃ. ৪১২।

খিদিরপুরে যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন (১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩ সাল), সেখানে বাংলায় উপাসনা হত।[২৯]

এমনকি "অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের উপরেও সন্তুষ্ট ছিলেন না; কারণ, ঐ গ্রন্থের প্রচারে বেদ-উপনিষদের প্রভাব ব্রাহ্মসমাজের উপর সমানই রহিয়া গেল। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে এক বক্তৃতায় বলেন যে 'ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র; গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কঁত [Comte] যে-কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র।' মূল প্রবন্ধে লাপ্লাস ও কঁতের নাম ছিল; এই দুইটি নাম নাস্তিকের বলিয়া (তত্ত্ববোধিনী) পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সময় ব্রাহ্মসমাজের কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা উঠাইয়া দেন; তাহাতে অক্ষয়বাবুর বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক 'ডীজম্' করিবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৩০]

আসলে, দেবেন্দ্রনাথের *ব্রাহ্মধর্ম্ম,* যা বেদান্তের স্থান দখল করেছিল, তাঁর নিজের হিন্দু পক্ষপাতিত্ব (bias) ও অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদের মধ্যে এক আপস ছিল।[৩১] এই গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ শুদ্ধ মনে ঈশ্বরের কাছে মনের প্রার্থনা নিবেদন করলে আশাজনক ফললাভ হতে পারে বলে মত প্রকাশ করেছেন। অথচ সেই একই সময়ে হিন্দু হস্টেলের ছাত্ররা অক্ষয়ের কাছে ঈশ্বরকে *'প্রার্থনা'* করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি একটি সরল সমীকরণ বলে এই প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন,

---

[২৯]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮।

[৩০]তদেব, পৃ. ৪১২।

[৩১]David Kopf, *The Brahmo Samaj and the shaping of the Modern Indian Mind*, 1979, p. 106.

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

সুতরাং, প্রার্থনা = ০ (শূন্য);

কৃষকরা পরিশ্রমের দ্বারা শস্য উৎপাদন করেন। পরিশ্রমের সাথে প্রার্থনা করলেও সেই একই পরিমাণ শস্যই উৎপাদিত হয়। তাই প্রার্থনার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ, তাঁর মতে, প্রার্থনার কোন ফল নেই।[৩২] প্রার্থনা ও কাজ আসলে বিশ্বাস ও অনুশীলনের বিষয়। অনুশীলন করলে কাজ হয় বা ফল পাওয়া যায়। কারণ এর বাস্তবতা বিদ্যমান। তাছাড়া প্রার্থনার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। আধ্মাত্যবাদীদের মতে প্রার্থনার একটি অলৌকিক সম্পর্ক বিদ্যমান। আসলে বিশ্বাস ছাড়া প্রার্থনার কোন বাস্তব ভূমিকা নেই। আর এই জন্যই প্রার্থনা ভাববাদ রূপে পরিচিত।

এই সমীকরণ নিয়ে তৎকালীন কলিকাতায় হৈচৈ শুরু হলে তিনি এই যুক্তি যে সহজ-সরল ভাবনার পরিচায়ক তা ব্যক্ত করেছিলেন। এবং এই যুক্তি প্রমাণ করে তিনি কতটা যুক্তিবাদী ছিলেন। প্রার্থনাকে অকেজো বলে নাকচ করলে প্রার্থনার লক্ষ্য যে দেব-দেবী বা পরমেশ্বর তাকে আর প্রার্থনা পাওয়ার উপযুক্ত মনে করা হয় না। এভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হল। প্রার্থনার কার্যকারিতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুমিত চক্রবর্তী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আশিস লাহিড়ী ও অন্যান্য গবেষকদের উল্টো মত দিয়েছেন—অক্ষয় দত্ত প্রার্থনার ফল শূন্য সেটা কার্য বিশেষে বুঝিয়েছেন বা ভিন্ন অর্থে বুঝিয়েছেন।[৩৩]

---

[৩২]মহেন্দ্রনাথ রায়, বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত, ১২৯২, পৃ. ৯২-৯৩।

[৩৩]Sumit Chakrabarti, *Local Selfhood, Global Turns: Akshay Kumar Dutta and Bengali Intellectual History in the Nineteenth Century*, pp 32-33 & 80-81.
অধ্যাপক চক্রবর্তী দুই বিজ্ঞান লেখক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আশিস লাহিড়ীর রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ যথাক্রমে কামারের এক ঘা ও বঙ্গে বিজ্ঞান (উন্মেষ পর্ব) লক্ষ্য করলে দেখতে পারতেন এই বিষয়ে আরও গভীর রচনা।

আমরা জানি যে, চার্লস ডাল (Charles Dull) নভেম্বর ১৮৫৫ সালে তাঁর মিশন শুরু করতে কলকাতায় এসেছিলেন, তিনি কালবিলম্ব না করে দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ব্রাহ্মদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। পক্ষান্তরে, দেবেন্দ্রনাথের "বিদেশীদের সন্দেহ করা"-র প্রবণতা ডালকে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, তিনি নিজেকে ব্রাহ্মদের মিটিং ও অনুষ্ঠানগুলিতে স্বাগত মনে করতেন না, এবং পরে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের সভায় "বাক্ স্বাধীনতা (দেন না) ও আলাপ-আলোচনা" করতে দেন না বলে দায়ী করেছিলেন।[৩৪]

বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার (দত্তের পরবর্তী সময়ে) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্মতত্ত্বের চেয়ে বিধবা বিবাহ প্রচারেই বেশি উৎসাহ প্রকাশ করে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অথচ রক্ষণশীল লোকদেরকে বিরক্ত করে তোলেন। এই সব দেখে দেবেন্দ্রনাথের মনে এই প্রশ্ন উঠল যে, তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা যদি ব্রাহ্মসমাজের কাজের সহায়তা না হয়, তবে অর্থব্যয় করে তাঁকে জীবিত রাখার অর্থ কি? (তাই) ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা তুলে দেওয়াই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।[৩৫] এভাবে মতবাদিক দ্বন্দ্ব শেষ করতে চেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ!

(ঘ) অক্ষয় দত্তের রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?

আমরা ইতিমধ্যে জানি যে, তিনি প্রথমে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ঐ পত্রিকার মূল লেখক তিনিই ছিলেন। পরে সম্পাদক হিসেবে তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি আমরা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দেখতে পাই। এছাড়া তিনি অনেকগুলি বইও লিখেছেন। সেই রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে

[৩৪]David Kopf, Ibid, 1969, pp. 15-16.

[৩৫]দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯।

তাঁর চিন্তা-ভাবনার, ধর্ম ভাবনার কোন পরিবর্তন ধরা পরে কি না সেটা দেখা যাক। বিদ্যাদর্শনের বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি যা এখনও উপলব্ধ, সেগুলি পড়লেই (যা আগের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) আমরা দেখতে পাই তিনি কতটা সমাজ সচেতন প্রাবন্ধিক/লেখক ছিলেন। তাঁর সামাজিক সচেতন মনন অনেক আগে থেকেই তৈরি ছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। পত্রিকার শুরুর সংখ্যাগুলিতে আমরা কোনরকম বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা পাই না। সেখানে ঈশ্বর উপাসনা বিষয়ক লেখাই রয়েছে। এরপর পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় জীব/প্রাণী বিদ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন লেখা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন রচনা/প্রবন্ধ দেখতে পাই। আসলে পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধতেই এই পরিবর্তন ফুঁটে উঠেছিল। তিনি পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন বলেই তাঁর ইচ্ছামত লেখা প্রকাশ করতেন সেরকমটি নয় (পেপার কমিটির কথা আমরা আগেই জানি)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন দিককে উন্মুক্ত করেছিলেন।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৪-১৯১৯ সাল) সুলিখিত ও সুবিখ্যাত "ফলিত জ্যোতিষ" প্রবন্ধ রচনার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অক্ষয় দত্ত ১৮৫১ সালে তত্ত্ববোধিনীর পাতায় লেখেন, *"সুগ্রহ কুগ্রহ এই দুই শব্দের অর্থ নিতান্ত অলীক। .....মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহসকল প্রস্তরাদির ন্যায় জড় পদার্থময়। বুদ্ধিমান জীবের ন্যায় তাহাদের সঙ্কল্প বিকল্প, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুগ্রহ নিগ্রহ থাকা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আর যদি তাহাদের এই গুণ থাকিত, তাহা হইলেও মর্ত্যলোকস্থ মনুষ্যদিগের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? ....গ্রহের তুষ্টিরুষ্টিতে লোকের সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়, একথা সদ্বিদ্যাশালী বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট কহিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।"*[৩৬]

[৩৬]অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

গবেষক ও নিবন্ধকাররা মনে করেন যে, তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় *"পরমেশ্বর"*-এর উল্লেখ করেছেন যা ছিল নিজের ইচ্ছার বাইরে ও তাতে দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা-প্রভাব ছিল বেশি। নিজের কর্মচারীর প্রতি দেবেন্দ্রনাথ এক প্রকার চাপ সৃষ্টি করে এই কাজগুলি করেছিলেন। এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার "পেপার কমিটি"র সদস্যদের চিন্তা-ভাবনার প্রতি তাঁর অসন্তোষ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। তিনি এই পেপার কমিটি সম্পর্কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, *"কতগুলি নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হয়েছে। এদেরকে এই পদ থেকে তাড়িয়ে না দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নেই।"*[৩৭]

আজকের দিন হলে, তাঁর লেখায় কোনও ঈশ্বরভক্তি প্রদর্শনের দরকার হত না। এইসব তিনি লিখেছেন ১৮৫০-এর দশকে। তখন কেশব সেন হয়ে রামকৃষ্ণের উত্থান ঘটছে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন মধ্যগগনে বিরাজ করছেন এবং "সাম্য" থেকে "ধর্মতত্ত্ব"-এর দিকে ঝুঁকছেন। ফলে পাঠকের কাছে পৌঁছনোর জন্য তাঁকেও একটু আধটু সেই পরমেশ্বর বুড়ি ছুঁতে হয়েছে। অথচ সে এমন নিপুণ ছোঁয়া যে আপনি যখন তাঁর একটা যে কোনও প্রবন্ধ পড়বেন, টেরই পাবেন না, পরমেশ্বর কখন এল আর কখন বেরিয়ে গেল! রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন, "অক্ষয়বাবু সকল পুস্তকেই 'পরম কারুণিক', 'পরম পিতা', 'পরাৎপর পরমেশ্বর', 'অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা' প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।'[৩৮]

প্রবন্ধকার আশীষ লাহিড়ী বলেছেন, অক্ষয়ের জীবনের প্রথমদিকে জর্জ কুম্ব (১৭৮৮-১৮৫৮ সাল)-এর প্রভাব ছিল। তাই তিনি "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" লিখেছিলেন।[৩৯] এরপর আমরা তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বলে চিনব যখন তিনি বিভিন্ন তর্ক-বিতর্ক

---

[৩৭]আশীষ লাহিড়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

[৩৮]রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পৃ. ২৫৪।

[৩৯]আশীষ লাহিড়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

করছেন ও প্রশ্ন তুলছেন। শেষে তিনি একজন নিরীশ্বরবাদী মানুষে পরিণত হন, যাঁর উত্তম প্রকাশ আমরা "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"-এ দেখতে পাই।[৪০]

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের সাথে অক্ষয়ের তর্ক-বিতর্ক দীর্ঘদিন চলেছিল। ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ রাজনারায়ণ বসু একবার ১৮৫০ সালের মাঘোৎসবের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—"যে পর্যন্ত তোমার (অক্ষয়ের) চরিত্র শোধন না কর-সে পর্যন্ত তুমি কেবল এক গ্রন্থ বাহক চতুষ্পদ তুল্য।" প্রশ্ন হল, কী তাঁরা চেয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে? চরিত্রের কী কী দোষ তাঁকে শোধন করতে বলা হচ্ছিল? 'গ্রন্থবাহক' বিশেষণটিরই বা রহস্য কী? বেশি বেশি করে বই যাঁরা পড়েন এবং পড়তে ভালোবাসেন, তাঁদের অনেকে স্নেহচ্ছলে বা গাত্রজ্বালায় 'গ্রন্থকীট' বলে রসিকতা বা বিদ্রূপ করে থাকেন। এটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এখানে স্বল্প-পরিচিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে-- 'গ্রন্থবাহক'। কী এর তাৎপর্য?

রাজনারায়ণের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খারাপ ছিল না। আজীবন বন্ধুত্ব ছিল তাঁদের মধ্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ লালিত অন্ধ (ধর্মীয়) বিশ্বাসে (অক্ষয় দত্তের জন্য) আঘাত পড়ায় তাঁর ভেতরের অসন্তোষ চেপে রাখতে পারেননি। বলতে চেয়েছেন, 'তুমি পিঠে করে অনেক গ্রন্থ বহন করে চলেছ; কিন্তু সব গ্রন্থের সার যে ঈশ্বরভক্তি, তা তুমি অন্তরে গ্রহণ করতে পার নি। অথচ, বইয়ের ভার এত বেশি যে তোমাকে শুধু দুপায়ে ভর দিয়ে নয়, দুই হাতেও ভর দিয়ে চলতে হচ্ছে।' মন্তব্যটিতে যুক্তিবাদীর বিরুদ্ধে সৌজন্যের কিঞ্চিৎ ঘাটতি থাকলেও ভক্তিবাদীর মর্মবেদনা প্রকাশে তা একেবারে অনবদ্য।[৪১]

[৪০]অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

[৪১]অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৯।

এই সম্ভাষণের গূঢ়ার্থ বুঝতে হলে প্রার্থনা-সমীকরণটি ছাত্রদের সাথে আলোচনার কিছুদিন আগে থেকে শুরু করে তার কয়েকদিন পর পর্যন্ত সময়কালে অক্ষয় দত্ত যে প্রবন্ধগুলি/গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন সেগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে হবে। এখানে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দেওয়া হল-

তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ভূগোল, পদার্থবিদ্যা বইয়ের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। দার্শনিক গুরুত্ব সম্পন্ন তাঁর প্রথম বই *'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার'*-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৫১ সালে ও ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মৌলিক রচনা নয়। স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞান লেখক জর্জ কুম্বের ১৮২৮ সালে লেখা *'Essay on the Constitution of Man and its Relation to External Object'* বইটির প্রায় একরকম ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে।

বইটির বিষয়বস্তুর অনেকটাই সঠিক তথ্যসম্মত নয়। কিন্তু স্কটিশ লেখক যেভাবে ভৌতবস্তুর সঙ্গে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা চালিয়েছেন, অক্ষয় দত্ত সেই জিনিসটিই এদেশের পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। প্রতিদিনের সমস্ত ঘটনাবলীর পেছনে সদা সক্রিয় ঈশ্বর নয়, একটা সাধারণ জাগতিক কার্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে, কুম্বের এই প্রতিপাদ্যটি অক্ষয় দত্তের কাছে বেশি আকর্ষণীয় ছিল। এটিই তিনি বাঙালি পাঠকদের কাছে পেশ করতে চেয়েছিলেন। এই বইয়ের তত্ত্বকথাগুলি কুম্ব থেকেই তিনি কমবেশি নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রায় সমস্ত উদাহরণগুলি তিনি সাজিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় নৈমিত্তিক জীবন থেকে।

'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (১ম খণ্ড)'-এর ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেছেন, "সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোনো প্রমাণ গ্রাহ্য নহে, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা

যে বিষয় যতদূর নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর জানা যায় না, এই মহানর্থকর চিন্তা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং অত্যন্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়।" কেন না, তাঁর মতে, "অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য।"

যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ বাদরায়ন মনু পরাশর রঘুনন্দন মেধাতিথি কুল্লুকভট্ট শঙ্কর রামানুজ ইত্যকার ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অধ্যাত্মরস শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিদের নাম অক্ষয় দত্তের শাস্ত্র-তালিকায় ঢোকার ছাড়পত্র পায়নি। ধর্মবিশ্বাসীরা তাঁদের সর্বমান্য গুরুদের বেছে নিয়েছেন, যাঁদের পথে তাঁরা চলবেন। বিজ্ঞানপন্থীদের তরফ থেকে অক্ষয় দত্তও পূর্বসূরি শিক্ষকদের চিনে নিয়েছেন এবং আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা অতীতের অন্ধকারের গুহাতেও জ্ঞানের আলোর মশাল জ্বেলে একটু একটু করে এগিয়ে চলার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই মানুষটির জ্ঞানচর্চার প্রাবল্য ও অভিমুখ ভক্তিমার্গীয় বিশ্বাস ও আচরণের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত হবে।

এই বাহ্যবস্তু গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন, 'বিশ্বপতি যে-সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয়কার্য্য; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম।'[৪২] তিনি বাহ্যবস্তু গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মদ্যপান ত্যাগ করা বিষয়টি ছাড়াও নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করা বিষয়টির উপর জোর দেন। যা কেশবচন্দ্রকে নিরামিষশাষি হতে উৎসাহিত করেছিল।[৪৩]

তাঁর রচিত *'চারুপাঠ'* তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল-প্রথম খণ্ড ১৮৫৩ সাল, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৬ সাল এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৫৯ সাল। এই বইগুলিতে তিনি সম্পূর্ণ নিজের পছন্দ মত বিষয়

[৪২]মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ২০১২, পৃ. ১০৭।

[৪৩]Amiya P Sen, *Explorations in Modern Bengal c. 1800-1900: Essays on Religion, History and Culture*, p. 40.

শিশুদের উপযোগী করে ও বিজ্ঞানের নানা প্রসঙ্গ সহজ-সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। এই খণ্ডগুলিতে তিনি যে সমস্ত বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তাঁর কয়েকটি উদাহরণ দিলে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। যথা- আগ্নেয়গিরি, সিন্ধুঘোটক, বীবর, জলপ্রপাত, পৃথিবীর আকার পুরু ভুজ, পৃথিবীর পরিমাণ, উষ্ণ প্রস্রবণ, দীপ মক্ষিকা, পৃথিবীর গতি, বনমানুষ, বল্মীক, হিমশিলা, মুদ্রাযন্ত্র, ব্যোমযান, বর্ষণবৃক্ষ, দিগদর্শন, প্রবাল, চন্দ্র, আলেয়া, সৌরজগত, গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু, তাপমান, উড্ডীয়মান মৎস্য, পতঙ্গভুক বৃক্ষ, ভূগর্ভস্থ হ্রদ, অন্ধ মৎস্য ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়গুলিকে উপলক্ষ্য করে তিনি সমকালে প্রচলিত নানারকম ভ্রান্ত ধারণা ও মতবাদগুলি ভ্রম মুক্ত করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিক ব্যাখ্যা ও জ্ঞানের স্পর্শ দিতে চেয়েছিলেন।

উনিশ শতকে ব্রাহ্ম্যণ্যবাদের প্রভাবে সমুদ্র যাত্রা (কালাপানি) নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় বাধা-নিষেধ ছিল, যা ভুল প্রমাণ করার জন্য *"প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার"* (১৮৪৯ সাল) এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে *"বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ"* (১৮৫৫ সাল) রচনা করেন। প্রযুক্তির পক্ষ নিয়ে তিনি চারুপাঠে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন। এই রচনাগুলি তাঁর জীবনের দার্শনিক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত, আমরা এই কথাটা সহজেই বলতে পারি।

তিনি *প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার* গ্রন্থে লিখেছেন, "মানবসমাজ যতই উৎকর্ষ লাভ করে ততই তাহাদের বহুতর সুখসম্ভোগোপযোগী দ্রব্য আবশ্যক হইয়া থাকে। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য, প্রথমে স্বজাতীয়দিগের মধ্যে, এবং ক্রমশ নিকটস্থ ও দূরবর্তী মানবদলের সহিত বিনিময়-প্রথানুসারে আদানপ্রদান চলিয়া থাকে; এইরূপে বানিজ্যের সূত্রপাত হয়।[৪৪]

[৪৪]স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), ২০০৮, পৃ. ৩৮৮।

তিনি আরও লিখেছেন, মনুসংহিতা ও বাল্মীকি রামায়ণ সমধিক প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ উভয় গ্রন্থের রচনাকালে ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেশ-দেশান্তরে গমনপূর্বক বিস্তৃতরূপে বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্পাদন করিতেন। পুরাকাল হইতেই যে হিন্দুরা নানাবিধ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে, বর্ণবিভাগ তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতি পূর্বকালেই বর্ণবিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছিল। বাণিজ্যাবলম্বন বৈশ্যদিগের প্রধান বৃত্তি।[৪৫]

"বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ"-এ তিনি একজন রেল আরোহীর প্রতি তেরোটি (১৩) নিয়মের কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "যে দেশে দ্রুতগামী যান ও সুপরিষ্কৃত পথ বিদ্যমান নাই, সে দেশের লোক কদাচ সুসভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা। .....সংপ্রতি ইংরেজদিগের প্রসাদে এতদ্দেশে বাষ্পীয় রথ নির্ম্মিত হওয়াতে (১৮৫৩ সাল), ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে বাণিজ্য-বিস্তার, জ্ঞান-প্রচার ও সুখ-সমৃদ্ধি-সম্বর্দ্ধনের যেরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা এক্ষণে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিলেও প্রফুল্ল হইতে হয়।"[৪৬]

তিনি আরও লিখেছেন, বাষ্পীয় রথ পরমাদ্ভুত বস্তু। উহা দ্বারা এক মাসের পথ এক দিবসে ভ্রমণ অক্লেশে করিয়া অশেষ বিষয়ের বাসনা সুসিদ্ধ করা যায়।.....অশেষ-শুভ-সাধক বাষ্পীয় রথেও মধ্যে মধ্যে বিঘ্ন ঘটিয়া অনেক ব্যক্তি হত ও আহত হইয়া থাকে। কিন্তু দূরদর্শী পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, স্থলে-পথে ও জল-পথে অন্যান্য যানে গড়ে যত ব্যক্তির শরীর-পীড়া ও প্রাণ-বিয়োগ হয়, বাষ্পীয় রথে কদাচ তত ব্যক্তির হয় না।[৪৭]

এবং তাঁর সর্বশেষ রচনা হল *"ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"*, যা মূলত হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বর্ণনা। অধ্যাপক সুশোভন সরকারও বলেছেন এই গ্রন্থটি হল 'ধর্মীয় আখ্যান'।

---

[৪৫]তদেব, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯।

[৪৬]তদেব, পৃ. ৩৮৮-৩৮৯।

[৪৭]স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

কিন্তু তিনি হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায় উল্লেখ না করে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় বলেছেন। এই গ্রন্থটি তাঁর গবেষণা ও যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যার পরিচয় বহনকারী। রাজনারায়ণ বসু অভিযোগ করেছিলেন অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মবাদের উপর বিশ্বাস থেকে সরে এসে অজ্ঞেয়বাদী হয়ে ওঠেন, যার প্রমাণ ভারতীয় উপাসক-সম্প্রদায়-এর অনেকগুলি পাতা।[৪৮]

প্রায় এই সময়েই তিনি লিখেছেন *"ধর্ম্মনীতি"* (১৮৫৬), *"ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব"* (১৮৫৫) এবং *"পদার্থবিদ্যা"* (১৮৫৬)। ধর্ম্মনীতি বইটি কুম্ব রচিত *'Moral Philosophy'* (বইটি) অনুসরণে লেখা। তিনিও ধর্ম্মনীতি বলতে Principles of Morals বুঝিয়েছেন। এগুলি কোন ধর্মীয় (Religious) গ্রন্থ না। 'Moral Philosophy' একটি প্রাচীন ধারণা। রেনেসাঁ পূর্বের এই ধারণাই তিনি ঔপনিবেশিক বাংলার পরাধীন নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন।

ধর্ম্মনীতি গ্রন্থে তিনি নৈতিক আলোচনা করতে গিয়ে প্রচলিত দেশাচারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন। একদিকে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে লিখেছেন, অন্যদিকে বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের সপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তখনও তাঁর হয়ত ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তা তখন দ্রুত বিলীয়মান। অনেকটা জিওর্দনো ব্রুনো কিংবা বারুখ স্পিনোজার দার্শনিক মতবাদের অনুসারী। এই জায়গায় কুম্বের সঙ্গে তাঁর সবিশেষ পার্থক্যও ছিল। প্রথম জনের রচনায় বিজ্ঞানসন্মত আলোচনার পাশাপাশি ঈশ্বরভক্তি উপাসনা এবং প্রার্থনাও ছিল; অক্ষয় দত্ত ভক্তিমার্গ থেকে ক্রমাগতই জ্ঞানমার্গের দিকে সরে সরে যাচ্ছিলেন। আর এই জ্ঞানের জন্য তিনি হিন্দুশাস্ত্র নয়, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে পরেছিলেন। এভাবে ব্রাহ্ম থেকে প্রথমে

[৪৮] Amiya P Sen, Ibid, P. 41.

সংশয়বাদী হয়ে অবশেষে তিনি একসময় সম্পূর্ণ বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদী চিন্তকে পরিণত হয়েছিলেন।

তিনি *পদার্থবিদ্যা* বইয়ে ইংরেজিতে লেখা বিভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানের (Physics) বই থেকে প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ অনুবাদ করে নিজের ভাষায় ও ঢঙ্গে লিখেছেন। এই দুটি বইয়ের উদ্দেশ্য অভিন্ন। বস্তুজগত সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া, ধর্মের নামে বা নৈতিকতার নামে আচার-বিচার কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবার বিরোধিতা করে সরল-স্বাভাবিক-সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ে তোলা এবং সমাজের হিতের জন্য জীবন অতিবাহিত করাকে সু-উচ্চ নৈতিকতা হিসাবে তুলে ধরা। এই প্রতিটি বইয়ের মধ্যে মানবতান্ত্রিক যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক অক্ষয় দত্তের হস্তশিল্প ফুঁটে উঠেছে।

(ঙ) অক্ষয়কুমার দত্ত-এর ধর্ম্মনীতি ও ধর্মবোধ

বর্তমান গবেষক অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত *"ধর্ম্মনীতি"* (প্রথম ভাগ)-এর ষষ্ঠ মুদ্রণ (১৮৬৯ সাল) পড়েছে এই অংশটি লেখার জন্য, যেটি স্বপন বসু'র সংকলন ও সম্পাদনায় *"অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ"* (প্রথম খণ্ড) [ডিসেম্বর, ২০০৮] শিরোনামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।[৪৯]

তাঁর 'ধর্ম্মনীতি' বইয়ের 'ধর্ম্ম' কথার অর্থ Religion বা ধর্ম নয়, বইয়ের শুরুতেই তিনি লিখেছেন—'ধর্ম্মনীতি অর্থাৎ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-বিষয়িনী নীতিবিদ্যা (Principles of Morals). এই বইটি বিভিন্ন ইংরেজি বই অবলম্বনে লেখা হয়েছে। তিনি লিখছেন, যে বিদ্যা অধ্যয়ন করলে

[৪৯]স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩১।

ধর্ম্মের স্বরূপ কি এবং কোন কোন কাজ যথার্থ ধর্ম্ম এই দুটি বিষয়ে অবগত হওয়া (জানা) যায়, তাকে ধর্ম্মনীতি বলে(পৃ. ৪৪০)। তাঁর মতে উপচিকীর্ষা, ভক্তি, ন্যায়পরতা এই তিন প্রধান বৃত্তির নাম ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। দ্বারকনাথ গাঙ্গুলি তাঁর ছাত্র জীবনে সমাজ সংস্কারক হওয়ার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ধর্ম্মনীতি বইটি পড়ে।

ধর্ম্মের প্রাধান্য ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বিবরণ

তিনি লিখেছেন, "ধর্ম্মানুষ্ঠান-কালে স্বকীয় সুখোদ্দেশ্যে কার্য্য করা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্বভাব-সিদ্ধ নহে"(পৃ. ৪৩৯)। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির কেবলমাত্র নিজের সুখের জন্য কাজ করা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্বভাব সিদ্ধ কাজ নয়। অর্থাৎ নিজের সুখের জন্য অন্যকে হেয় করা, দুঃখ দেওয়া কখনই উচিত নয়। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই তিনি সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে এই নির্দেশ দিয়েছেন।

ধর্ম্ম স্বরূপ

ঈশ্বর ব্যক্তিদের নানারকম মনোবৃত্তি দিয়েছেন, এবং তার প্রত্যেকটিরই এক একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন আছে। ন্যায় হচ্ছে, নিজে কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করা, অপরের অর্থ অপহরণ বা চুরি না করা। কিন্তু এসব বাদ দিয়েও অনেক ব্যক্তি পাপাচার করে থাকেন। এবং এই পাপাচারও তো ব্যক্তি বিশেষে পার্থক্য সৃষ্টি করে, কে কোনভাবে গ্রহণ করছে। তাই তিনি লিখেছেন, "পাপ করলে সকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অনুশোচনা উপস্থিত হয় এমন না। যে ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমধিক তেজস্বিনী, দৈবাৎ কোন দুষ্কর্ম করলে, তাহার যেরকম মনস্তাপ হয়, ইতর ব্যক্তির কখনই সেরকম হয় না"(পৃ. ৪৪৭)। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর এই মন্তব্য কতটা প্রাণিধান যোগ্য, সেটা সহজেই অনুমেয়।

তিনি "জ্ঞান শিক্ষা"র উপর জোর দিয়েছেন এবং সেই কাজটি সকলেরই করা উচিত বলে মনে করতেন। এবং শিক্ষা লাভ করলে তার উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, "বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ (মন) অসংখ্য বিষয়ের অসংখ্য ভাবে নিরন্তর (সর্বদা) পরিপূর্ণ"(পৃ. ৪৫৪) থাকে।

তিনি আরও লিখেছেন, ".....বালক বালিকাদেরকে কিরূপে কোন কোন বিষয়ের শিক্ষা দান করা কর্তব্য, তা বিবেচনা করা উচিত। অনেকে ভাষা শিক্ষাকেই প্রকৃত বিদ্যা শিক্ষা বোধ করেন, এবং যে ব্যক্তি নিজেকে যত প্রকার ভাষায় বুৎপন্ন বলে পরিচয় দেন, তাঁর তত পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করে থাকেন"(পৃ. ৪৯১)। বিভিন্ন ভাষায় বুৎপত্তি থাকলে অপরিসীম জ্ঞানার্জন করা যায় এই বিষয়টি আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও দেখেছি। তাই ভাষা শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর স্বরূপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন- "ভাষা শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নয়, জ্ঞান-শিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা, জ্ঞানরূপ ভাণ্ডারের দ্বার স্বরূপ"(পৃ. ৪৯২)।

প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা বলতে তিনি যা বুঝিয়েছেন, তা হল—"ভাষা, গণিত ও লিপিবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হলে, প্রকৃত-জ্ঞান-শিক্ষা হয় না, জ্ঞান-শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রচারের উপায়মাত্র শিক্ষা করা হয়। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করলে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করতে ও তার দ্বারা সর্ব-নিয়ন্তা সর্ব মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অনির্বচনীয় মহিমা প্রতীতি করতে সমর্থ হওয়া যায়, তাই প্রকৃত বিদ্যা"(পৃ. ৪৯২)।

তাঁর মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিল তাই পরিবারের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা সম্পর্কে তিনি নিজেই অবগত ছিলেন। তাই আজ থেকে প্রায় ১৬৫ বছর আগে তিনি এই গ্রন্থের 'গৃহ-ধর্ম্ম' অধ্যায়ে মন্তব্য করেছেন- "কন্যা ও পুত্রের পাণি-গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার আগে পরস্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের বিভিন্ন রকম স্বভাব ও মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ, সদসৎ

চরিত্র পরীক্ষা, এবং প্রণয় সঞ্চার হওয়া আবশ্যক। যাদের চিরজীবন পরস্পর প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকা উচিত, অহরহঃ এক ঘরে একসাথে সহবাস করা আবশ্যক, একমতাবলম্বী হয়ে সমুদায় গৃহকর্ম সম্পাদন করা কর্তব্য, সকল বিষয়ে একীভূত হওয়া যাদের পণ, তাদের পরস্পর প্রণয়-সঞ্চার ও পরস্পরের চরিত্রাদি-নিরূপণ ছাড়া উদ্বাহ-পাশে বদ্ধ হওয়া অত্যন্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ ও নিতান্ত অসঙ্গত তার সন্দেহ নেই। এরকম বিরুদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত অপরাধ-জনক ও অশেষ অনর্থের মূল"(পৃ. ৪৬৬)।

"যাতে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একজন অন্যজনকে বিনা দোষে কষ্ট দিতে না পারে, রাজ শাসন (আইন) দ্বারা তার উপায় করা আবশ্যক।" অর্থাৎ, তিনি গার্হস্থ্য সমস্যায় দুর্বলতর পক্ষের জন্য আইনের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ চেয়েছেন। সুতরাং, আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সমকাল অতিক্রম করে আধুনিক রুচি ও বোধসম্মত ছিল এবং বর্তমান গবেষকের মতে, তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিটি আমাদের প্রত্যেকেরই ভেবে দেখা উচিত।

শিশুদের শারীরিক গঠনে নানারকম সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। তিনি এর জন্য শিশুর মা-বাবা'কে দায়ী করে বলেছেন—"অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না হতে হতে (হলে) সন্তান উৎপাদন করিলে (জন্ম দিলে), সে সন্তান তাদৃশ বল-বীর্য্য-সম্পন্ন (সবল) হয় না"(পৃ. ৪৬৭)। সেই সময় বাল্যবিবাহ এক গুরুতর সামাজিক ব্যাধি ছিল তাই তিনি অল্প বয়সে বিয়ে করার, অর্থাৎ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন।

"যাতে সন্তানরা দোষ শূন্য শারীরিক ও মানসিক প্রভৃতি গুণ প্রাপ্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তার উপায় করা পিতা মাতার প্রথম কাজ"(পৃ. ৪৮৪)। এছাড়া "মাতার পক্ষে আর একটি বিশেষ কর্তব্য আছে। অন্তঃসত্ত্বা কালে স্ত্রীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটলে, সন্তানের

স্বভাবগত ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। অতএব তৎকালে তাঁদের নিজের শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ এবং অন্তঃকরণ শান্ত ও নিরুদ্বেগ রাখা আবশ্যক"(পৃ. ৪৮৫) কর্তব্য।

এমনকি তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে, "সন্তানকে কিভাবে লালন-পালন করতে হয়, তা প্রায় কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা রীতিমত শিক্ষা করে না। .....শিশুদের লালন-পালন-ঘটিত সমুদায় বিষয়ে সুশিক্ষিত হওয়া স্ত্রীদের পক্ষে অবশ্য-প্রতিপালন সনাতন ধর্ম্ম"(পৃ. ৪৮৯)। সন্তান যদি এমন কোন কিছু চায় (পাওয়ার বাসনা করে) যা 'অসৎ', তাহলে সেই জিনিসটা তাঁকে দেওয়া উচিত নয়। কারণ অপত্য স্নেহ যেমন মূল্যবান, ঠিক তেমনই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অগ্রাহ্য কিছু করা উচিত না। "সন্তানের অসৎ কামনা পরিপূরণ যদিও অপত্য স্নেহের সম্পূর্ণরূপ গ্রাহ্য, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির গ্রাহ্য না, সুতরাং কোন ভাবেই কর্তব্য না"(পৃ. ৪৪৪)। আর তাই তিনি সবরকম বৈধ কাজের সাধারণ নাম দিয়েছেন ধর্ম্ম ও পুণ্য।

তিনি শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের উপরেও জোর দিয়েছেন, শরীর সুস্থ ও সবল রাখার কথা বলেছেন। কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে পরিমিত পরিশ্রম করার দরকার হয়। কারণ শরীর সুস্থ থাকলে সব ধরনের কাজ-কর্ম করা সম্ভব। তিনি শারীরিক নিয়ম পালন করা সর্বোতভাবে কর্তব্য বলে মন্তব্য করেছেন। শরীর সঞ্চালন না করে নিরন্তর অতি প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রম করলে মনও নিস্তেজ হয়, শরীরও ক্রমশঃ ভগ্ন হয়ে আসে(পৃ. ৪৯৮)।

সন্তান-সন্ততির জীবনে কি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে? সেই বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "শিশুরা যেরকম উদাহরণ দেখে, সেই রকম শিক্ষা করে, সেইরকম কাজ করে এবং আস্তে আস্তে তাদের চরিত্র সেইরকম হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ গুরুজনদের যেরকম আচরণ দেখতে পায়, তাদের সেইরকম প্রবৃত্তি জন্মান সবচেয়ে বেশি সম্ভব। অতএব, বালক বালিকাদের সুশীল সচ্চরিত্র করতে হলে, জনক-জননী ও শিক্ষাগুরুকেও সেই রকম হতে হবে"(পৃ. ৫০০)।

এবং পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তাঁর মতামত/উপদেশ হল— "যাঁর একান্ত অভিলাষ থাকে সন্তান সকল শিষ্ট, শান্ত, দয়ালু ও ন্যায়বান হোক, তাঁকেও তাদের সমক্ষে সতত সেইরকম আচরণ প্রকাশ করতে হবে। পিতা মাতাকে সর্বদা রাগ, দ্বেষ, বিবাদ, কলহ ও অন্যান্য কুৎসিত কাজে প্রবৃত্ত দেখলে সন্তানদেরও সেই সব দোষ আস্তে আস্তে সঞ্চারিত ও আবির্ভূত হতে থাকে। অতএব, তাদেরকে সুমধুর মৃদু বচনে সংযুক্তি-সিদ্ধ উপদেশ দেওয়াই উচিত; ক্রোধ প্রকাশ করে তাদের ক্রোধ রিপুর উত্তেজনা করা কর্তব্য না। যে ঘর ও যে বিদ্যালয় শান্তি ও সন্তোষের আলয়রূপে প্রতীয়মান হয়, তাই শিশু সন্তানদের অবস্থিতির উপযুক্ত স্থান"(পৃ. ৫০১)।

তাঁর মতে, একজন ছাত্র সাবালক হয়ে যখন বৃহত্তর সমাজে অংশগ্রহণ করবে তখন নানারকম লোকের সাথে তাঁর যেরকম ব্যবহার করা উচিত, তা বিদ্যালয়েই অভ্যাস করান কর্তব্য(পৃ. ৫০৩)। এই একবিংশ শতকেও আমরা আমাদের সমাজের চারিপাশে কুসংস্কারমনা মানুষদের দেখতে পাই। তিনি সমাজ থেকে এই ভয়ঙ্কর প্রথা দূর করতে চেয়েছেন এবং এক সুদূরপ্রসারী উপায় বাতলে দিয়েছেন। তা হল, "ভূতের ভয়, ডাইনের আশঙ্কা, অমূলক অলক্ষণ ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের কুসংস্কার জনসমাজে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। যাতে এই সমস্ত ভ্রমাঙ্কুর শিশুদের চিত্ত-ক্ষেত্রে বদ্ধমূল না হতে পারে উপদেশ দ্বারা এবং কথা প্রসঙ্গে এ সকল বিষয়ে অনাদর ও উপহাস প্রকাশ দ্বারা তার উপায় করা আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয়ের আশঙ্কা অন্তঃকরণে এক বার প্রবিষ্ট হলে, নিঃশেষে নিষ্কাশিত করা সুকঠিন হয়ে উঠে"(পৃ. ৫০৪)।

দত্তের ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষাগ্রহণে বিলম্ব, বাংলা, ইংরেজি না ফার্সি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করবেন, জীবন ধারণের জন্য কোন ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করবেন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অবিভাবকদের সাথে তাঁর মতানৈক্য ছিল। কিন্তু তিনি তখন এই দ্বন্দ্বে তাঁদের প্রতি সম্মান বজায় রেখেই দৃঢ়তার সাথে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই অভিভাবকদের সাথে সন্তানদের

মত-পার্থক্য হলে কি করা উচিত, সে বিষয়ে তিনি বলেছেন, "যদি অশিক্ষিত পিতা মাতার সাথে শিক্ষিত সন্তানের কোন বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়, তা হলে, ভক্তি-সহযোগে বিনয়-বচনে তাদেরকে তা নিবেদন করা কর্তব্য; অবজ্ঞা ও অনাদর প্রকাশ করা কোন ভাবেই শ্রেয়স্কর নয়"(পৃ. ৫২১)।

বাল্যবিবাহ-বহু বিবাহ-বিধবা বিবাহ

বাল্যবিবাহের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে আমাদের সচেতন করেছেন। এছাড়া তিনি লিখেছেন, "কি স্ত্রী, কি পুরুষ, অল্প বয়সে বিবাহ করা কারও পক্ষে কর্তব্য নয়"(পৃ. ৪৬৮)। বাল্যবিবাহ এক মহাপাপ। এছাড়া তিনি "বাল্যবিবাহের ন্যায় বার্ধক্য বিবাহও গুরুতর পাপ"(পৃ. ৪৭০) বলেছেন। তিনি বহু বিবাহেরও বিরোধী ছিলেন, যার উদাহরণ আগেই আমরা পেয়েছি। বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি এই গ্রন্থে বলেছেন, "যে দেশে স্বামীর মৃত্যু হলেও স্ত্রীর আবার বিবাহ করার রীতি নেই, সে দেশে নির্বাসিত পতির অনাথা পত্নীর পুনঃ-সংস্কারের নিয়ম থাকার সম্ভাবনা কি?"(পৃষ্ঠা. ৪৮২) বিধবা বিবাহের পক্ষে তার মতামত আমরা আগের অধ্যায়েই দেখেছি।

নিম্নবর্গের মানুষদের প্রতি ব্যবহার

তিনি জাত-জাতিভেদ প্রথা যে মানতেন না, এমনকি সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের প্রতি তাঁর সু-ব্যবহার ছিল তা আমরা আগেই জেনেছি। এবিষয়ে তিনি নিজের মত প্রকাশ করে লিখেছেন, "এতদ্দেশীয় অনেক লোক ভৃত্যদের প্রতি যেরকম কটূক্তি ও কর্কশ ব্যবহার করেন, তা অত্যন্ত গর্হিত। তাঁরা অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি যেরকম অকথ্য অশ্রাব্য শব্দ সব প্রয়োগ করে থাকেন, তা শুনলে লজ্জায় অধোমুখ হতে হয়। অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করলে যে ভদ্র লোকের ভদ্রতা গুণের ব্যতিক্রম হয়, এটি তাঁরা বিবেচনা করতেন না"(পৃ. ৫২৬-৫২৭)।

এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য অক্ষয় দত্তের মতাদর্শের পরিবর্তন নির্ণয় করা। ব্যক্তির জীবন-যাপন, লেখালেখি তাঁর মতাদর্শের পরিবর্তনের সাক্ষী। দত্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনি আমৃত্যু সত্য সন্ধানী মানুষ ছিলেন, তাই তাঁর জীবনের প্রতি পদে পদে আমরা তাঁকে সত্যকে আঁকড়ে ধরতে দেখেছি। তিনি উনিশ শতকের এক আপোষহীন চরিত্র ছিলেন। তাঁর কর্মহীনতা, শারীরিক অসুস্থতা তাঁর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। পরিশেষে, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ব্রাহ্মদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর জীবনের এই দিকটিকেই তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় -তাঁর দীর্ঘ গবেষণামূলক গ্রন্থ

প্রেক্ষাপট

অক্ষয় দত্ত জীবনের মাত্র ৩৫টি বছর সুস্থভাবে কাটিয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে অন্যান্য ব্রাহ্মদের সাথে দার্শনিক বিতর্ক চলাকালীন তাঁর জীবনে এক ভয়ঙ্কর রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিলে। তাঁর জীবনীকারেরা ও সমাজবিজ্ঞানীরা যা 'শিরোরোগ' (শিরোঃপীড়া) বলে বর্ণনা করেছেন। মনে করা হয় এটা ছিল *মাইগ্রেইন* (Migraine) রোগ।

তাঁর জীবনীকার মহেন্দ্রনাথ রায়ের কথায়, "……ইহার (মূর্চ্ছার) দুই দিবস পরে ইনি (অক্ষয় দত্ত) তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বসিয়া কোন প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় ইঁহার মস্তকে এমন এক রূপ জ্বালা উপস্থিত হইল যে, তাহাতে ইনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, (যে).....এক উৎকট রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। .....ইনি তদুপলক্ষে সেই যে লেখনী ত্যাগ করিলেন, সেই একেবারে চির জীবনের মত ত্যাগ করা হইয়াছে।"[১]

মহেন্দ্রনাথের বর্ণনানুযায়ী অক্ষয়কে শিরোরোগের জন্য লেখনী ত্যাগ করতে হয়েছিল। বর্তমান গবেষকের মতে, আসলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—অক্ষয় এরপর আর নিজের হাতে কিছু লিখতে পারেননি। এইসময় থেকে তিনি তাঁর লেখার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিদের সাহায্য নিতেন।

[১]মহেন্দ্রনাথ রায়, *বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত*, ১২৯২, পৃ. ২২৭।

যা তাঁর পক্ষে খুবই বিড়াম্বনার ব্যাপার হলেও, অন্য কোন উপায় ছিল না। আসলে তিনি কোন কারণেই লেখা ছাড়তে রাজি ছিলেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এইসময় তিনি উচ্চ স্বরের কোন কথা শুনতেও পারতেন না। এইরকম শারীরিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাঁর বাকিটা জীবন (প্রায় ৩০ বছর) অতিবাহিত হয়েছিল।

একই সূত্রে মহেন্দ্রনাথ আরও উল্লেখ করেছেন—"অকালে ইনি (অক্ষয় দত্ত) কি দুর্জয় রোগের হস্তেই পড়িলেন! .....যে স্থানে যান-বাহন যায় না, সে স্থানে যাইবার সম্ভাবনা নাই। যদি কোন ক্রমে .....কোন স্থানে যাইতে পারেন, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে .....কখন কখন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী-দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের আমূল বৃত্তান্ত এবং প্রকাশ্য ও গুহ্য-ক্রিয়ানুষ্ঠান-বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন। ইঁহার কর্ম্মচারী (শ্রীরাম) কাগজ-পেন্সিল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, যাহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন হয়, তাহা লিখিয়া লন.....।[২]

অর্থাৎ তিনি নিজে লিখতে না পারলেও তাঁর গবেষক মনের সকল সঞ্চয় তিনি নথিবদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি এরকমও উদাহরণ রয়েছে তিনি লেখানোর প্রয়োজনে দূরে বসবাস করা কোন পরিচিত ব্যক্তির কাছেও ছুঁটে গেছেন। এবং লেখার প্রয়োজনীয় সংকেত রেখে দিয়েছেন। তিনি এই শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় গ্রন্থটি লিখেছিলেন। গ্রন্থের কোনো নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে অক্ষয় দত্তের যখন যা মনে হতো, তাঁর সচিব (কর্ম্মচারী) তা লিখে নিতেন। ফলে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থনার সময়ে, মহাসঙ্কট উপস্থিত হতো বলে অক্ষয় দত্ত নিজেই জানিয়ে গেছেন।[৩]

---

[২]তদেব, পৃ. ৩০৮ ও ৩০৯।

[৩]তদেব, পৃ. ১১০।

প্রবল অসুস্থতার মধ্যে কি করে তিনি এই বইটি রচনা করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—

আমি কয়েক দিবসের মধ্যেই বালীতে উপস্থিত হইলাম। যে সময়ে উপস্থিত হইলাম, তখন অক্ষয়কুমার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের' উপক্রমণিকা-অংশ শ্রীরামকে দিয়া লেখাইতেছিলেন। কোনদিন পাঁচ ছত্র, কোনদিন দশ ছত্র মুখে মুখে বলিতেন ও শ্রীরাম লিখিয়া লইত। তাঁহার নিজে লিখিবার সামর্থ্যের অভাব হইয়াছিল। অতিকষ্টে আটদশ ছত্র লিখাইয়াই ক্লান্ত হইতেন ও পুনর্বার শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার অতিশয় কষ্টবোধ হইল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে'র দ্বিতীয় ভাগের ২৮২ পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা লেখাইতে পারিয়াছিলেন; এই ২৮২ পৃষ্ঠা অক্ষয়কুমারের অক্ষয়কীর্তি।[৪]

ইতিমধ্যে তিনি এই অসুস্থতার কারণে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন (১৮৫৫ সাল)। এরপর তিনি কলকাতায় নতুন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক-শিক্ষণ নর্মাল স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল সেই স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারেননি। তিনি তীব্র শিরোরোগের জন্য ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে ১ বছর, পরে ছয় ৬ মাস করে দুই বার ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে তিনি পদত্যাগ করেন।[৫]

তিনি অসুস্থতার জন্য যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে অব্যাহতি নেন তখন থেকে দেবেন্দ্রনাথের সাথেও আর কোনরকম যোগাযোগ রাখেননি। এমনকি এরপরে কখনও

[৪]অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ), ২০১৫, পৃ. v.

[৫]ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অক্ষয়কুমার দত্ত,* (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা -১২), ১৩৪৯, পৃ. ২২।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কোন প্রবন্ধ রচনা করেও পাঠাননি। এর থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কতটা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশক গোষ্ঠীর প্রতি।

১৮৫০-এর দশকে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছিলেন- চারুপাঠ ১ম ভাগ (১৮৫৩ সাল), ২য় ভাগ (১৮৫৬ সাল) ও ৩য় ভাগ (১৮৫৯ সাল) এবং ধর্ম্মনীতি ও পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬ সাল)। এরপর তাঁর *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* ১ম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। অর্থাৎ চারুপাঠের ৩য় ভাগ ও ভা উ-স ১ম ভাগ প্রকাশের মধ্যে দীর্ঘ ১১ বছরের ব্যবধান। এবং এর ১৩ বছর পরে ১৮৮৩ সালে ভা উ-স ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝতে পারি, এই সময়কার রচনাগুলির মধ্যে এতটা সময়ের ব্যবধানের কারণ কেবলমাত্র তাঁর শিরোরোগ।

ধর্ম্মনীতি বইয়ের "বিজ্ঞাপন"-এ দত্ত লিখেছেন, "এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবার পর আমি কোন উৎকট (পীড়ায়) পীড়িত হইয়াছি। এই নিমিত্ত কয়েক মাসাবধি ইহার প্রচার বিষয়ে একবারেই নিরস্ত ছিলাম। পরে অনেকে এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে, এক্ষণে সত্বরেই শেষ করিয়া দিতে হইল।.....১০ই মাঘ। শকাব্দাঃ ১৭৭৭।"[৬]

তাঁর পরিকল্পনা ছিল তিনটি খণ্ডে ভা উ-স প্রকাশিত করার কিন্তু শিরোরোগের জন্য তিনি ৩য় ভাগ লেখার কাজ শুরুই করতে পারেননি! প্রকাশিত এই গ্রন্থের (দ্বিতীয় খণ্ডের) ভূমিকায় তিনি নিজেই নিজের শারীরিক অক্ষমতার কথা বেদনাবিধুর ভাষায় বলেছেন।[৭] আজ যখন আমরা তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ইতিহাস' গ্রন্থটি পড়ি তখন আমাদের স্মরণে রাখতে হবে,

[৬]তদেব, পৃ. ৩৮।

[৭]অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দ্বিতীয় ভাগ), ২০১৩, পৃ. ৩১৩-৩১৮।

এর প্রতিটি পংক্তির গায়ে আছে একটি মহান মুক্তমন মানুষের জীবন-মৃত্যু সংগ্রামের পঁচিশ বছরের (এক)টানা পল পল (শারীরিক) যন্ত্রণার নিঃশব্দ-লাঞ্ছনা।[৮]

তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে ড. সুকুমার সেন যথার্থই বলেছিলেন- 'যেরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য ও রোগযন্ত্রণার মধ্য দিয়া অক্ষয়কুমার এই বিরাট এবং তথ্যপূর্ণ গ্রন্থখানি (ভা উ-স) রচনা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা সকল দেশেই কদাচিৎ পাওয়া যায়।[৯] শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর রচিত *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* গ্রন্থে লিখেছেন—"আশ্চর্য জ্ঞানস্পৃহা! আশ্চর্য কার্যশক্তি! ইহার পরে এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অধিক কি তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' নামক সুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই অবস্থাতেই সংকলিত। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তিনি প্রাতঃকালে, সুস্নিগ্ধ সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোনও দিন একঘণ্টা কোনও দিন দেড়ঘণ্টা করিয়া মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া লইত, এইরূপ করিয়া এ সকল মহাগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল।"[১০]

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

অক্ষয় দত্ত শিরোরোগ নিয়ে এক বৃহৎ প্রকল্প হাতে তুলে নিয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি—'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়'-এর ইতিহাস রচনা। এই বইটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩ সালে। তিনি শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই এই

[৮]অশোক মুখোপাধ্যায়, *ডিরোজিও ও অক্ষয়কুমার দত্ত*, ২০১৩, পৃ. ৪১।

[৯]অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ), পৃ. iv-v.

[১০]শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, ২০১৬, পৃ. ১৩২।

বৃহৎ গবেষণামূলক কাজটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। গ্রন্থটির বৃহৎ আকারও এই গ্রন্থটি বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ার (শিরোরোগ ছাড়া) অন্যতম কারণ ছিল।

তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করে এ-দেশে ধর্ম-বিযুক্ত, বিজ্ঞান-নির্ভর মানবিকতার নির্ভীক প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। এবং এই গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন যুক্তিবাদীদের নামে জয়ধ্বনি করেছেন। আসলে উপাসক সম্প্রদায় বলার মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বর্ণনা দিয়েছেন। এবং তিনি সচেতনভাবেই ধর্মীয় সম্প্রদায় কথাটির পরিবর্তে উপাসক সম্প্রদায় নামটি ব্যবহার করেছেন। অনুমান, নইলে তাঁর এই দীর্ঘ গবেষণামূলক গ্রন্থটি তৎকালীন সময়ে তিনি প্রকাশ করতে পারতেন না।

ভারতে অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায় রয়েছে। তৎকালীন হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল হোরেস হিম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০ সাল) সাহেব হিন্দু সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণা করে মাত্র ৪৫টি সম্প্রদায়ের কথা লিখেছিলেন। তাঁর সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটি দুটি অংশে *"A sketch of the religious sects of the Hindus"* শিরোনামে এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে বেরিয়েছিল [Asiatic Researches, vol. XVI, 1828 and vol. XVII, 1832]. পরে এটি একত্রে ১৮৬২ সালে তাঁর রচনাবলির প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়।

হোরেসের এই প্রবন্ধ থেকেই হয়ত দত্ত তাঁর আলোচ্য বইটি লেখার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হাত দিলেন একশো ১৮২টি সম্প্রদায়ের কাহিনীতে। চার গুণেরও বেশি কাজ। পুরোটাই তিনি একা নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে করে সম্পন্ন করেছেন। তাই ম্যাক্সমূলার লিখেছিলেন, 'আপনার মৌলিক গবেষণাদ্বারা আবিষ্কৃত তথ্যগুলি বহুমূল্য'। প্রাচীন ভারত নিয়ে ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে অক্ষয় দত্ত অনেক কিছু লিখেছেন যা ইতিহাস-ভূগোলের (সমাজ বিজ্ঞানের) নিরিখে সত্যিই নতুন ও অভিনব ছিল।

বইপত্র পড়ার পাশাপাশি সরাসরি ক্ষেত্রসমীক্ষা করে অনেক রকম তথ্য পেয়েছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে থেকেছেন, মিশেছেন, কথা বলেছেন, বুঝেছেন। তবে লিখেছেন। এই কারণেই ভারতীয় সমাজ তথা ধর্মীয় সমাজের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাপেক্ষে বইটির আজও একটি আকর গ্রন্থমূল্য আছে, যা সেই যুগের খুব বেশি বইয়ের ক্ষেত্রে বলা যায় না। আর এতবড় একখানা কাজ, যার সমতুল্য কিছু তখন পর্যন্ত কোনও ভারতীয়ের একক বা সমষ্টিগত উদ্যোগে সম্পন্ন হয়নি, একা করতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁর সময় লেগেছে অনেক।[১১]

শুধু মুখে মুখে বলে গেছেন এবং প্রাসঙ্গিক বইপত্র পড়েছেন আর তাতেই এই মহাগ্রন্থের দুটি ভাগ রচিত হয়েছিল, তা মনে করার কারণ নেই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ-বিষয়ে লিখেছেন—*"১৮৭৯ সাল পর্যন্ত কি ইংরাজি, কি জার্মান, কি ফ্রেঞ্চ, কি ল্যাটিন কি বাঙ্গালায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে কোন পুস্তক লেখা হইয়াছে, সে সমস্তই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া ঐ পুস্তকের উপক্রমণিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থও তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে যতপ্রকার উপাসক-সম্প্রদায় আছে মোটামুটি তাহাদের সকলেরই ইতিহাস, উপাসনা প্রণালী ও ধর্মতত্ত্বের সারমর্ম লিখিয়া গিয়াছেন।....."*[১২]

এই ধরণের গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার উপযোগী গবেষণাপদ্ধতি (Methodology) তখনও সমাজবিজ্ঞানে আসেনি। আর যখন এই গবেষণাপদ্ধতি এসেছে, তখন ভারতবর্ষের উপাসক (ধর্মীয়) সম্প্রদায়গুলির অনেকগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে। গবেষণাপদ্ধতি ব্যবহার করা গেলে এই গ্রন্থটি আরও রোমাঞ্চক হয়ে উঠত একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তবু আজও এই গ্রন্থটি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রসঙ্গে আকর গ্রন্থ। কিন্তু দত্তের জীবিতকালে এই গ্রন্থটি বিশেষ

[১১]অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

[১২]অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ), পৃ. v-vi.

প্রচার পায়নি, এই গ্রন্থটি প্রচারের আলো পেতে শুরু করে ১৯১০'র দশক থেকে যখন রাজেন্দ্রলাল মিত্ররা বিজ্ঞানমূলক গবেষণা নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন।

দত্তের এই বইটি অন্য একটি কারণেও অনন্য। কারণটি হল বইটির *উপক্রমণিকা* (ভূমিকা)। যা মূল বইয়ের আয়তনের চেয়ে অনেক বড়, এরকম সাধারণত হয় না! "উপক্রমণিকা" শীর্ষক এই ভূমিকা আবার দুই খণ্ডে বিভক্ত। অর্থাৎ ভা উ-স প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ মিলে। এও কোনও বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। কলকাতার করুণা প্রকাশনীর তরফে পুনর্মুদ্রিত বইটির দুটি ভাগ—যার মধ্যে প্রথম ভাগ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ (২০১৫ সাল) এবং দ্বিতীয় ভাগ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ (২০১৩ সাল)-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ভাগে মূল বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৪, তন্মধ্যে "উপক্রমণিকা"-এর জন্য বরাদ্দ পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ১১২। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ভাগে "উপক্রমণিকা"-এর জন্য বরাদ্দ পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৩২০। এবং সম্প্রদায়গুলি বর্ণনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২২৮ পৃষ্ঠা। দুই ভাগ মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, উপাসক সম্প্রদায়ের জন্য যেখানে লেগেছে ৩৮০ পৃষ্ঠা, সেখানে "উপক্রমণিকা"-এর জন্য ব্যয় হয়েছে মোট ৪৩২ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ, অখণ্ডভাবে ধরলে গোটা বইয়ের অর্ধেকেরও বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে এই উপক্রমণিকা (ভূমিকা)। এতবড় একটি উপক্রমণিকা সত্যিই বিস্ময়কর!

বর্তমান গবেষকের কাছে এই উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থটির উপক্রমণিকা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, সম্প্রদায়গুলি নয়। কারণ সেই আলোচনাগুলি গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিষয়বস্তু থেকে ভিন্নধর্মী। এই উপক্রমণিকার ঐতিহাসিক ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। ড. সুকুমার সেনের মতে, "দুই ভাগেরই উপক্রমণিকা অংশ সুদীর্ঘ এবং মূল্যবান্। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় মূল আর্য্য (ইন্দো-ইউরোপীয়), আর্য্য (ইন্দো-ইরাণীয়) এবং ভারতীয় আর্য্য (বৈদিক ও সংস্কৃত) ভাষা ও সাহিত্যের

ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ভাষা বিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবাসী কর্তৃক এইই প্রথম।"[১৩] অর্থাৎ তিনি ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

তিনি এরকমভাবে বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন কারণ এতে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা নয়, এর দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। তবে দুই ভাগের দুই উপক্রমণিকার মধ্যে সবচেয়ে মন মুগ্ধকর অংশ হল বিজ্ঞানের ইতিহাসের আলোকে ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক ধারার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। আরও ভালো করে নজর করলে মনে হবে, আসলে এ লেখকের ভূমিকা নয়; এ যেন একই মলাটের ভেতরে সাজানো একই লেখকের দুটো বই। কারণ, মূল বইয়ের বক্তব্যের সঙ্গে বৃহদায়তন ভূমিকায় আলোচিত বিষয়ের খুব একটা তেমন সম্পর্ক নেই।

একটা বইয়ের নাম শিরোনামে যা দেওয়া আছে সেইরকম হতে কোনও বাধা নেই। দ্বিতীয় বইটির নাম বোধ হয় বিষয়বস্তু অনুযায়ী হওয়া উচিত ছিল 'ভারতে নিরীশ্বরবাদ ও বস্তুবাদের বিকাশ তথা অনুশীলন'। দুটো বই প্রথমেই আলাদা আলাদাভাবে ছাপানো যেত। বা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড না করে এক একবারে একটা করে বই হতে পারত। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে লেখক অক্ষয় দত্ত দুটোকে মিলিয়ে একখানা বই তৈরি করে রেখেছেন।[১৪]

আরও লক্ষণীয়, যুক্তিবাদী বিজ্ঞান লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত যেন প্রথম বইটিতে ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র ধর্মসংস্কৃতি বিশিষ্ট মানব গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর বহুদিনের পরিশ্রমজাত ও বৈজ্ঞানিক বিধিসম্মত অনুপুঙ্খ ক্ষেত্রসমীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন; আর দ্বিতীয় বইতে তিনি তাঁর নিজস্ব দার্শনিক বিচার, ভারতীয় চিন্তাশীলদের বিভিন্ন দার্শনিক মতের পরিচয়, পারস্পরিক

---

[১৩]তদেব, পৃ. v.

[১৪]অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

তর্কবিতর্ক খণ্ডন-বিখণ্ডন, ভারতীয় প্রাচীন মনন-ঐতিহ্যে নিরীশ্বরবাদ এবং বস্তুবাদের নানা শাখার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ভারত গ্রিস ও রোমের প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে ভাষা তথা অন্য নানা বিষয়ে সাদৃশ্য, ইত্যাদি বহু চিত্তাকর্ষক বৌদ্ধিক উপকরণ তুলে ধরেছেন।

বইগুলিতে শুধু যুক্তিবাদী বিচারধারা নয়, আছে যুক্তিবাদের মননশীল ফসল। এতে পাওয়া যায় শুধু মাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আবাহনী নয়, আগমনী নয়, তার পাশাপাশি আমরা পাই সমাজ সংস্কৃতি ভাষা দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অখণ্ড বিজ্ঞানমানস প্রয়োগের ফল স্বরূপ এক উৎকৃষ্ট বিচার পদ্ধতি ও অভাবিতপূর্ব সিদ্ধান্তরাশি। প্রথম পুস্তক শেখায়, কোনও একটি সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ে কীভাবে তথ্যানুসন্ধান করতে হবে। দ্বিতীয় পুস্তক থেকে শেখা যায়, কোনও একটা দেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে দীর্ঘপ্রচলিত বিভ্রান্তিগুলিকে কীভাবে কাটানো যায়। সেদিক থেকে বই দুটি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন গ্রন্থন নয়, পরস্পর ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু তবুও আলাদা।[১৫]

গ্রন্থ দুটিতে লিখিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার সঙ্গে উপাসক সম্প্রদায়ের ইতিহাসের কোনও সহজ-সরল-সম্বন্ধ নেই তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। অক্ষয় দত্ত আসলে দ্বিতীয় বইটাই লিখতে চেয়েছিলেন, অন্তত দ্বিতীয় বইটিতেই তাঁর ছিল অধিকতর এবং অত্যান্তরিক আগ্রহ। এটি তাঁর উপাসক সম্প্রদায়ের ইতিহাসের যথার্থ উপক্রমণিকা ছিল না, এ ছিল তাঁর আকৈশোর সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের মণিরত্ন থেকে কিয়দংশ প্রকাশের আগ্রহের উপক্রম। আর, চল্লিশ বছর ধরে এই দেশে বুদ্ধিবৃত্তির চাষবাস করে, বিদ্যাসাগরের ঐহিক চিন্তাবাহিত সামাজিক কার্যক্রমের পরিণতি দেখে, এবং ততদিনে ব্রাহ্ম আন্দোলনের আপসজাত অবক্ষয় ও তার বিকল্প স্বরূপ বঙ্কিমী পরিশোধিত হিন্দুত্ব এবং রামকৃষ্ণ-

[১৫]তদেব, পৃ. ৪২।

ভক্তিবাদের ক্রম অভ্যুত্থান লক্ষ করে তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, তাঁর দার্শনিক বিচারের উপক্রমণিকাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তার গলায় ধর্মচর্চার কোনও একটা কিছু প্রসঙ্গ যে কোনও অছিলায় ঝুলিয়ে দিতে পারলে ভালো হবে।[১৬]

অক্ষয়কুমার দত্ত জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তিনি যদি এই দুখানা বই আলাদা করে লিখতেন, তাহলে—তিনি বোধ হয় ঠিকই বুঝেছিলেন—উপাসকদের ইতিহাস অবশ্যই বাংলার মনন-ইতিহাসে টিকে যেত, এদেশের প্রধান ধারার মননচর্চায় যথেষ্ট প্রশ্রয় এবং আশ্রয়ও পেত; কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দার্শনিক বিচারের উপক্রমণিকা আজ ইংলন্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একমাত্র কপি ছাড়া আর কোথাও সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যেত না। আর তিনি এই রচনাটিকেই ভাবীকালের হাতে তাঁর প্রকৃত বৌদ্ধিক-উত্তরাধিকার হিসাবে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। গ্রন্থটির পূর্বোক্ত বিচিত্র বিন্যাসের এটাই হয়ত (যুক্তিসম্মত) ব্যাখ্যা।[১৭]

প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত উপক্রমণিকার অংশে অক্ষয় দত্ত জার্মান ভারততত্ত্ববিদ মাক্সমূ্যুয়েলার-এর অনুসরণে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে আর্যভাষা গোষ্ঠীর ধারণা উপস্থিত করেছেন এবং তারপর মূলগ্রন্থ থেকে আর্যদের ধর্ম হিসেবে বৈদিক ধর্ম ও ইরানীদের অবেস্তা ধর্মের বিস্তৃত তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি একদিকে বৈদিক সাহিত্য থেকে মূল সংস্কৃত ও অন্যদিকে অবেস্তায় প্রাচীন পারসিক ভাষার মূল উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন। বোধহয়, অক্ষয়ের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় আর্যগোষ্ঠী ও ইরানী আর্যদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাব্য কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা। এই প্রসঙ্গে অসিত কুমার ভট্টাচার্য বলেন, আর্যদের বিষয়ে এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ কয়েকটি পৃষ্ঠা উনিশ শতকে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।[১৮]

---

[১৬]তদেব, পৃ. ৪৩।

[১৭]ঐ।

[১৮]অসিতকুমার ভট্টাচার্য, *অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজচিন্তা*, ২০০৭, পৃ. ৯৮।

অনেকে মনে করেন, আর্যরা একটি জাতি গোষ্ঠী (Race). কিন্তু আর্যরা মূলত একটি (ইন্দো-ইউরোপিয়ান) ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। রাশিয়ার ভল্গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ছিল তাদের আদি বাসস্থান। সেখান থেকে তারা অভিবাসিত (Migration) হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরেছিল। তাই সহজেই আমরা বলতে পারি, আর্যরা ভারতের আদি নিবাসী ছিল না। তারা বাইরে থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করেছিল। ভারতের প্রাচীন নিবাসী ছিল হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার অধিবাসীরা। আর মানব ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাব সমগ্র মানবজাতিই অভিবাসন করেছে।

তিনি লিখেছেন, হিন্দু-ধর্মের মূলানুসন্ধান করিতে হইলে ভারতবর্ষ হইতে বহির্গত হইয়া বর্ষান্তরে বিচরণ করিতে হয়। হিন্দুরা ভারতভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না; দেশান্তর হইতে আগমন করিয়া এ স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন(১ম, পৃ. ১)। তাহলে বিষয়টি হল, দত্ত আর্যদের 'হিন্দু' বলে সম্বোধন করেছেন। হিন্দু শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায় 'জেন্দ আভেস্তা'-তে যেখানে 'হপ্ত হিন্দু'-র (ঋগবেদের সপ্তসিন্ধু-র সঙ্গে এক) কথা বলা হয়েছে আহুর মাজদা-র তৈরি ষোলটি অঞ্চলের একটি হিসাবে। দীর্ঘদিন ধরে শব্দটি অঞ্চল চিহ্নিত করতেই ব্যবহত হত এবং তার কোনও ধর্মীয় দ্যোতনা ছিল না।[১৯]

তিনি লিখেছেন, যে আর্য জাতি গ্রীসে গ্রীক নাম গ্রহণ করিয়া আপনাদের মানসিক শক্তির প্রাচুর্য এবং অধ্যুষিত দেশের নৈসর্গিক ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অল্পতা ও ক্ষীণতা বশতঃ আপনাদের দেবগণকে মানব-গুণেরই অবতার স্বরূপ করিয়াছিলেন, সেই আর্য জাতিই ভারতবর্ষে হিন্দু নাম অবলম্বন পূর্বক চতুর্দিকস্থ নৈসর্গিক ব্যাপারের অতিমাত্র প্রভাব ও তেজস্বীতা দর্শনে ভীত চমৎকৃত হইয়া নৈসর্গিক দেবগণকেই সর্বপ্রধান করিয়া তুলিয়াছিলেন(১ম, পৃ. ৮২)।

[১৯]দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা, এক হিন্দু আত্মপরিচয়ের খোঁজে, ২০০৬, পৃ. ১২।

এই তথাকথিত হিন্দুদের ভারতীয় উপমহাদেশে বাসস্থান কোথায় ছিল? সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল—যদিও হিন্দুরা অগ্রে পঞ্চনদে আসিয়া অধিবাস করেন, তথাচ বোধ হয়, হিন্দু ধর্ম প্রথমে সরস্বতী-তটে অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রণালীবদ্ধ ও পরিস্ফুটিত হয়। .....সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুটি দেবনদীর মধ্যগত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে। ঐ দেশটি দেব নির্মিত। .....ভারতবর্ষ মধ্যে হিন্দুদিগের প্রথম নিবাস ভূমি পঞ্জাব ও সারস্বত-দেশীয় নদী সমুদায়ের পরিচায়ক ভূরি ভূরি বচন ঋগ্বেদ-সংহিতায় সন্নিবেশিত আছে, কিন্তু তাহাতে গঙ্গা-যমুনার নাম অতীব বিরল।

.....সিন্ধু ও সরস্বতীর উদ্দেশে (উদ্দেশ্যে) যেমন বহুতর স্বতন্ত্র সূক্ত উক্ত হইয়াছে, ঋগ্বেদ-সংহিতার গঙ্গা নদীর স্তুতিগর্ভ তাদৃশ একটি সূক্তও বিদ্যমান নাই। .....ঋগ্বেদ-সংহিতায় হিমালয়ের নাম সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু উহার কোন অংশে বিন্ধ্যগিরির নাম লক্ষিত হয় না(১ম, পৃ. ৭০-৭২)।

নির্দিষ্ট করে তিনি বলেছেন, আর্যরা যে স্থান দিয়া ভারতবর্ষ প্রবেশ করুন না কেন, অতি পূর্বে ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে সরস্বতী তীরে উপনিবিষ্ট হইয়া বৈদিক ধর্ম প্রচার করেন এবং ঐ সরস্বতী তীর হইতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ পূর্ব প্রদেশ অধিকার পূর্বক সদানীরা তটে অধিবাস করিয়া নিজ ধর্ম প্রচলিত করেন(১ম, পৃ. ৯০)। আর্যদের ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হয়। এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষরা নিজেদের অন্য গোষ্ঠী ইরানীদের সাথে আলাদা হওয়ার পর থেকে বৈদিক ধর্ম ভারতে বিনা বাধায় প্রচারিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে।

তিনি আরও লিখেছেন, হিন্দু ও অন্য অন্য আর্য বংশীয়েরা প্রথমে অগ্নি, বায়ু, জ্যোতিষ্ক প্রভৃতি নৈসর্গিক বস্তুর উপাসক ছিলেন, এই মতই সর্বতোভাবে প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। .....উইলসনও অঙ্গীকার (স্বীকার) করেন, সমুদায়ে তিনটি মাত্র বৈদিক দেবতা;—অগ্নি, সূর্য এবং বায়ু বা ইন্দ্র। তাঁহারা কর্ম বা মহত্ত্বানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন(১ম, পৃ. ৭৭)।

আসলে, তৎকালীন সময়ে প্রকৃতি পূজার প্রচলন ছিল। সেই অনুসারেই দেবতাদের নাম ঠিক হত বা নির্দিষ্ট কাজের জন্য তারা পূজনীয় হতেন।

সে সময়ে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, ইন্দ্র প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-গোচর প্রাকৃত পদার্থের আরাধনাই প্রচলিত ছিল। উপাসকেরা অন্নাদি-লাভের উদ্দেশে এবং বিপদুদ্ধার ও দুঃখ-পরিহার প্রার্থনায় তাঁহাদের স্তুতি করিতেন, তাঁহাদিগকে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন এবং সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন। .....তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্বাপেক্ষা তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন। তাঁহারা তখন ঐ সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বভাব ও গুণ কিছুই পরিজ্ঞাত ছিলেন না।

.....মনুষ্যেরা কোন আদিম-কালাবধি আপনাদের উপাস্য দেবতাকে ঐরূপ মানব-ধর্মাক্রান্ত জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন, অদ্যাবধি ঐরূপ করিতেছেন এবং হয়ত চিরকালই ঐরূপ করিতে থাকিবেন। .....এই প্রকার অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের সহজ প্রকার উপাসনা যে পৃথিবীস্থ অন্য অন্য প্রাচীন মানব-জাতির ন্যায় হিন্দুদিগেরও জাতীয় ধর্ম ছিল, তাঁহাদের আদিম শাস্ত্র বৈদিক-সংহিতায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। .....সে সময়ে দেব-মন্দির ও দেব-প্রতিমূর্ত্তি নির্মিত ও স্থাপিত হইবার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না(১ম, পৃ. ৭২-৭৪)।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, প্রাচীনতর বৈদিক দেবগণের মধ্যে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক (অর্থাৎ নৈসর্গিক বস্তু ও ব্যাপারের অধিষ্ঠাত্রী) দেবতাগণই অগ্রগণ্য। ঋগ্বেদ-সংহিতার অধিকাংশই ঐরূপ দেবতার স্তুতি সমূহেই পরিপূর্ণ। ইরানীদিগের অবস্তার মধ্যে মিত্র, বায়ু ইন্দ্রাদি নৈসর্গিক দেবতার নাম সন্নিবেশিত থাকাতে ঐরূপ দেবগণকেই অতি প্রাচীন বলিয়া অবধারিত করিতে

হয়(১ম, পৃ. ৮১)। বরুণ আর্য-কুলের একজন খুবই প্রাচীন দেবতা, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ইন্দ্র দেবতা অতটাও প্রাচীন নয়।

দত্ত মনে করতেন, সমগ্র বেদ-এর মধ্যে যথেষ্ট কালগত ব্যবধান আছে। তিনি বলেছেন, যে সমস্ত (বৈদিক) সংহিতা একসময়ে 'রচিত ও সঙ্কলিত' হয় নি এবং কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের ধর্ম্ম তার মধ্যে প্রকাশিত নয় নি।[২০] "সমগ্র বেদ এক সময়ের রচিত নহে এবং সমুদায় বৈদিক-ক্রিয়াও এক কালে প্রচলিত হয় নাই"(১ম, পৃ. ৫৯)।

প্রচলিত চতুর্বেদের পরিবর্তে তিনি পঞ্চবেদের ধারণা অনেক বেশি গ্রহণীয় মনে করেছেন। তার মধ্যে "সংহিতা ভাগের তাৎপর্য্যার্থ, রচনা প্রণালী ও ব্যাকরণ ঘটিত বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিয়া দেখলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক-সংহিতার তুল্যরূপ প্রাচীন অন্য কোন পুস্তক প্রচলিত নাই"(১ম, পৃ. ৫৯)।

বৈদিক সাহিত্য, এমনকি ঋগ্বেদ ও তার সমস্ত প্রাচীনত্বসহ কোনও এক সময়ে রচিত হয়নি। বেদ অপৌরুষেয় নয়, এক একজন ঋষি তাঁর মন্ত্রগুলি রচনা করেন এবং দ্রষ্টারূপে উল্লিখিত হন। সরস্বতী নদী তীরবর্তী প্রাচীন অঞ্চলগুলিই বৈদিক সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে বলে ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসকাররা মনে করেন। দত্তের মতে, "যদিও হিন্দুরা অগ্রে পঞ্চনদে আসিয়া অধিবাস করেন, তথাচ বোধ হয়, হিন্দু ধর্ম প্রথমে সরস্বতীতটে, অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রণালীবদ্ধ ও পরিস্ফুটিত হয়"(১ম, পৃ. ৭০)।

ঋগ্বেদের অন্তর্নিহিত ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে অক্ষয় দত্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, "বেদ-সংহিতা পাঠ করিয়া দেখিলে অক্লেশেই প্রতীতি জন্মিতে পারে, পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও সবিশেষ প্রভাবশালী বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ সমুদায়কে ভিন্ন ভিন্ন জীবিতবান

[২০]অসিতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

সচেতন দেবতা বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন। অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি মনুষ্যের ন্যায় ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন, ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন"(১ম, পৃ. ৭৭-৭৮)।

প্রাচীন সমস্ত মানবজাতির কর্মকান্ডগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, প্রথমে প্রাকৃতিক শক্তিকেই তারা ঈশ্বর রূপে কল্পনা করেছে। এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ে ভীত হয়ে তাদের বশে আনার চেষ্টায় পূজা করেছে বিভিন্ন নৈবেদ্য সহযোগে। এভাবে প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক (বিভিন্ন লিঙ্গ) পূজার উদ্ভব ঘটেছিল।

এই ধর্মবিশ্বাসের কারণ হিসেবে তিনি অনুমানের আশ্রয় নেন ও বলেন, "মনুষ্যেরা প্রথম অবস্থায় ঋজু স্বভাব ও সরল-বুদ্ধি থাকেন। সেসময় তাঁহাদের উপাসনাকার্য্য ঐরূপ অকৃত্রিম স্তুতি বা তৎসহকারে দ্রব্যবিশেষ নিবেদন মাত্রেই পর্য্যাপ্ত হওয়া সম্ভব"(১ম, পৃ. ৭৮)। এবং এই প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে আনার চেষ্টার মাধ্যমে কিছু মানুষ জাদু বিদ্যার প্রচলন করেছিল। এবং এভাবেই পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটে।

তিনি প্রাচীন ভারতের বর্ণ প্রথা সম্পর্কে লিখেছেন—ব্রাহ্মণ সমুদায়ে হিন্দুদিগের সামাজিক ব্যবস্থা নানা বিষয়ে বর্ধিত দেখা যায়। সে সমস্ত সঙ্কলিত হইবার সময়ে বর্ণভেদ প্রণালী একরূপ সম্পূর্ণ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের বিষয় সুস্পষ্ট লিখিত আছে। প্রথমোক্ত তিন বর্ণ আর্য বংশীয়; শূদ্রেরা অনার্য্য। কৃষ্ণবর্ণ দস্যু বা দাসদের সহিত শুভ্রবর্ণ আর্যদিগের বদ্ধমূল বিরোধ ও ঘোরতর যুদ্ধ প্রসঙ্গ ঋগ্বেদ সংহিতার বহুতর স্থানে বিস্তৃত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের পূর্ব নিবাসী ঐ দস্যু বা দাসদিগের মধ্যে যাহারা মহাবল পরাক্রান্ত আর্যগণ কর্তৃক পরাভূত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করে, তাহারাই শূদ্র বোধ হয়। ঐ দাস সংজ্ঞাটি শূদ্রদের চিরসঙ্গী হইয়া আসিয়াছে।

রোমক স্বামীদের সহিত প্লেবদিগের ও স্পার্টাধিকারীদের সহিত হীল্টদিগের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, ভারতবর্ষীয় আর্যদের সহিত শূদ্রদিগেরও সেইরূপ কলঙ্কময় সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হইতেছে। আর্যরা

রাজা ও শূদ্রেরা দাস(১ম, পৃ. ৯৪-৯৫) ছিল। তিনি আরও লিখেছেন, অনতিপ্রাচীন পুরুষসূক্তে চারি বর্ণের বিষয়ই লিখিত আছে বটে, কিন্তু ঋগ্বেদের প্রাচীনতর সূক্ত সমুদয়ে বর্ণ-বিভেদ থাকিবার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না(১ম, পৃ. ৮৪)।

অক্ষয় দত্ত বৈদিক ধর্মে বহুদেবতার অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। শ্রীমান মাক্সমূয়েলার একস্থানে লিখিয়াছেন, হিন্দুরা সর্ব প্রথমে একেশ্বরবাদী ছিলেন, পরে বহুতর দেবদেবীর উপাসনাতে প্রবৃত্ত হন। শ্রীমান আদ্‌লফ পিকতে কহেন, একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনাই আর্য-কুলের আদিম ধর্ম ছিল; অনন্তর কালক্রমে বহুতর বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রীমান জ. মিয়র, আলবের রেবিল ওথ, গোল্ডস্টুকার ঐ সমস্ত মতে অসম্মত হইয়া উচিত মত প্রতিবাদ করিয়াছেন(১ম, পৃ. ৭৪-৭৫)।

তিনি আরও লিখেছেন, আর্য বংশীয়রা পৃথক হইয়া পড়িবার পূর্বে যে কেবল একেশ্বরবাদী ছিলেন, পিকতে সাহেবের এই মতের প্রমাণ বা পোষকতা ঐ বংশোদ্ভব কোন জাতির ইতিহাসের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না(১ম, পৃ. ৭৬-৭৭)। শেষে তিনি মূল্যায়ন করে বলেছেন, বেদাবলম্বী প্রথমকার সাধারণ হিন্দুরা যে বহুদেববাদী ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই(১ম, পৃ. ৭৭)।

দত্ত প্রামাণিক সূক্তের ভিত্তিতে উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচীনকালে "আর্যবংশীয় স্ত্রীগণও নিতান্ত হীনাবস্থ ছিলেন না। তাঁহারা দেবার্চনায় ও যজ্ঞানুষ্ঠানে অধিকারিণী ছিলেন, যজ্ঞসমাজেও উপস্থিত থাকিতেন, উদ্বাহকালে যৌতুকলাভেও সমর্থ হইতেন ও স্থলবিশেষে দুহিতৃ-পুত্রেরা শাস্ত্রানুসারে মাতামহের ধন অধিকার করিতেন। বিশ্ববারা নাম্নী একটি অত্রি-বংশীয় স্ত্রীলোক ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত একটি সম্পূর্ণ সূক্ত (অষ্টাবিংশ) রচনা করেন, এইরূপ লিখিত আছে। স্ত্রীজাতি শিক্ষালাভ বিষয়ে একেবারে বঞ্চিত থাকিলে ওরূপ কথার উল্লেখ থাকা কদাচ সম্ভব হইত না"(১ম, পৃ. ৮০)।

অর্থাৎ সেসময় হিন্দুজাতির স্ত্রীলোকদের সামাজিক মর্যাদা যথেষ্ট সন্মানজনক ছিল, তারা শিক্ষালাভে ও অন্যান্য বিষয়েরও অধিকারিণী ছিলেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, 'একসময়ে স্ত্রীলোকেরা প্রথমে একপতির পাণিগ্রহণ করিয়া পুনরায় অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিতেন'(১ম, পৃ. ৮৫)।

অক্ষয় দত্তের আলোচনার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি মানুষের ধর্মমত বিকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে মতান্ধতা ও পারস্পরিক বিরোধের পরিচয় পেয়েছেন(১ম, পৃ. ৯৯-১০০)। তিনি লিখছেন, "পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারেন, ঈরাণীদিগের সহিত হিন্দুদিগের পৃথক হইবার পর অবধি বৈদিক ধর্ম ভারতভূমির মধ্যে বিনা বিরোধে প্রচারিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কোন দেশীয় জাতীয় ধর্ম বিনা বিসংবাদে প্রচলিত হইবার বস্তু নহে। অবনীমণ্ডলে ধর্মনিবন্ধন যত যন্ত্রণা, যত নরহত্যা ও যত শোণিত-নিঃসারণ হইয়াছে, এত আর কিছুতেই হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কি পুরাতন, কি অধুনাতন, কি প্রলয়ীমান, কি অভ্যুদয়বান, সকল ধর্মই বিদ্বেষকলুষে কলুষিত হইয়া অধর্মের ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত ও পরিপালিত হইয়াছে।

হিন্দু-ঈরাণীদের বদ্ধ-মূলবিরোধ প্রসঙ্গে বেদ ও অবস্তা-কে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। খ্রীষ্টানদের ক্রুসেড ও মুসলমানদিগের ধর্ম-সংগ্রাম স্মরণ হইলে হৃদয় কম্পমান হইতে থাকে। হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের চির-বদ্ধ বিসংবাদে বৌদ্ধগণকে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে। মুক্তি-বিদ্বেষী [যুক্তি-বিদ্বেষী?] স্বমতাসক্ত ধর্মপ্রচারকেরা এমনি ক্রোধান্ধ ও হতবুদ্ধি হয় যে, বোধহয়, অধুনাতন রাজ্যশাসন-প্রণালী সমধিক প্রভাববতী না হইলে ভারতভূমি এ সময়েও উগ্রতর নিগ্রহ-তাপে পরিতপ্ত হইয়া নরকণ্ঠ-শোণিতে অভিষিক্ত হইত। অনতি প্রাচীন শৈব ও

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যে রূপ বিসংবাদ উপস্থিত হয়, পূর্বকালীন বৈদিক সম্প্রদায়দিগের ও পরস্পর তদনুরূপ বিরোধ ও বিদ্বেষ-রচনা হইয়াছিল, তাঁহার সন্দেহ নাই।"[২১]

তিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিচারের ভিত্তিতে সত্য বা তত্ত্ব নির্ণয়ের পন্থাই একমাত্র গ্রহণীয় পথ বলে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর কাছে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল বুদ্ধি। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যঃ "সমুদায় ধর্মসম্প্রদায়ীরা চিরকালই বুদ্ধি শক্তিকে ভয় করিয়া আসিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। জ্ঞানব্রত উপনিষদ বক্তারাও তাহাতে বর্জিত নহেন। .....বুদ্ধি ও ধর্মনীতি বিষয়ে অধিকার থাকাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব জন্মিয়াছে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি তত্ত্বলাভের একমাত্র সোপান। বুদ্ধি বিচার ব্যতিরেকে তত্ত্ব নিরূপণ করা আর চক্ষু-কর্ণ ব্যতিরেকে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া উভয়ই তুল্য।

কোন বিষয়ে আমাদের স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় আছে আর না আছে, তাহাতেও মনুষ্যের এত ভ্রম ও এত মত-ভেদ জন্মে যে, তাহারও নিশ্চয় করা বিচারাধীন হইয়া উঠিয়াছে। কুসংস্কার শূন্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি জ্ঞানরূপ পুণ্যতীর্থের যে স্থানে বা যে অবস্থায় লইয়া যায়, সেই স্থানে ও সেই অবস্থায়ই যাইব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যে সমস্ত তেজস্বী বুদ্ধি মনস্বী ব্যক্তি বুদ্ধি চালনা করেন, তাহাঁরাই প্রকৃতরূপ তত্ত্বানুরাগী। পরিশুদ্ধ যুক্তি-প্রণালী যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন করে, তাঁহারা কেবল তাহাকেই কল্যাণকর ও পরম পুরুষার্থ বোধ করিয়া জ্ঞানরূপ অমৃত-রসপানে পরিতৃপ্ত হন। যাঁহারা ঐরূপ বোধ না করেন, তাহাঁরা কদাচ তত্ত্বানুরাগী নহেন; আপনাদের মনঃ-কল্পিত মতের ও চির সঞ্চিত কুসংস্কারেরই অনুরাগী"(১ম, পৃ. ১০৯-১১০)।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় এই বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিচারের বা নিরপেক্ষতার অভাব আমরা লক্ষ্য করি ঐতিহাসিকদের মধ্যে। যদিও এর সূত্রপাত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের

[২১]রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *কামারের এক ঘা*, ২০০৩, পৃ. ২৪৪।

মাধ্যমে। যা অনুসরণ করেছিল আমাদের দেশের প্রথম পর্যায়ের ঐতিহাসিকরা এবং যার প্রভাব এখনও বর্তমান। তাই আমরা ভারতীয় ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকরণ দেখতে পাই।

অক্ষয় দত্ত বেদ ও উপনিষদের পার্থক্যটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সাধারণভাবে একে বলা যায়—কর্ম (যজ্ঞ) বনাম জ্ঞান (বেদান্তই সত্য)। দত্ত বলেছেনঃ "কোন স্থানে লিখিত আছে, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হন, আর কোথাও বা উল্লিখিত আছে, তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অথবা তাহাতে লীন হইয়া যান। সর্বত্র-ব্যাপী পূর্ণ-স্বরূপ পরব্রহ্মে লয় পাওয়া আর জীবের স্বীয় সত্তার বিনাশ হওয়া উভয়ই এক কথা'(১ম,পৃ. ১১১)। অর্থাৎ মৃত্যুই শেষ কথা, তারপরে আত্মার কী হয় তা সকলেরই অজানা।

দত্ত তাঁর স্বাধীন ও মুক্ত মন দিয়ে বৈদিক সাহিত্য বিশ্লেষণ করে যে উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন তা তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন,*"এখন, বেদ-প্রাণ হিন্দুমণ্ডলি! শ্রবণ কর! তোমাদের প্রাচীন মীমাংসকগণ অর্থাৎ বেদ-মন্ত্রের মীমাংসাকারী পূর্বকালীন আচার্য্যগণ না ঈশ্বরই মানিতেন, না দেবতাই স্বীকার করিতেন। তাঁহারা নির্দেব ও নিরীশ্বর। যে মীমাংসায় যাগ-যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং সেই বিষয়েরই বিধি, নিষেধ ও ফলাফল বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছে, সেই মীমাংসা দর্শন যে নাস্তিকতাবাদী একথা শুনিলে আপাততঃ অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন বোধ হয়। কিন্তু একথার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। মীমাংসা পণ্ডিতেরা বিশেষতঃ প্রাচীনতর মীমাংসকগণ, মুক্তকণ্ঠে ও সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন"*(২য়, পৃ. ৪১)।

বেদান্তের সপক্ষে তিনি একটিই কথা বলেছেন—একটি বিষয়ে বেদান্ত শাস্ত্রে সমধিক ঔদার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেটি এই যে, হিন্দু ধর্মোচিত আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়া না চলিলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। আপন আপন বর্ণ ও

আশ্রমের উপযুক্ত ধর্মানুষ্ঠান কর আর না কর, তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনের ইচ্ছা হইলেই সে বিষয়ে সম্যক অধিকারী হইবে।[২২]

তিনি প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিদের সম্পর্কে বৈদান্তিকদের যে মূল্যায়ন করেছিলেন, তাও একবার শুনে নেওয়া যাক:*.....(প্রাচীন ভারতীয়) দার্শনিক গ্রন্থকারেরা অনেকেই সতেজ বুদ্ধির সুপুষ্ট বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। .....তাঁহারা বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ পূর্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণের নিশ্চিত উপায় চেষ্টা না করিয়া কেবল আপনাদের অনুধ্যান বলে দুইএকটি প্রকৃত মতের সহিত অনেকগুলি মনঃকল্পিত মত উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের একটি পথ-প্রদর্শকের অভাব ছিল। একটি বেকন্—একটি বেকন্–একটি বেকন্ তাঁহাদের আবশ্যক হইয়াছিল। একটি তাদৃশ গুরুর আশ্রয়-বিরহে, তাঁহারা মেঘাচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃতনিশীথ সময়ে দুর্গম বনস্থলে পথ-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চিরজীবন পরিভ্রমণ করিয়াছেন। যদি কদাচিৎ এক একবার ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুল্লতা প্রকাশিত হইয়া অন্ধকারের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, পরক্ষণেই আবার ঘোরতর তিমির-রাশি উপস্থিত হইয়া সমুদায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাঁহাদের চিরস্থায়ী সূর্য্যপ্রভা আবশ্যক ছিল*(২য়,পৃ. ৫২-৫৩)।

কোন ‘সূর্য’-এর কথা অক্ষয় দত্ত বোঝাতে চেয়েছিলেন? “রত্নগর্ভা ইয়ুরোপ দুইকালে যেরূপ দুইটি অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছেন, সেরূপ আর কস্মিনকালে কুত্রাপি হয় নাই। বেকন্ ও কোন্ত, দুই ভূ-খণ্ডের (ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স দেশের) উপর দুই সূর্য্য। ঐ দুইটি পরম পবিত্র জ্যোতির্ময় শব্দ মূর্ত্তিমান জ্ঞানেরই সংজ্ঞা। ঐ দুইটি নামের উজ্জ্বল মহিমায় বসুন্ধরা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন”(২য়,পৃ. ৫৩)। অক্ষয় দত্তের চিন্তার (মতাদর্শ) প্রতি এঁদের প্রভাব ছিল অবিস্মরণীয়।

[২২]তদেব, পৃ. ২৫১।

তিনি বেকনীয় অভিজ্ঞতাবাদ প্রসূত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বলেছেন, বেদবিশ্বাস নিয়ে তিনি যেমন ঠাট্টা করেন, তেমনি ঈশ্বর বিশ্বাসীদের চমকে দেওয়ার জন্যেই তিনি ষড়দর্শনের প্রসঙ্গ এনেছেন। নইলে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়-এর "উপক্রমণিকা"য় দর্শন প্রসঙ্গ আনার কোনো দরকার ছিল না।[২৩] দত্ত লিখেছেন, "এই ষড়দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ-সৃষ্টিকর্ত্তা (প্রথমে একমাত্র পরমেশ্বরই ছিলেন, অপর কিছুই ছিল না, তিনিই সমুদায় সৃষ্টি করেন এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা) স্বীকার করেন নাই। কপিল-কৃত সাংখ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ, পতঞ্জলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্ব-স্রষ্টা না বলিয়া বিশ্ব-নির্ম্মাতামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গোতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসা পণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর সৃষ্টিকর্ত্তার সম্ভাবনা কি?(২য়,পৃ. ৫৪)।

ষড়দর্শনের আলোচনায় তিনি প্রথমেই সাংখ্য দর্শনের আলোচনা করেন। ষড়দর্শনের আলোচনায় দত্তের মূল আগ্রহ ছিল বেদের সঙ্গে ঈশ্বর বিরোধিতায়। তাই সাংখ্য প্রসঙ্গে প্রথমেই তিনি লিখেছেন—মহর্ষি কপিল সাংখ্য মতের প্রবর্ত্তক। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।

সাংখ্য প্রবচন। ৯২ সূত্র।

---

[২৩]তদেব, পৃ. ২৫৩।

কেন না ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না (কপিল ঋষির এই নাস্তিকতাবাদ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে সাংখ্য পণ্ডিতেরা নানা রূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন, শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর নির্গুণ ও জগৎ সগুণ অর্থাৎ নানা প্রকার গুণ-বিশিষ্ট; অতএব নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ সংসারের উৎপত্তি হইল?)।

যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ না হইল, তবে কিরূপে জগতের সৃষ্টি হয়, এ বিষয় সুতরাং তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন,

নাবস্তুনী বস্তুসিদ্ধিঃ।

সাংখ্য প্রবচন। ১। ৭৮সূত্র।

পূর্বস্থিত বস্তু না থাকিলে, কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না(২য়, পৃ. ১-২)।

অর্থাৎ প্রথমে কিছু না থাকলে, হঠাৎ করে নিজে থেকে কোন বস্তু উৎপন্ন হতে পারে না। সমস্ত বস্তুই আগেকার কোন না কোন বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়; যেমন, মাটি থেকে ঘট, দুধ থেকে দই, রূপা থেকে মুদ্রা, ইত্যাদি।[২৪] অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির উপাদান নিয়তকাল (সৃষ্টকাল) থেকে উপস্থিত বলেই নতুন নতুন বস্তুর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

তিনি সাংখ্যের এই সৃষ্টিতত্ত্ব-এর সাথে তাঁর সমকালীন জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত বইয়ের (*On The Origin of Species*, 1859 C. E.) অভিযোজন তত্ত্বের (The Theory of Evolution) মিল খুঁজে পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি নিজে জীববিদ্যার চর্চা করতেন।

[২৪]অশোক মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বিশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ*, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভারতীয় ষড়দর্শন প্রসঙ্গে, ২০২০, পৃ. ৪৪১।

এবং তাঁর বালিগ্রামের 'শোভনোদ্যান'টি তাঁর জীববিদ্যা অনুরাগী মনের পরিচয় বাহক। এমনকি তিনি ডারউইনেরও গুণগ্রাহী ছিলেন একথা আমরা জেনেছি।

তিনি লিখেছেনঃ অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ সর্বপ্রধান ইয়রোপীয় পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মত The Theory of Evolution কিয়দংশ কি এই সাংখ্য মতের অনুরূপ বোধ হয়-না? তাঁহারা বলেন, যেমন শূককীট রূপান্তরিত হইয়া প্রজাপতি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক বস্তু ও এক প্রাণী পরিণত হইয়া অন্য বস্তু ও প্রাণী উৎপন্ন হইয়া আসিয়াছে। কপিল ঋষি তাহাঁদের ঐ মতের একটি সঙ্কুচিত অঙ্কুর রোপণ করিয়া গিয়াছেন একথা বলিলে কি বলা যায় না?[২৫] কপিল কৃত বস্তু সৃষ্টির ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক না হলেও তা জীবের অভিযোজন তত্ত্বের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়।

কিন্তু তিনি আমাদের একথা জানাতে ভোলেননি যে, বেদের প্রামান্য (সবার উপর বেদই সত্য) কপিলকেও মানতে হয়েছেঃ চিরকাল হিন্দু সমাজে বেদের কি অতুল প্রভাব ও দুর্জয় পরাক্রমই চলিয়া আসিয়াছে। কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অক্লেশে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু বেদের মহিমা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও বেদার্থ প্রামাণিক বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন(২য়,পৃ. ৮)।

সাংখ্য দর্শনের কয়েকটি বিষয় নিয়ে অনেক "তর্ক-বিতর্ক বিচার ও সিদ্ধান্ত" আছে, অক্ষয় দত্ত সেই সব বিষয়কে "কুটিল ও জটিল অবাস্তবিক" বলে উল্লেখ করেছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেনঃ এই তিনটি গুণের কার্য্য ও পরস্পর সম্বন্ধাদি লইয়া সাংখ্য শাস্ত্রে সবিশেষ, আন্দোলন সহকারে অনেক তর্ক, বিতর্ক, বিচার ও সিদ্ধান্ত আছে।

[২৫]রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।

সেই সমস্ত কুটিল ও জটিল অবাস্তবিক বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিলে, পাঠকগণের অসুখ বই সুখের বিষয় হইবে না।

ফলতঃ একবার মনে হয়, চিরকাল এই সমস্ত ভ্রান্তিভার বহন করিবারই বা প্রয়োজন কি? পুনর্ব্বার ভাবি, ইতিহাস রচয়িতাদিগকে সত্য মিথ্যা সকলই কীর্ত্তন করিতে হয়। সূর্য্য-জ্যোতিঃ বিশুদ্ধাশুদ্ধ সকল বস্তুই স্পর্শ করিয়া থাকে। মানবীয় মনের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে কখন বা সুখী ও কখন দুঃখিত হইতে হয়। এই পুস্তকের অধিকাংশই তো ভ্রান্তি-ভূধরের বর্ণনা বই আর কিছুই নয়। মানুষে বুঝি ঐ অতি দুর্ভেদ্য ভূধর শ্রেণীর বহুতর শৃঙ্গ অতিক্রম না করিলে, তত্ত্বভুবন আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না(২য়,পৃ. ৫)।

এ যেন বিদ্যাসাগরের সেই সাংখ্য ও দর্শনকে ভ্রান্ত বলা মন্তব্যের ভাবসম্প্রসারণ! তিনি লিখছেন ওটার অনেক কিছুই যে ভুলভ্রান্তির শিকার তা পাঠককে একেবারে গোড়াতেই জানিয়ে রাখছেন। অক্ষয় দত্ত যে উপাসক সম্প্রদায়ের ইতিহাস লিখছেন, তাকে এখানে বলেই দিচ্ছেন ভ্রান্তিভূধর! ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণ যার চর্চা করেন তা ভ্রান্ত মতাদর্শ ছাড়া আর কিছু নয়! আর সেই *"অতি দুর্ভেদ্য ভূধরশ্রেণীর বহুতর শৃঙ্গ"* এই (ভা উ-স) বইতে তিনি অতিক্রম করছেন সত্য জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে।[২৬]

সাংখ্য বিষয়ে অক্ষয় দত্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, *সাংখ্য-শাস্ত্রের কোন কোন অংশে সমধিক বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এ অংশটি* (প্রকৃতি থেকে মহৎ তত্ত্ব, মহৎ তত্ত্ব থেকে অহংকার, ইত্যাদি) *নিতান্ত মনঃকল্পিত একথা এখন বলা বাহুল্য। যে সময়ে, ভূমণ্ডলে বিজ্ঞান-রাজ্যের পথ-প্রদর্শক বেকন্* (Francis Bacon) *ও কোন্তের* (Auguste Comte)

[২৬]আশীষ লাহিড়ী(সম্পা.), *ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুবীজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত*, অশোক মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তঃ বৃত্ত ভাঙার ইতিবৃত্ত, ২০২৪, পৃ. ৮৮।

জন্ম হয় নাই, সে সময়ে আর অধিক প্রত্যাশা করাই বা কেন?(২য়,পৃ. ৭) অর্থাৎ যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সূত্রপাতের আগেকার মত হিসাবে সাংখ্য দর্শন বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। আর বেকনের অভাব তো অক্ষয় দত্ত অনুভব করতেনই।

জগত স্রষ্টা ঈশ্বরে বিশ্বাস যদি আস্তিকতাবাদ স্বীকারের প্রধান অবলম্বন হয়, অক্ষয় দত্তের মতে, *"প্রায় সমুদয় ষড়দর্শনকে নাস্তিকতা প্রতিপাদিক বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়।"* অর্থাৎ ষড়দর্শনগুলি জগত স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি। তারপরে তিনি দেখান, *"উল্লিখিত ষড়দর্শনের প্রতি অনেকানেক অস্তিক্যবুদ্ধি ভক্তিমান লোকের বিশেষরূপে শ্রদ্ধা আছে। ঐ ছয়ের মধ্যে (ছয়টি ষড়দর্শন—সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত) অধিকাংশ নাস্তিকবাদী ও কোন কোনটির মতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, একথা শুনিলে তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া উঠিবেন বোধ হয়।"*[২৭] পাতঞ্জল দর্শনও সাংখ্যের থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু সেটা সেশ্বর সাংখ্য দর্শন বলে পরিচিত।

মহর্ষি কণাদ 'বিশেষ' নামে একটি পদার্থ স্বীকার করেন বলে তাঁর দর্শনের নাম "বৈশেষিক দর্শন।" তারা সপ্ত পদার্থবাদী; এই সাতটি পদার্থ হল—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। দ্রব্য নয় প্রকার, যথা—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। প্রথম চারিটি দ্রব্যের কেবলমাত্র পরমাণু নিত্য, আকাশ নিত্য কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিজ্ঞানোৎসাহী অক্ষয় দত্ত স্বাভাবিকভাবেই এই বৈশেষিক দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তিনি লিখেছেন, ইয়ুরোপের মধ্যে পরমাণুবাদ এখন সর্ববাদি-সম্মত। শ্রীমান ডেল্টন ইদানীং (অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তিনি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন) ইহার পুনরুদ্ভাবন করেন এবং রসায়নবিদ্যা সংক্রান্ত বিচারক্রমে একরূপ সপ্রমাণ অথবা অতিমাত্র

[২৭]অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

সম্ভাবিত করিয়া তুলেন। তাহার দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল পূর্বে ভারতবর্ষে মহর্ষি কণাদ এই মত প্রবর্ত্তিত করেন তাহার সন্দেহ নাই। পূর্বকালে গ্রীস দেশে শ্রীমান ডেমক্রিটস এইরূপ পরমাণুবাদ প্রকাশ করিয়া যান। কণাদের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, স্থির করা কঠিন। এই উভয়ের মধ্যে কেহ কাহার নিকট ঋণ বন্ধনে বদ্ধ আছেন কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্ব স্ব দেশে নিজ নিজ মত প্রচলিত করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। ডেমক্রিটস্ গ্রীস দেশীয় কণাদ এবং কণাদ ভারতবর্ষীয় ডেমক্রিটস্(২য়, পৃ. ১৯)। এইভাবে তিনি প্রাচীন ভারতের দর্শন শাস্ত্রের জয়গান করেছিলেন।

বৈশেষিক দর্শনে সাংখ্য অভিব্যক্তিবাদের অঙ্কুর থাকলেও তিনি ঐ দর্শনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, অন্যান্য দর্শনকার অপেক্ষা কণাদের জড় পদার্থের জ্ঞানানুশীলনে সমধিক প্রবৃত্তি জন্মে দেখা যাইতেছে। তিনি পরমাণুবাদ সংস্থাপন করিয়া সে বিষয়ের সূত্রপাত করেন। মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, বৃক্ষের রসসঞ্চরণ, করকা ও হিমশিলা, চৌম্বকাকর্ষণ, জড়ের সংযোগ-বিভাগাদি গুণ ও গত্যাদি ক্রিয়া প্রভৃতি নানা ব্যাপারে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, সূত্রপাতেই অবশেষ হইল। অঙ্কুর রোপিত হইল, কিন্তু বর্দ্ধিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইল না। উহা সংস্কৃত, পরিবর্দ্ধিত ও বহুলীকৃত করিয়া ফল-পুষ্প-শোভায় সুশোভিত করা ভারতভূমির ভাগ্যে ঘটিল না। কালক্রমে সে সৌভাগ্য বেকন্, কোন্ত (কোঁত) ও হম্বোলটের জন্মভূমিতে গিয়া প্রকাশিত ও প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠিল। তথাপি আমাদের সুশ্রুত, চরক, আর্য্যভট্টাদির পদকমলে বারবার নমস্কার(২য়, পৃ. ১৯-২০)।

জগতের কারণ নির্ধারণ দর্শন শাস্ত্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এতে কণাদ পদার্থ গণনার সময় আস্তিক মাত্রেরই স্বীকৃত পরম পদার্থ ‘পরমেশ্বরের’ নাম উল্লেখ করলেন না কেন? শুধু গণনা নয়, সমগ্র বৈশেষিক সূত্রের মধ্যে কোথাও পরমেশ্বরের নাম স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই।

পরবর্তীকালের বৈশেষিক পণ্ডিতরা দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত আত্মা শব্দের দুরকম অর্থ করেনঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা। টীকাকারেরা কণাদের সূত্র বিশেষের একটি বিশেষ শব্দ থেকে ঈশ্বরের বিষয় নিষ্পন্ন করেন, এটা ঠিক; কিন্তু যখন জগতের কারণ নির্ধারণ করা দর্শন শাস্ত্রের একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্ব কারণ বিবেচনায় তাঁর স্থির বিশ্বাস থাকত, তাহলে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ না দেওয়া তাঁর পক্ষে কোনো মতেই সঙ্গত হতে পারে না।

ঈশ্বর বিষয়ে যে রকম বিশ্বাস থাকায় টীকাকারেরা সূত্রের মধ্যে সেই প্রসঙ্গ না দেখেও তা থেকে যোগে কোনো রকমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন, কণাদ ঋষির সেরকম বিশ্বাস থাকলে সূত্রের মধ্যে ঈশ্বর প্রসঙ্গ স্পষ্ট করে না লিখে তার মধ্যেকার কোনো বিশেষ শব্দের অভ্যন্তর গুহায় তা প্রচ্ছন্ন রাখা কি কোনোভাবেই সম্ভব হত? টিকাকারেরা যদি নিজেরা সেই সূত্রগুলি রচনা করতেন তাহলে কী করতেন একবার ভেবে দেখলেই হয়। বারবার যে ঈশ্বরের নাম কীর্তন করতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। করবেন নাই বা কেন? যাঁর যাতে দৃঢ় বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি থাকে, সুযোগ ও প্রয়োজন উপস্থিত হলে তিনি তা কীর্তন না করে থাকতে পারেন না।

কেবল ঈশ্বরের নাম তো অল্প কথা, তাঁরা "গোপবধূটিদুকূলচৌরায়" ও অন্যান্য বিশেষণে বিশেষিত কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ষষ্ঠী, পঞ্চানন, প্রভৃতি কত দেবতার পদযুগলে প্রণিপাত করে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ সম্পাদন করতে পারতেন। যদি তাঁদের মতো কণাদ ঋষির ঈশ্বরে আস্থা থাকত, তাহলে তিনি পদার্থ গণনা, সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা ও মুক্তিসাধন ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনো না কোনো সূত্রে ঈশ্বরের বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে থাকতে পারতেন না। পক্ষান্তরে, তাঁর মতে পরমাণু পুঞ্জের সংযোগে জড় জগতের উৎপত্তি হয়; অদৃষ্ট অর্থাৎ অদৃষ্ট কারণ বিশেষ সেই সংযোগের

প্রবর্তক। তাতে ঈশ্বরের কৃত কর্ম প্রসঙ্গ বিন্দুমাত্র লেখেন নি। এই সমস্ত পর্যালোচনা করে দেখলে প্রতীয়মান হয় যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না।[২৮]

ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক মহর্ষি গোতম। অক্ষয় দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "গোতম ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতেন এমন বোধ হয়না"(২য়, পৃ. ২৩)। পরবর্তী নৈয়ায়িকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাঁকে নির্মাণকর্তা বলেছেন, সৃষ্টিকর্তা নয়। .....অক্ষয় দত্ত ন্যায়শাস্ত্রকে নিরীশ্বরবাদী দর্শন বলেই গণ্য করেছেন। .....নাস্তিকতার কারণে অক্ষয় দত্ত গোতম ও কণাদকে সমপর্যায়ভুক্ত (নাস্তিক) মনে করেছেন। কিন্তু বেদ উভয়ের (ন্যায় ও বৈশেষিকের) পরম শিরোধার্য্য বস্তু। এ তো একটি সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়। ভাবিলে বোধ হয় যেন, কণাদ ও গোতম নামে "দুইটি গুপ্ত বুদ্ধ বেদ-বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ভূমন্ডলে বিচরণ করিতেছেন"। .....সারা ভারতে বঙ্গদেশ যে ন্যায় দর্শনের অনুশীলনে বিশেষ অগ্রণী ছিল, এই সত্য অক্ষয় দত্ত তাঁর ন্যায় দর্শনের আলোচনায় গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[২৯] তিনি এই দুই দর্শনের স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করেছেন এরকম—'এক দিকে বেদ ও বেদান্ত, অপর দিকে বৌদ্ধ ও চার্বাকশাস্ত্র, গোতম ও কণাদ দর্শন ঐ উভয়ের মধ্যস্থলবর্ত্তী'(২য়, পৃ. ২৮)।

মীমাংসা দর্শনের প্রবক্তা মহর্ষি জৈমিনি। অক্ষয় দত্ত এই দর্শন প্রসঙ্গে বলেছেন, ".....শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন করিয়া ধর্মসংস্থাপন করা এই দর্শনের প্রধান প্রয়োজন (বা লক্ষ্য) .....এই ব্যাপারকে অধিকরণ বলে"(২য়, পৃ. ২৯)। এই দর্শনে বেদকে নিত্য বলা হয়েছে। যে মীমাংসায় যাগ-যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং সেই বিষয়েরই বিধি, নিষেধ ও ফলাফল বিশেষরূপে বিচারিত হইয়াছে, সেই মীমাংসা দর্শন যে নাস্তিকতাবাদী একথা শুনিলে আপাততঃ

[২৮]অশোক মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ৪৫৪-৪৫৬।

[২৯]অসিতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪।

অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইবেন বোধ হয়। কিন্তু একথার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। মীমাংসা পণ্ডিতেরা বিশেষতঃ প্রাচীনতর মীমাংসকগণ, মুক্তকণ্ঠে ও সুস্পষ্টরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন(২য়, পৃ. ৪১)।

এই দর্শনের মতে বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত নয়, কেননা ঐরূপ সম্বন্ধকারী পুরুষ বিদ্যমান নাই। .....কেবল ঈশ্বর নয়, এই দর্শনের মতে দেবতাও নাই বলিলে বলা যায়। যাবতীয় দেবতামন্ত্র-স্বরূপ; শরীর-বিশিষ্ট নয়(২য়, পৃ. ৪২)। এই অশরীরী ঈশ্বর বিষয়টি প্রসঙ্গে অক্ষয় দত্ত একটি মজার কথা লিখেছেন, মীমাংসা দর্শন মতে ".....যদি ইন্দ্রদেব যজমানের আহ্বান গ্রহণ করিয়া ঘটে বা প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাহা হইলে ঐরাবতের ভার বলে ঘট ও প্রতিমা একবারে চূর্ণায়মান হইয়া যাইত"(২য়, পৃ. ৪২)।

অক্ষয় দত্ত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' থেকে চার্বাক দর্শনের শ্লোকগুলি উদ্ধৃতি সহ অনুবাদ করেছেন(২য়, পৃ. ৫৪-৫৫)। চার্বাক দর্শন ভারতের সেই প্রাচীন দর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম যা বেদে বিশ্বাসী নয় বা নাস্তিক দর্শন। অর্থাৎ ঈশ্বরে ঘোরতর অবিশ্বাসী ছিলেন চার্বাক। এমনকি তিনি পরকালও স্বীকার করতেন না। 'প্রত্যক্ষ' ছাড়া আর কোন প্রমাণ চার্বাক দর্শন স্বীকার করেনি। এইসূত্রে তিনি কালবাদ, স্বভাববাদ প্রভৃতি নাস্তিকবাদী দর্শনেরও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন (২য়, পৃ. ৫৬)। সবশেষে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক দর্শনের বহু সাদৃশ্যের বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং H. H. Wilson ও H. T. Colebrook-এর উদ্ধৃতি যোগে উল্লেখ করেন যে, এক্ষেত্রে (দর্শনশাস্ত্রে) গ্রীসই ভারতের কাছে ঋণী ছিল।[৩০]

[৩০]তদেব, পৃ. ১১৬।

তিনি যুক্তিবাদী বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে ন্যায়-বৈশেষিক-মীমাংসা ইত্যাদি প্রাচীন দর্শনগুলির মূল তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। যার মূল নির্যাস হিসাবে আমরা পাই—*ষড়দর্শনের প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ সৃষ্টিকর্তা (ঈশ্বর) স্বীকার করেন নাই। কপিলকৃত সাংখ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ, পতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করেন কিন্তু তাকে বিশ্ব স্রষ্টা না বলে বিশ্ব নির্মাতা মাত্র বলেছেন। গৌতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কারও দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। প্রাচীন মীমাংসা পণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করেছেন। আর বেদান্তের মতে, জগৎ সৃষ্টি হয়নি, বিশ্ব ব্যাপার ভুল বিষয়, এতে আর সৃষ্টি কর্তার সম্ভাবনা কি?*

ধর্মমত, মোক্ষ-এর সাধনা ইত্যাদি বিষয়কে দত্ত 'মানসিক রোগ' মনে করতেন। তিনি লিখেছেন, "সন্ন্যাসী, সৎনামী, বীজমার্গী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী প্রভৃতির গূঢ় মন্ত্র ও গুহ্য ব্যাপার যেরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কি বলিব? এরূপ কার্য্য সাধন করিতে হইলে, সকলকেই বিশেষ যত্ন, সমধিক পরিশ্রম ও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে হয়! আমাকে তদতিরিক্ত এই জীবন্মৃত শরীরেরও স্বাস্থ্যক্ষয় স্বীকার করিয়া আত্ম-সন্নিধানে অপরাধী হইতে হইয়াছে। এই সমস্ত অঙ্গীকার করিয়াও, যদি জনসমাজ বিশেষের কোন অন্তর্ভূত মানসিক রোগের বিষয় কিছু নূতন জানিতে পারিয়া থাকি, তবে সেটি আমার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে(২য়, পৃ. ৩১৬)।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ-প্রথমত, এতে অক্ষয় দত্ত নিজের দার্শনিক মত স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত, নানা মতাদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বারবার ঔপনিবেশিক শাসনে দেশের দুর্গতি, মূল্যবৃদ্ধি, অপরাধ বৃদ্ধি ও নানাভাবে সমাজের অধঃপতনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আক্ষেপ করেছেন। তাঁর তত্ত্ব আলোচনার বড় একটি প্রেরণা এসেছিল তাঁর সমাজ ভাবনা থেকে। দেশের পরাধীনতার

গ্লানি তাঁকে চঞ্চল করেছিল। তাঁর রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এই প্রসঙ্গগুলির উল্লেখ দেখতে পাই।

মনুসংহিতায় হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণে ও বিভিন্ন বর্ণ সঙ্করে বিভক্ত দেখা যায়। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত মহিমান্বিত করে দেখানো হয়েছে। অক্ষয় দত্তের ভাষায় এতে, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব একেবারে গগন (আকাশ) স্পর্শ করেছিল। ব্রাহ্মণের গগনচুম্বী মহিমা সত্ত্বেও বিভিন্ন বর্ণের বিশেষত উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রীর মধ্যে অনুলোম বিবাহে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু উচ্চবর্ণের স্ত্রী ও নিম্নবর্ণের পুরুষের (প্রতিলোম) বিবাহ বিশেষত ব্রাহ্মণ কন্যা ও শূদ্র পুরুষের বিবাহ কঠোর সামাজিক শাসনের সম্মুখীন হত। উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে অনুলোম বিবাহের (উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রী) সন্তান কখনোই সবর্ণ বিবাহের সন্তানের মত সমান অধিকার ভোগ করত না। প্রতিলোম বিবাহের সন্তান সমাজে নিগৃহীত হত। ব্রাহ্মণ কন্যা ও শূদ্র পুরুষের সন্তান চন্ডাল হবে, এই নির্দেশ ছিল।[৩১]

মনুসংহিতার সমাজের সঙ্গে উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দু সমাজের তুলনা করে অক্ষয় দত্ত লিখেছেন, "সে সময়ের হিন্দু সমাজ সর্বাংশে বিশুদ্ধ ছিল না সত্য বটে, কিন্তু কোন কোন অংশে এক্ষণকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। উহার (হিন্দু সমাজের) কি অধোগতিই না হইয়া আসিয়াছে! এখন বিধবা-বিবাহ রহিত, অসবর্ণ-বিবাহ রহিত, গান্ধর্ব-বিবাহ রহিত, স্বয়ম্বর-বিবাহ রহিত, বাল্য-বিবাহের প্রাদুর্ভাব ও কৌলীন্য-প্রথার পৈশাচী কান্ড! ফলতঃ ঐ পুরাতন সমাজটি ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া এমন পচিয়া উঠিয়াছে যে, চতুর্দিকে তাহার দুর্গন্ধে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না"(২য়, পৃ. ৬৫)।

[৩১]তদেব, পৃ. ১১৬-১১৭।

মনুসংহিতায় তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি ফুঁটে উঠেছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে মাংস ভোজন, মদ্যপান ও স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে দোষ নেই কারণ এসব বিষয়ে প্রাণীদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে কিন্তু এসব থেকে নিবৃত্ত হতে পারলে মহা ফল পাওয়া যায়। তখনও অতিথিকে গোমাংস দান করার রীতি ছিল বলে অক্ষয় দত্ত উল্লেখ করেন। অন্যান্য মাংসাহারও বহুল প্রচলিত ছিল।[৩২]

অক্ষয় দত্তের মতে রামায়ণ (মহাকাব্য), পুরাণ জাতীয় সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম। এর অনেক প্রমাণ তিনি উপস্থিত করেছেন। তার একটি উদাহরণ হল ভাষাগত প্রাচীনত্ব। রামায়ণের ভাষা শূদ্রক কালিদাসাদির অপেক্ষায় অনেক প্রাচীন। তাহাতে সারসিক প্রয়োগ বিরুদ্ধ অনেকানেক পদ দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনি লিখেছেন, গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস যে সময় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগমন করেন, সে সময়ে অর্থাৎ খ্রী: পূ: চতুর্থ শতাব্দীতে সহমরণ গমনের প্রথা পূর্ব দিকে মগধ দেশ পর্য্যন্ত প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল। সমগ্র রামায়ণে এ বিষয়ের একটি উদাহরণও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ঐ গ্রন্থ রচনার সময়ে ঐ প্রথা বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে দশরথের মৃত্যু ঘটনার বিবরণ স্থলে তাঁহার কোন না কোন মহিষী সহগামিনী বলিয়া বর্ণিত হইতেন(২য়, পৃ. ৯৩)। তাই তিনি এর থেকে অনুমান করেছেন যে, রামায়ণ অবশ্যই এই সময়ের আগে লেখা।

কিন্তু প্রচলিত রামায়ণের সমস্ত অংশটিই প্রাচীন নয়, এতে অনেক প্রক্ষিপ্ত অর্বাচীন অংশ আছে। তাঁর মতে, এইসব প্রক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে আছে শিব ও বিষ্ণুর স্তুতিবাচক সমস্ত শ্লোক এবং রামচন্দ্রের দেবত্ববাচক বা অবতারত্ব সূচক শ্লোকসমষ্টি। "চোর যে রূপ, বুদ্ধ ও সেই রূপ, নাস্তিককেও সেই রূপ জানিও"(২য়, পৃ. ৯৪)। ইত্যাদি উক্তি রামায়ণে পরবর্তী যুগের সংযোজন

[৩২]তদেব, পৃ. ১১৭-১১৮।

বা প্রক্ষিপ্ত। রামায়ণের রামানুজকৃত টীকা অনুসরণ করে তিনি এইসব প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি নির্দেশ করেছেন। অক্ষয় দত্ত উল্লেখ করেছেন যে ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরেও রামায়ণের নানা রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বালিদ্বীপের রামায়ণে "উত্তরকান্ড .....সংযোজিত নাই"(২য়, পৃ. ৯৫)।

মহাভারতের আলোচনায় অক্ষয় দত্ত বহু প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। তিনি সমসাময়িক দেশ ও সমাজের দুরবস্থার জন্য অনেক দুঃখ ও বিলাপ করেছেন। মহাভারতও কোন একজনের রচনা নয়, অথবা একজনের দ্বারা সঙ্কলিত নয়। মহাভারতেই আছে যে, প্রথমে ভারত সংহিতা চতুর্বিংশতি-সহস্র শ্লোকময়ী ছিল(২য়, পৃ. ১০৩)।

তিনি আরও বলেন "মহাভারতেরই অন্তর্গত উল্লিখিত কয়েকটি প্রমাণ অনুসারে ঐ গ্রন্থের চারি পাঁচ প্রকার অবস্থা লক্ষিত হইতেছে"(২য়, পৃ. ১০৫)। প্রাচীনতম মহাভারত বৈদিক যুগের সমকালবর্তী বলে তিনি অনুমান করেছেন। বলেছেন "ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে পরিক্ষিৎ জনমেজয়াদির প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়"(২য়, পৃ. ১৬৮)।

পুরাণ-এর আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে অক্ষয় দত্ত অষ্টাদশ পুরাণের বিস্তৃতির মধ্যে প্রবেশ করবার পূর্বে পুরাণ ও ইতিহাস দুটির তাৎপর্য কি তা অন্বেষণ করেছেন। যুগে যুগে পুরাণের ধারণা যে পরিবর্তিত হয়েছে সেই সত্য প্রতিষ্ঠা করে, প্রথমেই প্রতিপন্ন করেছেন যে, প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ আধুনিক যুগের সৃষ্টি এবং কোনো একজন ব্যক্তির রচনা নয়। বেদব্যাস বলে উল্লিখিত ব্যক্তির তো নয়-ই।[৩৩]

ভারতবর্ষের পরাধীনতা তাঁকে প্রবলভাবে দুঃখিত ও ব্যথিত করেছিল। ভারতীয়দের তৎকালীন অবস্থা দেখে তিনি এই উপক্রমণিকা অংশের বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সেই

[৩৩]তদেব, পৃ. ১২১।

বিষয়ে অকস্মাৎ দুঃখে ও ক্ষোভে ফেটে পরেন। বলে ওঠেন, "সেই হিন্দু এখন এই হিন্দু! এক কালের সিংহ-শার্দূল-প্রসবিনী ভারতভূমি এখন শশ-মূষিক-প্রসবিনী হইয়া কতই লাঞ্ছিত হইতেছেন। তদীয় পূর্ব-প্রতাপের চিতাগ্নি হইতে কি সুদীর্ঘ ও ঘনীভূত ধূমাবলী উত্থিত হইতেছে। তাহার বর্তমান অবস্থা অগ্নিময়; ভবিষ্যৎ গাঢ়তর ধূমে আচ্ছন্ন"(২য়, পৃ. ১৫৫-১৫৬)।

তিনি ভারতের পরাধীন অবস্থা পর্যালোচনা করে স্পষ্টত উচ্চারণ করেছিলেন: "ইংলন্ড! ইংলন্ড! তুমি অক্লেশে দুঃসাধ্য বিষয় সিদ্ধ করিয়াছ। .....বাল্মীকি, কালিদাস, কণাদ ও আর্যভট্টের স্বজাতীয়বর্গকে পদাবনত করিয়া নিজ সিংহাসন উজ্জ্বল ও উন্নত করিয়াছ। আমরা মন্ত্রণা বলে তোমাকে রাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া রাজমুকুট প্রদান করিয়াছি ও প্রীত মনে তোমারে ধন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া তোমার বশতাপন্ন হইয়া রহিয়াছি"(২য়, পৃ. ১৫৮)।

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ শাসন করে ইংলন্ডকে 'উজ্জ্বল ও উন্নত' (ভারতের সম্পদ লুঠ করে ইংল্যান্ডকে সমৃদ্ধ) করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা কি হয়েছে? ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য করে অক্ষয় দত্ত বলেন: ".....তোমার অধিকারে আমাদের স্বাস্থ্য-ক্ষয়, বল-ক্ষয়, আয়ুঃক্ষয় ও ধর্ম-ক্ষয় ঘটিতেছে। তুমি অধিক বিতরণ কি সংহরণ করিতেছ, কে বলিতে পারে? তুমি শিক্ষাদান করিতে গিয়া স্বাস্থ্য হরণ করিতেছ, অর্থোপার্জনের বিবিধ পথ প্রস্তুত করিতে গিয়া শ্রমাতিশয় ও তাহার বিষময় ফল-পুঞ্জ উৎপাদন করিতেছ, বাণিজ্য-বৃত্তি প্রসারণ করিতে গিয়া অশেষ-দোষকর দুর্মূল্যতা দোষ ও তৎসহ কৃত অধর্ম বংশের বৃদ্ধি করিতেছ, ...ভারত রাজ্যের আবগারি ব্যবস্থার কলঙ্কময় ফল-পুঞ্জে তোমার রাজমুকুট-বিরাজিত উজ্জ্বল হীরকখন্ড সমুদায়কে গাঢ়তর কলুষ-কালিমায় প্রকৃত অঙ্গার-খন্ড করিয়া ফেলিয়াছে"(২য়, পৃ. ১৫৮-১৫৯)।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়-এর দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকার শেষে, অক্ষয় দত্ত তৎকালীন হিন্দু সমাজের অবস্থা সম্পর্কে খেদোক্তি করেছেন এবং ব্রাহ্মধর্ম সমেত সমসাময়িক

বা অল্পকাল পূর্ববর্তী যে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের (সম্প্রদায়গুলি ছিল সেগুলি নিয়ে) আলোচনা করতে পারেন নি, সে বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। শেষ করেছেন, তাঁর কায়িক দুরবস্থার ও আশাভঙ্গের জন্য সাহিত্যরস সমৃদ্ধ দুঃখ প্রকাশ করে।[৩৪]

তবে, অসুস্থতা হয়ত প্রকারান্তরে অক্ষয় দত্তকে এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিল। তিনি অন্যান্য কাজে কালক্ষেপ করলে এই মহাগ্রন্থ সমাপ্ত হত কিনা, সন্দেহ থেকেই যায়। তিনি এই উপক্রমণিকায় সখেদে উল্লেখ করেছেন: "ষোড়শ বা সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে রীতিমত শিক্ষারম্ভ করিয়া, পঁইত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই, দুর্জ্জয় রোগ প্রভাবে চির দিনের মত অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম। যে সময়ে মনোমত কার্য্য-সাধনের কেবল উদ্যোগ পাইতেছিলাম, সেই সময়ে চিরজীবনের মত গুরু লঘু সকল কর্ম্মেই অক্ষম হইলাম।"[৩৫]

কিন্তু তিনি সকল কর্মে অক্ষম হননি, তার সাক্ষ্য ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (বইটি) এবং তার উপক্রমণিকা। তিনি মনমত যে সব কাজ করতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করেছেন, ".....বিজ্ঞান-বিশেষের বিশেষরূপ অনুশীলন পূর্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান-চেষ্টা" এবং এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, (তাঁর) "ভূ-তত্ত্ব ও উদ্ভিদ বিদ্যা অবলম্বন করিবার অভিলাষ ছিল"।[৩৬]

উপসংহার

আসলে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার কোন ধারার কাছেই অক্ষয়ের কোন ঋণ নেই—না প্রকৃতি দর্শনের ক্ষেত্রে, না জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে। তিনি তাঁর চিন্তার প্রধান উৎস পেয়েছিলেন ফ্রান্সিস বেকন্

[৩৪]তদেব, পৃ. ১১০-১১১।

[৩৫]অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (দ্বিতীয় ভাগ), পৃ. ৩১৬ (উপক্রমণিকা)।

[৩৬]অসিতকুমার ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

(যাঁকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কারের জনক বলা হয়) এবং অগুস্ত কোঁত (ধ্রুববাদ-এর প্রবক্তা)-এর কাছ থেকে।

উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই দুজনেই ছিলেন নতুন এক জগতের দিশারী। ভারতে রামমোহন রায়ের সময় থেকেই এই নতুন জগতের, চিন্তার সূচনা ধরা হয় [যদিও কোঁত-এর বিষয়ে রামমোহনের কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়, কারণ কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭) তাঁর পরবর্তী সময়ের]। তবে এর প্রকৃত শুভারম্ভ হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্তের সময় থেকেই।

বাংলায় ধ্রুববাদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'নিরীশ্বরবাদ'। উনিশ শতকের বহু শিক্ষিত বাঙালিই ধ্রুববাদী হয়েছিলেন নিরীশ্বরবাদের টানে। অক্ষয় দত্তও সেই একই ধারার লোক ছিলেন। খাঁটি বৈজ্ঞানিক মেজাজ নিয়েই তিনি দেখেছেন যাবতীয় আস্তিক দর্শন আর সেই সঙ্গে বেদ-বাদী ও বেদ-বাহ্য (বেদের বাইরের) উপাসক সম্প্রদায়গুলিকে।[৩৭] আর তাঁর এই মূল্যায়ন তাঁর উত্তরসূরীদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। যা অমার্জনীয় ভুল।

প্রাচীন ভারতীয় নিরীশ্বরবাদী ধারণার সাথে অক্ষয় দত্তের নিরীশ্বরবাদী ধারণার পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতে নিরীশ্বরবাদের তিনটি ধারা ছিল—বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক। বৌদ্ধ ও জৈন মতে, কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা নেই। কিন্তু আত্মা, কর্মফল ও পুনর্জন্মের ধারণা আছে। চার্বাক মতে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে শুধু যে কোন ঈশ্বর ধারণাকে গ্রহণ করা হয়নি তাই নয়, সেই

[৩৭]রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪-২৫৫।

সঙ্গে আত্মা, কর্মফল, পুনর্জন্ম, পাপ-পুন্য, প্রায়শ্চিত্ত, পিণ্ড দান, প্রেতলোক, শুচি-অশৌচ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমস্ত পরলৌকিক ধারণাকে বর্জন করা হয়েছে।

অক্ষয় দত্ত বৌদ্ধ ও জৈন নিরীশ্বরবাদের কেবলমাত্র উল্লেখ করেছেন, সবিস্তারে আলোচনা করেননি। কিন্তু তিনি চার্বাক মত প্রসঙ্গে অনেকখানি আলোচনা করেছেন। তার থেকে মনে হয় তিনি চার্বাক মতাবলম্বীদের যুক্তি-তর্কের দ্বারা বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তি জীবনে যে রকম কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন, তার সঙ্গে এই চিন্তা অনেকটাই মিলে যায়। আত্মা বা পরলোকে তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না। জ্যোতিষ বিচার অনুযায়ী শুভ দিন বা অশুভ দিন বলে তিনি কিছুই মানতেন না। সুতরাং যাগ-যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য পারলৌকিক কাজ কর্মে তিনি বিশ্বাস করতেন না। এইসব দিক বিবেচনা করলে তাঁর সঙ্গে চার্বাক নিরীশ্বরবাদীদেরই সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায়।

উপসংহার

অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন উনিশ শতকের একজন বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী নেতৃত্ব। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে সংস্কার করে সময়োপযোগী করেছিলেন। যদিও বিশ শতকে প্রথমে একেশ্বরবাদ, পরে যুক্তিবাদ ছেড়ে ব্রহ্মবাদ নিস্ক্রিয় হয়ে পরেছিল। যা পরিশেষে বিলীন হয়ে যায়। আজ ব্রাহ্মধর্ম-ব্রাহ্ম আন্দোলন কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা, অতীতকালের সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পরেছে। এবং তাদের স্থাপত্যকীর্তিগুলি বর্তমান নাগরিকদের কাছে হেরিটেজ/দর্শনীয় স্থান হয়ে রয়েছে।

রামমোহন রায়ের প্রভাবে ও ঔপনিবেশিক শাসকদের পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের জন্য শাসিত ভারতীয়দের জীবন-সংস্কৃতি-কর্মে পরিবর্তন এসেছিল। এবং অক্ষয় ও বিদ্যাসাগর ছিল প্রথম সারিতেই। অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দুই জনেরই আত্মমর্যাদা বোধ ছিল প্রখর ও অনমনীয়। ব্যক্তি জীবনে নীতি ও আদর্শ মেনে চলার প্রশ্নে দুজনেই ছিলেন কঠোরভাবে আপসহীন। সেই যুগে বিদ্যাসাগরকে যদি কেউ সঠিক চিনে থাকেন, তবে একমাত্র সেই ব্যক্তিটি হলেন অক্ষয় দত্ত। পাশাপাশি, অক্ষয় দত্তকে যদি সেই সময় কেউ সত্যিকারের অর্থে বুঝে থাকেন, তিনি অবশ্যই বিদ্যাসাগর। তাঁদের দুই জনেরই জীবন-যাপন ছিল সাধারণ। কিন্তু তাঁরা নীতিতে ছিলেন অকাট্য।

অক্ষয় বেশি দিন প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঔপনিবেশিক যুগের তাঁর শিক্ষাভাবনা আজও সমানভাবে

প্রাসঙ্গিক। তাঁর লেখা পদার্থবিদ্যা-ভূগোল-চারুপাঠ গ্রন্থগুলিতে কোন তথ্যগত ত্রুটি আজও চোখে পরে না। তাঁর এই পাঠ্য গ্রন্থগুলি আজও সমানভাবে মনোগ্রাহী। তিনি মদনমোহনের কবিতার অপূর্ব সমলোচনা করে সাহিত্যিকের উপযুক্ত কাজ করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন।

তৎকালীন সময়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ হিসেবে অক্ষয় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আমরা দেখেছি, শিক্ষক হিসেবে তিনি বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য যে কাজ করে গেছেন তা অবিস্মরণীয়/কালজয়ী। তিনি প্রয়োজনে ভাষার সংস্কার করে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, পাঠ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই পথেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। যা এখনও সমান তালে চলছে। যা এখন তত্ত্ব থেকে/কাগজের পাতা থেকে ল্যাবরেটরির মাধ্যমে বহু কৃতি বিজ্ঞানীদের উত্থান ঘটিয়েছে। তাই বাংলার বিজ্ঞানের ইতিহাস সেই সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত রমরমিয়ে চলছে।

আধুনিককালে পত্রিকা এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পত্রিকা প্রচারের যে একটি প্রধান অঙ্গ বা মতামত গঠনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে তা তিনি দেখিয়েছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে। বিদ্যাদর্শন পত্রিকাটি বেশিদিন না চললেও তাঁর চিন্তার সুর তিনি তাতেই বেঁধে দিয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁর হাত ধরে তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালি মধ্যবিত্তদের/ইন্টেলেকচুয়ালদের চিন্তার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। আজও এই পত্রিকার বিষয়বস্তু আমাদের চিন্তার উদ্রেগ ঘটায়। বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল এই পত্রিকা।

কিন্তু প্রধানতঃ মতাদর্শগত কারণে ও শারীরিক কারণে তাঁর হাতে তিলে তিলে গড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে তিনি সরে আসেন। তখন থেকে এই পত্রিকার অবনতি হতে থাকে।

যা আর সেই পুরোনো অবস্থায় ফিরতে পারেনি। এই খেদ স্বয়ং পত্রিকার প্রকাশক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন। আধুনিক বাংলা ভাষায় রচনা এই সময়েই দেখা গিয়েছিল। অক্ষয় দত্ত এর পুরোধা ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদক হিসেবেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

পারিবারিক প্রভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় প্রভাব ছিল। কিন্তু তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না এই বিষয়টি লক্ষণীয়। শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল ছোটবেলা থেকেই। ফলে তিনি তৎকালীন সময়ের প্রধান ট্রেন্ড পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়ে পরেছিলেন। যা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ধর্মান্তরিতকরণের ভয়ে ভীত করেছিল। কিন্তু এই ধারণা যে অমূলক ছিল তা প্রমাণিত করে তিনি শুধুমাত্র জ্ঞান শিক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দর্শনের-জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্ম-ব্রাহ্মবাদ—যা একেশ্বর এর কথা বলে, বেদ-উপনিষদকে প্রাধান্য দেয়, আবার মাঝে মধ্যে পৌত্তলিকতাকেও প্রাধান্য দেয়। ফলে তিনি অনেক তাত্ত্বিক বিচার করে 'ব্রাহ্মধর্মকে বেদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে আধুনিক শিক্ষিত মানুষদের উপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন।' এমনকি ব্রাহ্মসমাজের সাংগঠনিক প্রধান দেবেন্দ্রনাথকেও তিনি তাঁর এই চিন্তার দ্বারা আকৃষ্ট করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই লড়াই বেশি দিন টেঁকেনি। দুজনের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল। পরিশেষে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

এমনকি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর উপর এতটা চটেছিলেন যে, তিনি যখন গুরুতর শিরারোগে আক্রান্ত হয়ে কর্মাক্ষম হয়েছিলেন তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালকবর্গ তাঁকে আর্থিক সাহায্য (অনুদান) দিতে চাইলে দেবেন্দ্রনাথ তার সরাসরি বিরোধীতা করেছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এই বিরোধিতা কার্যকর হয়নি। এই শিরারোগ অবস্থায় অক্ষয় রচনা করেছিলেন তাঁর অক্ষয়কীর্তি

ভারতীয় উপাসক-সম্প্রদায় বইটি। গবেষণার উপাত্ত হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এতগুলি ভারতীয় উপাসক নিয়ে গবেষণা তৎকালীন ও বর্তমান সময়ের নিরিখে কালজয়ী। একে তো গবেষণার বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি অন্যদিকে তাঁর শারীরিক পীড়া।

তিনি যখন এই গ্রন্থটি রচনা করেন তখন তিনি প্রবলভাবে শিরারোগে পীড়িত ছিলেন। তাঁর শেষ জীবনের অনেক ঘটনা সম্পর্কে নকুড়চন্দ্র ভুল/মিথ্যা বলেছেন। গবেষকরা মনে করেন যা দেবেন্দ্রনাথ গোষ্ঠীর প্রভাবের ফল। বস্তুবাদী পর্যায়ে তিনি ছিলেন আপসহীন, যার জন্য তাঁকে শেষ জীবনে একাকীত্বও ভোগ করতে হয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর সাথে তাঁর কর্মচারীরা ছাড়া কোন আত্মীয়/পারিবারিক সদস্য ছিলেন না।

আসলে, অক্ষয় দত্তের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় প্রভাব যেমন প্রবলভাবে ছিল না। ঠিক তেমনই তিনি জাতিগত (কর্মের) ভেদ মানতেন না তা আমরা গবেষণা সন্দর্ভে লক্ষ্য করেছি। উনিশ শতকের বাংলা কুসংস্কার-কূপমন্ডুকতার অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে বেড়িয়ে আসছিল, যার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। রামমোহন রায়, ডিরোজিও, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর এঁরা ছিলেন এর পুরোধা। এঁদের মধ্যে অক্ষয় দত্তের চিন্তা-চেতনা ছিল সম্পূর্ণই বস্তুবাদী। ফলে উনিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তক-সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনি ইতিহাসে প্রোট্রেট হয়ে রয়েছেন।

এই গবেষণা সন্দর্ভের পরে এই গবেষক আশা প্রকাশ করেন যে, অক্ষয় দত্তকে নিয়ে যে চর্চা শুরু হয়েছে তার প্রসার ঘটবে। এবং এর ফলে অক্ষয়কে বুঝতে হয়ত আর কেউ ভুল করবেন না। পরিশেষে, আশা করা যায়, তিনি অজ্ঞাত থেকে জ্ঞাত হবেন আমাদের কাছে। এভাবেই হয়ত দুই শতাব্দীর ঋণ শোধ করতে সক্ষম হব আমরা।

সংযোজনী

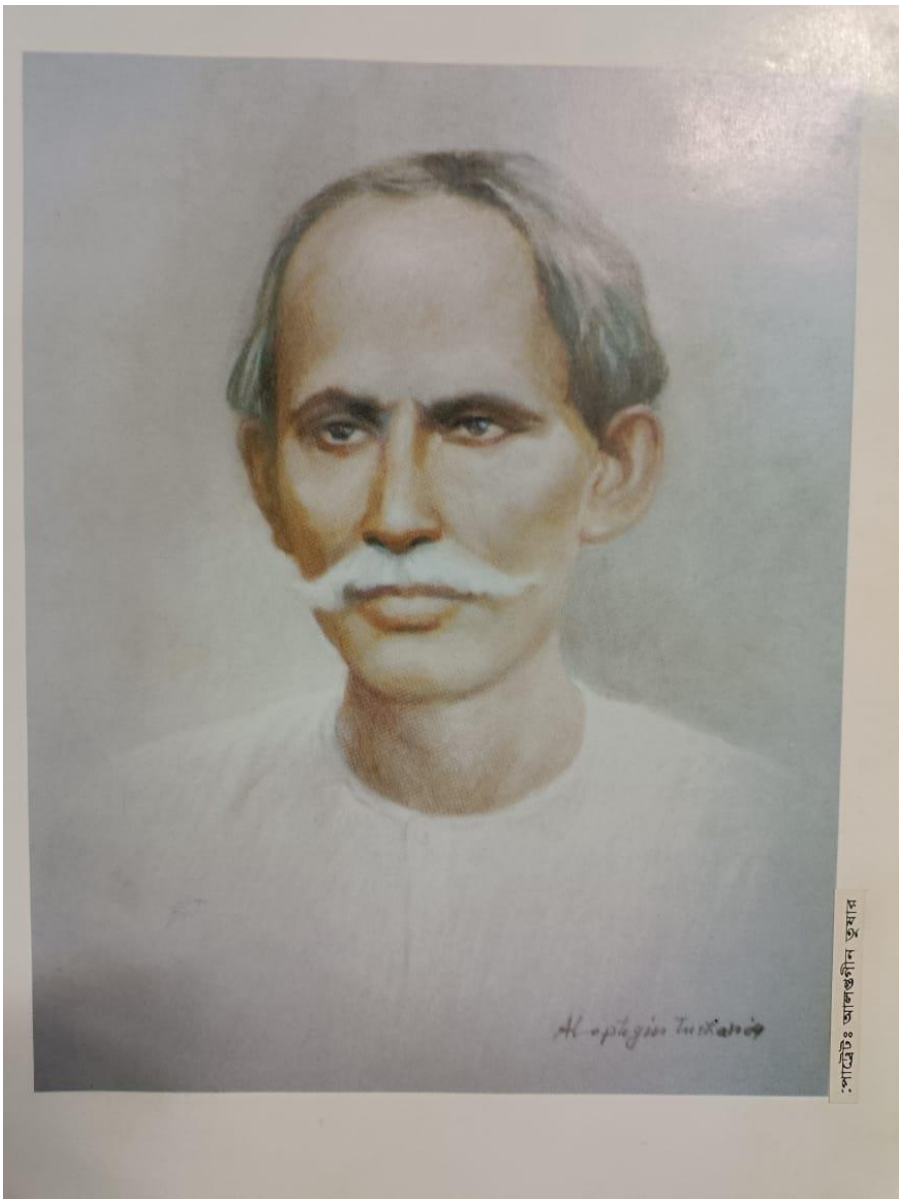

অক্ষয়কুমার দত্ত

জন্ম- ১৫ই জুলাই ১৮২০

মৃত্যু- ২৭শে মে ১৮৮৬

শিল্পীঃ আলপ্তগীন তুষার

সংগ্রহঃ মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম রচিত *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*

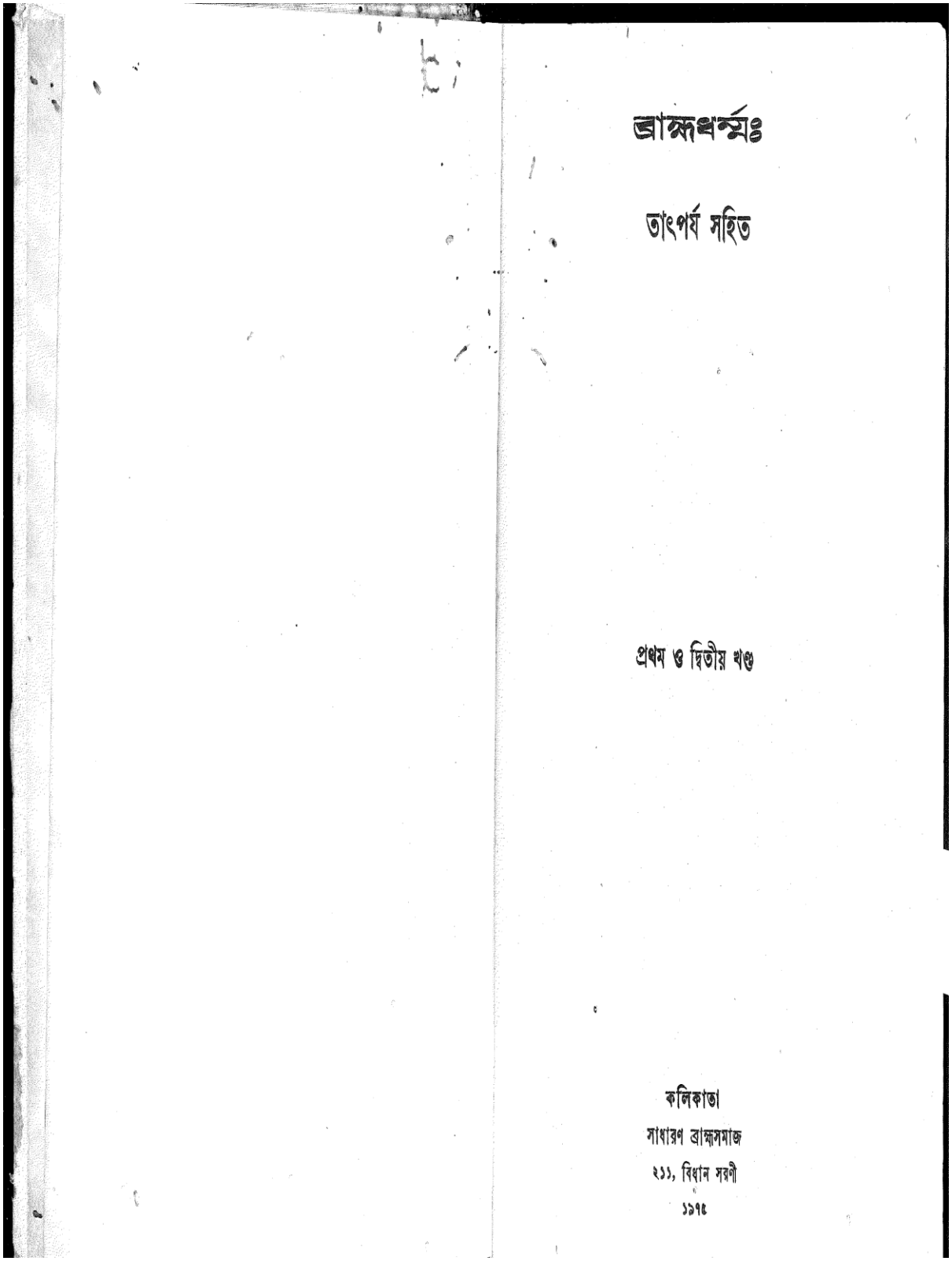

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

তাৎপর্য সহিত

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

কলিকাতা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১, বিধান সরণী
১৯৭৫

সংযোজনী ২—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *ব্রাহ্মধর্ম্ম* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) [১৮৪৯]

আত্মজীবনী

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

সংযোজনী ৩—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী* (১৮৯৮)

চারুপাঠ

প্রথম ভাগ

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত।

সংশোধিত সংস্করণ

প্রকাশক—

প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৯৩০

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সংযোজনী ৪—অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত চারুপাঠ (তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়)

LIFE

OF

BABU AKSHAYKUMAR DATTA.

শ্রীযুক্ত

বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত

আর্য্যদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক

মহেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত,

কলিকাতা;

[illegible] নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সংস্কৃত যন্ত্রের

পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত,

গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২ সাল।

[মূল্য ৷৷০ বার আনা।]

সংযোজনী ৫—মহেন্দ্রনাথ রায় রচিত *'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন জীবন বৃত্তান্ত'* (১২৯২)

অক্ষয়-চরিত।

(সচিত্র)

OR

AN ILLUSTRATED LIFE OF

THE LATE

BABU AKSAY KUMAR DUTTA.

প্রাণি-ব্যবহার" "আদর্শ-নারী" "বিদ্যাবতী আবিয়ার
ও তাঁহার উপদেশ" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রণীত

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড।

ভাদ্র ১২৯৪ সাল।

All Rights Reserved.

সংযোজনী ৬—নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস রচিত অক্ষয় চরিত (১২৯৪)

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

প্রথম ভাগ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত।

অষ্টম বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

মেট্রপলিটন যন্ত্র।

তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শি

শকাব্দা ১৮ অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয়

সংযোজনী ৭--অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

BETAL PANCHABINSHATI.

BY

ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR.

SEVENTH EDITION.

বেতাল পঞ্চবিংশতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

সপ্তম বার মুদ্রিত।

CALCUTTA

THE SANSKRIT PRESS.

1858.

মূল্য এক টাকা চারি আনা।

সংযোজনী ৮--ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৫৮)

THE

RELIGIOUS SECTS

OF THE

HINDUS

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

৺অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত।

প্রথম ভাগ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র

১৮৮৮।

সংযোজনী ৯---অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

স
০৫০
তত্ত্ব
502

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
... নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

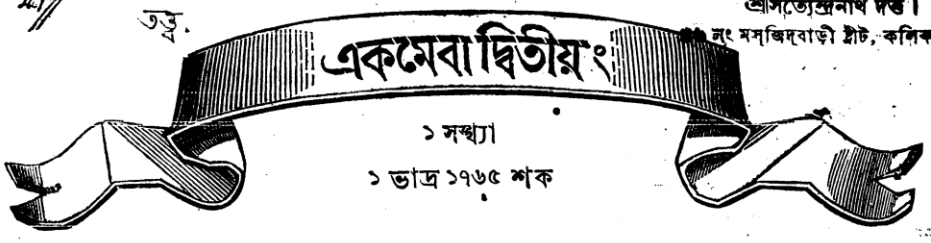

একমেবাদ্বিতীয়ং

১ সংখ্যা
১ ভাদ্র ১৭৬৫ শক

S. N. DATTA COLLECTION
BANGIYA SAHITYA PARISHAT

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কিপ্রকার হইবেক? অতএব তাহারদিগের এসকল বিষয়ের অবগতি জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্য ক্রমে অথবা অন্যকোন দৈব বিপাকে ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানি ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল, এবং সর্ব্ব সাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের মনো[illegible]ন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বা[illegible]কার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎ[illegible]সমাচার দেওয়া যাইবেক।

সংযোজনী ১০--তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (১৮৪৩)

সাময়িকপত্রে

বাংলার সমাজচিত্র

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ

তৃতীয় খণ্ড

B.L. = 7455
REFERENCE

বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সম্বাদ ভাস্কর, বিদ্যাদর্শন
ও সর্বশুভকরী পত্রিকার রচনা-সংকলন

বিনয় ঘোষ
সম্পাদিত ও সংকলিত

BIRCHANDRA PUBLIC LIBRARY
AGARTALA
5.2017
3/6/11

বীক্ষণ
১২/১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ১২

সংযোজনী ১১--বিনয় ঘোষ (সম্পা.) *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (৫টি খণ্ড)

বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত

পীড়িতাবস্থা। ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম

কালের প্রতিরূপ।

সংযোজনী ১২

মহেন্দ্রনাথের *'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন জীবন বৃত্তান্ত'* বই থেকে ছবিটা সংগৃহীত

(অসুস্থ অবস্থায় ৫৫ বছর বয়সী অক্ষয় দত্তের ছবি)

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উপাদান-

গ্রন্থ

অক্ষয়কুমার দত্ত, *চারুপাঠ* (প্রথম ভাগ), কলিকাতা: প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এন্ড ব্রাদার্স, ১৯৩০ খ্রিঃ (সংশোধিত সংস্করণ)।

-*চারুপাঠ* (দ্বিতীয় ভাগ), কলিকাতা: হেয়ার প্রেস, ১৮৯৬ খ্রিঃ (ত্রিংশবার মুদ্রিত)।

-*চারুপাঠ* (তৃতীয় ভাগ), কলিকাতা: সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরি, ১৯১২ খ্রিঃ (একত্রিশতম সংস্করণ)।

-*পদার্থবিদ্যা*: জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম, কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৫৮ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

-*ভূগোল,* কলিকাতা: তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৮৪১ খ্রিঃ।

-*ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (প্রথম ভাগ), কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রিঃ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

-*ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (দ্বিতীয় ভাগ), কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৩ খ্রিঃ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

-*বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (প্রথম খণ্ড), স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮ খ্রিঃ, ১১৩-২১৪।

-*বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার* (দ্বিতীয় খণ্ড), স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮ খ্রিঃ, ২১৫-৩১৬।

-*বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ,* স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮ খ্রিঃ, ৩৮৫-৩৯৬।

-*ধর্ম্মনীতি,* স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮ খ্রিঃ, ৪৩১-৫২৮।

-*শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা,* স্বপন বসু (সংকলন ও সম্পাদনা), *অক্ষয়কুমার দত্ত রচনা সংগ্রহ* (প্রথম খণ্ড), ২০০৮, পৃ. ১০৯-১১২।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বেতাল পঞ্চবিংশতি,* কলিকাতা: সংস্কৃত প্রেস, ১৮৫৮ খ্রিঃ (সপ্তম সংস্করণ)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী,* সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬০ খ্রিঃ (চতুর্থ সংস্করণ)।

-*ব্রাহ্মধর্ম* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৭৫ খ্রিঃ (দশম সংস্করণ)।

-*ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চ বিংশতি বর্ষের পরিক্ষিত বৃত্তান্ত* (বক্তৃতা: ২৬শে বৈশাখ ১৭৮৬), কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ১৩৬০ সাল (পুনর্মুদ্রণ)।

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, *অক্ষয় চরিত,* কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১২৯৪ সাল।

বিহারিলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর,* কলিকাতা: শাস্ত্র প্রকাশ, ১৯২২ খ্রিঃ (চতুর্থ সংস্করণ)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.), *অক্ষয়কুমার দত্ত* (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১২), কলকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৪৯ সাল (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মহেন্দ্রনাথ রায়, *বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত,* কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তাকালয়, ১২৯২ সাল।

রাজনারায়ণ বসু, *বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা,* কলিকাতা: বঙ্গ-ভাষা সমালোচনী সভা, ১৯৩৫ খ্রিঃ।

শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ২০১৬ খ্রিঃ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

প্রবন্ধ

অক্ষয়কুমার দত্ত, 'শিক্ষাদান ও পাঠ্যবিষয় নিরূপণ', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ২১-৩২।

-'বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষাপ্রণালী নির্ধারণ', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৩৩-৪৫।

-'বিদ্যাশিক্ষা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৪৬-৪৭।

-'বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানার্জন', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৪৮-৫১।

-'বঙ্গদেশের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৫২-৫৩।

-'বিদ্যাবুদ্ধির সৎপরামর্শ', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৫৪-৫৫।

-'বঙ্গদেশে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৫৬-৫৯।

-'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৬৪-৬৫।

-'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৬৬-৬৮।

-'ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলনের বিষয়', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৭৮-৮৭।

-'স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৮৮-৯১।

-'বঙ্গভাষার উন্নতির প্রতিবন্ধক', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ৯২-৯৫।

-'শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ১০৯-১৩৩।

-'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের সুখের তারতম্য', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭ খ্রিঃ, ১৮২-১৮৬।

-'বিধবাবিবাহ', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ২৯-৩৮।

-'বঙ্গদেশে বর্তমান অবস্থা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৬৬-৭৪।

-'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৮৩-১০৬।

-'স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ১৩৭-১৪০।

-'কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৭৫-৮২।

-'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ১০৬-১২৬।

-'স্বপ্নদর্শন-বিদ্যাবিষয়ক', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ১৪৫-১৫০।

-'ভারতবন্ধু রামমোহন রায়', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ২০১২ খ্রিঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ), ১৫১-১৫৯।

-'ভারতবর্ষীয় লোক খ্রীষ্টধর্ম কেন গ্রহণ করে?', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫ খ্রিঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ২৯-৩৩।

-'ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রসঙ্গে', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫ খ্রিঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৩৪-৪৭।

-'হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রণালী', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫ খ্রিঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ৯৮-১০৭।

-'ভারতীয় দর্শন', মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধঃ অক্ষয়কুমার দত্ত*, ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫ খ্রিঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), ২৫০-২৯০।

পত্রিকা

বিদ্যাদর্শনঃ

২ সংখ্যা শ্রাবণ ১৭৬৫ শকে (১৮৪২ খ্রিঃ) 'বহুবিবাহ'।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাঃ

২য় সংখ্যা ১লা আশ্বিন ১৭৬৫ শক, 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'।

৬৯সংখ্যা বৈশাখ ১৮৪৮ খ্রিঃ 'স্বদেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান' (বিদ্যাভ্যাস)।

বৈশাখ, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ ১৮৫০ খ্রিঃ 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন'।

ফাল্গুন ১৮৫৪ খ্রিঃ 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা'।

চৈত্র ১৮৫৪ খ্রিঃ 'বিধবা বিবাহ'।

১৫২ সংখ্যা চৈত্র ১৭৭৭ শকাব্দ 'বহুবিবাহ'।

গৌণ উপাদান-

গ্রন্থ

অশোক মুখোপাধ্যায়, ডিরোজিও ও অক্ষয়কুমার দত্ত, কলকাতা: অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ, ২০১৩ খ্রিঃ।

অসিতকুমার ভট্টাচার্য, *অক্ষয়কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলায় ধর্ম ও সমাজচিন্তা*, কলকাতা: কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৭ খ্রিঃ।

আশীষ লাহিড়ী, *বঙ্গে বিজ্ঞান (উন্মেষ পর্ব)*, কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ২০১৮ খ্রিঃ।

-*অক্ষয়কুমার দত্তঃ আঁধার রাতে একলা পথিক*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭ খ্রিঃ।

-(সম্পা.), *ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুবীজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত*, কলকাতাঃ বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল সার্ভিসেস, ২০২৪ খ্রিঃ।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৬ খ্রিঃ (পঞ্চম সংস্করণ)।

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা, *এক হিন্দু আত্মপরিচয়ের খোঁজে*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৬ খ্রিঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)।

নবেন্দু সেন, *গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৩৬৭ সাল।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি, কলিকাতা: শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩২৬ সাল।

বিপন চন্দ্র, *আধুনিক ভারত*, কলকাতাঃ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩/বি (তৃতীয় প্রকাশ)।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৫ খ্রিঃ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, *শিশুশিক্ষা*, আশিস খাস্তগীর (সম্পাদনা), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৯ খ্রিঃ (প্রথম আকাদেমি সংস্করণ)।

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম, *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৯।

-*মুক্তচিন্তার বিস্তার*, কলকাতা: কথাপ্রকাশ, ২০১৮।

যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত*, ১৯৭৮ খ্রিঃ (সংস্করণ)।

রামগতি ন্যায়রত্ন, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (বিখ্যাত বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎ সমালোচনা সমেত)*, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), চুঁচুড়া:, ১৩১৭ সাল (তৃতীয় সংস্করণ)।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *কামারের এক ঘা*, কলকাতা: পাভলভ ইনস্টিটিউট, ২০১৪ খ্রিঃ (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)।

রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস (১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৯৩ খ্রিঃ (চতুর্থ সংস্করণ)।

রাজকুমার চক্রবর্ত্তি, *অক্ষয়কুমার দত্ত*, কলিকাতা: ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্, ১৩৩২ সাল।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশী থেকে পার্টিশান (আধুনিক ভারতের ইতিহাস)*, কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮ খ্রিঃ (পুনঃমুদ্রণ)।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, *ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫/এ (তৃতীয় মুদ্রণ)।

Bhattacharya, Tithi. *The Sentinels of Culture: Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal (1848-85)*. New Delhi: Oxford University Press, 2005.

Chakrabarti, Sumit. *Local Selfhood, Global Turns: Akshay Kumar Dutta and Bengali Intellectual History in the Nineteenth Century*. UK: Cambridge University Press, 2023.

Datta, Rajat. *Society, Economy and The Market: Commercialization in Rural Bengal c. 1760-1800*. New Delhi: Manohar, 2000.

Dasgupta, Subrata. *The Bengal Renaissance: Identity and Creativity from Rammohun Roy to Rabindranath Tagore*. New Delhi: permanent black, 2007.

Dutta, Akkhoy K. *Who is Brahmo?*. Simla: Himalaya Brahmo Samaj, 1966.

Forbes, Geraldine Hancock. *Positivism in Bengal: A case study in the Transmission and Assimilation of an Ideology*. Calcutta: Minerva Associates (Publications) Private Limited, 1975.

Hatcher, Brian A. *Hinduism Before Reform*. London: Harvard University Press, 2020.

Islam, Muhammad Saiful. *Akshaykumar Datta: The First Social Scientist in Bengal*. Kolkata: Renaissance Publishers Pvt. Ltd., 2009.

Jones, Kenneth W. *The New Cambridge History of India III-1, Socio-Religious reform movements in British India*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Kling, Blair B. *Partner in Empire: Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India*. California: University of California Press, 1976.

Kopf, David. *British Orientalism and the Bengal Renaissance: The Dynamics of Indian Modernization 1773-1835*. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1969.

– *The Brahmo Samaj and the shaping of the Modern Indian Mind*. New Jersey: Princeton University Press, 1979.

Pal, Satyendranath. *A History of Political Thought of Modern Bengal (Age of Conservative Radicalism*). Calcutta: Firma KLM pvt. Ltd., 1999.

Poddar, Arabinda. *Renaissance in Bengal Quests and Confrontation 1800-1860*. Simla: Indian Institute of Advance Study, 1960.

Mitra, Samarpita. *Periodicals, Readers and the Making of a Modern Literary Culture: Bengal at the Turn of the Twentieth Century*. Leiden: Brill, 2020.

Sarkar, Sumit. *A Critique of Colonial India*. Kolkata: Papyrus, 1985.

Sarkar, Susobhan. *On the Bengal Renaissance*. Calcutta: Papyrus, 1979.

Sastri, Sivnath. *History of the Brahmo Samaj*. Calcutta: Sadharon Brahmo samaj, 1974.

Sen, Amiya P. *Explorations in Modern Bengal c. 1800-1900: Essays on Religion, History and Culture*. Delhi: Primus Books, 2010.

Sen, Asok. *Iswar Chandra Vidyasagar and his Elusive Milestones*. Calcutta: Riddhi-India, 1977.

Subramanian, Lakshmi. *History of India, 1707-1857*. New Delhi: Orient Blackswan private limited, 2010.

প্রবন্ধ

আশীষ লাহিড়ী, বাঙালির বিজ্ঞানচেতনার পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ২৮৮-৩০৭।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তঃ বাংলায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-চেতনা, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ২৪১-২৪৩।

যোগীন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলা সাহিত্য, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ৯০-১০২।

রজনীকান্ত গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ৭৩-৮৯।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, মুক্ত চিন্তার ঐতিহ্যঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ২৭৫-২৮৭।

সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়কুমারকে যেমন দেখেছি, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ৬৭-৭২।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ৬১-৬৬।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঊনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম (সম্পা.), *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, ১২৮-১৩০।

পত্রিকা

অশোক মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বিশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, কলকাতা: সেন্টাস, ২০২০ খ্রিঃ।

বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্রঃ ১৮৪০-১৯০৫* (তৃতীয় খণ্ড), কলিকাতা: বীক্ষণ, ১৯৬০।

জীবনপঞ্জি

অক্ষয়কুমার দত্ত

১৮২০ জন্ম (১৫ই জুলাই)। নবদ্বীপের পাঁচ মাইল উত্তরে বর্ধমানের চুপী গ্রামে। পিতা পীতাম্বর দত্ত, মাতা দয়াময়ী দত্ত। পীতাম্বর দত্ত কলকাতায় কুদঘাটের পুলিশ কার্যালয়ে প্রথমে কোষাধ্যক্ষ ও পরে সাব-ইন্সপেক্টারের পদে উন্নীত হন। মাতা দয়াশীল নারী ছিলেন।

১৮২৫ হাতেখড়ি। ৫ বছর বয়সে। এরপর শ্রী গুরুচরণ সরকারের তত্ত্বাবধানে গৃহশিক্ষার মাধ্যমে পাঠশালার শিক্ষা সম্পূর্ণ। একজন মুন্সি, আমিউদ্দিন-এর কাছে ফার্সি ভাষা শিক্ষা। পাশাপাশি টোলের সংস্কৃত পণ্ডিত গোপীনাথ তর্কালংকারের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা।

১৮৩৫ কলকাতায় আগমন। ১৫ বছর বয়সে। অক্ষয়কুমারের জ্যাঠাতুতো দাদা হরমোহন দত্তের সাথে। হরমোহন কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান করণিক ছিলেন। তিনি অক্ষয়ের ইংরেজি শিক্ষার জন্য ২ জন ইংরেজি শেখানোর গৃহ শিক্ষকের ব্যবস্থা করেন—জয়কৃষ্ণ ও প্যারীমোহন সরকার।

১৮৩৫ বিবাহ। মাত্র ১৫ বছর বয়সে। স্ত্রীর নাম নিমাইমণি বা শ্যামাসুন্দরী ঘোষ (আগড়পাড়া নিবাসী)। অক্ষয়কুমারের বিবাহের পর পীতাম্বরের কাশী যাত্রা ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু।

১৮৩৬ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে ভর্তি। তখনকার পঞ্চম শ্রেণী অর্থাৎ এখনকার ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। শিক্ষাবর্ষ শেষে অক্ষয়কুমার দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে পুরস্কার পান। তাঁকে চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত করার বদলে একেবারে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ আজকের অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। অর্থাৎ "ডবল প্রমোশন"।

১৮৩৭ বিবাহের এক বছরের পরই প্রথম সন্তান, চন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। তাঁর অন্যান্য পুত্র সন্তানেরা হলেন—হেমচন্দ্র ও রজনীনাথ ও দুই কন্যা—রাজমোহিনী ও বিরাজমোহনী। চন্দ্রকুমার ও হেমচন্দ্রের অকালপ্রয়াণ ঘটে। পিতার মৃত্যুর পর প্রথাগত শিক্ষার সমাপ্তি।

১৮৩৮ প্রথম উপার্জনের পথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছোটো ছেলে, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮২৯-১৮৫৮) ইংরেজি গৃহ শিক্ষকের কাজ।

১৮৩৯ অক্ষয়কুমারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "*অনঙ্গমোহন*" প্রকাশিত হয়। বইটির কোনও কপি এখন আর লভ্য নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হন ২৫শে ডিসেম্বর।

১৮৪০ উত্তর কলকাতার সিমলায় হিন্দু কলেজ পাঠশালা স্থাপন (১৮ই জানুয়ারি)।

১৮৪০ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা (১৩ই জুন)।

১৮৪০ ফেব্রুয়ারিতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় মাসিক ১০ টাকার বেতনে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত, পরে মাসিক ১৪ টাকায় তৃতীয় শিক্ষকের পদ পান।

১৮৪১ তাঁর *ভূগোল* বইয়ের প্রকাশ তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম বই।

১৮৪২ *"বিদ্যাদর্শন পত্রিকা"* প্রকাশিত হয় (জুন)। পত্রিকাটি মাত্র ৬ মাস প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৪৩ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা হুগলীর বাঁশবেড়িয়াতে উঠে যায় (৩০শে এপ্রিল)। তাঁকে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু তিনি রাজি হননি।

১৮৪৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৬ই অগাস্ট)। তিনি পত্রিকা সম্পাদক নিযুক্ত হন। বেতন ৩০ টাকা।

১৮৪৩-৪৫ পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা শিখবার জন্য অনুমতি নিয়ে বহিরাগত ছাত্র হিসেবে মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা গ্রহণ।

১৮৪৩-১৮৫৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর বেতন বেড়ে প্রথমে ৪৫ ও পরে ৬০ টাকা হয়। তাঁর সম্পাদনাকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাতৃভাষায় প্রাকাশিত শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয় বাংলাদেশের (বাংলার), গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৭০০।

১৮৪৩ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ (২১শে ডিসেম্বর)। কিন্তু তিনি বেদান্ত ধর্ম ও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর গোষ্ঠীর সাথে বিরোধ শুরু। শেষে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে যুক্তিতে পরাস্ত হয়ে বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে *'বাঙ্গলা ভাষানুশীলনী সভা'* এবং *'নীতিতরঙ্গিনী'* সভার সঙ্গে যুক্ত হন।

১৮৪৫ বাংলা ভাষায় *"শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা"* ও পরে সেটি বই হিসেবে প্রকাশ।

১৮৫১ *"বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির মম্বন্ধ বিচার"* (প্রথম ভাগ) প্রকাশ।

১৮৫২ তাঁর ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় *'আত্মীয় সভা'* প্রতিষ্ঠা। বাংলা ভাষায় মন্ত্র পাঠে জোর। *'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'*-এর সঙ্গে যুক্ত হন।

১৮৫৩ *"বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার"* (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশ।

১৮৫৩ *"চারুপাঠ"* (প্রথম ভাগ) প্রকাশ।

১৮৫৪ *"চারুপাঠ"* (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশ।

১৮৫৫ শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষকে *'শিক্ষক শিক্ষণ-নর্মাল স্কুল'*-এর প্রধান শিক্ষক হিসেবে অক্ষয় দত্তকে নিয়োগের জন্য বিদ্যাসাগরের সুপারিশ (২রা জুলাই)।

১৮৫৫ ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাগৃহে জ্ঞান হারান (জুলাই)। মনে করা হয়, তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি এই রোগে (আসলে ছিল শিরারোগ) বারবার আক্রান্ত হতে থাকেন।

১৮৫৫ সংস্কৃত কলেজের মধ্যে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা (১৭ই জুলাই)। শিরোরোগের ও দেবেন্দ্র-গোষ্ঠীর সাথে মতবিরোধ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ত্যাগ ও ১৫০ টাকা বেতনে তাঁর ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ।

১৮৫৫ *"বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ"* বই প্রকাশ।

১৮৫৫ *"ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব"* বই প্রকাশ।

১৮৫৬ *"ধর্ম্মনীতি"* বই প্রকাশ।

১৮৫৬ *"পদার্থবিদ্যা"* বই প্রকাশ। বাংলা ভাষায় প্রথম এই বিষয়ের বই।

১৮৫৬ শিররোগের জন্য ২ বছরের জন্য নর্মাল স্কুলের থেকে ছুটি গ্রহণ।

১৮৫৮ নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে ইস্তফা (অগাস্ট)।

১৮৫৯ *"চারুপাঠ"* (তৃতীয় ভাগ) প্রকাশ।

বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী সভা থেকে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা।

বালি গ্রামে বাগান ও দুই তলা বাড়ি নির্মাণ, এবং "শোভনোদ্যান" সৃষ্টি।

১৮৭০ *"ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"* (প্রথম ভাগ) প্রকাশ।

১৮৮৩ *"ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্পদায়"* (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশ।

১৮৮৬ মৃত্যু (২৮শে মে)। শিররোগের জন্য।

১৯০১ মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় *"প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার"* বইটি।